কালো পঁচিশের আগে ও পরে

আবুল আসাদ

কালো পঁচিশের আগে ও পরে

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

কালো পঁচিশের আগে ও পরে

আবুল আসাদ

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.bjilibrary.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩১৮

১ম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০

১ম সংস্করণ ৩য় প্রকাশ (আধু ঃ ২য় প্রকাশ)

সফর	১৪৩৩
পৌষ	১৪১৮
জানুয়ারী	২০১২

বিনিময় ঃ ২৩৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

KALO POCHISHER AGAY O PARAY. by Abul Asad.
Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane,
Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 235.00 Only

www.bjilibrary.com

সেই বাল্যকাল
থেকে
আমার মধ্যে
ইতিহাস-সচেতনতা
সৃষ্টির ক্ষেত্রে যাঁর
ছিল অসীম প্রয়াস
আমার সেই
মরহুম আব্বা
এ. কে. ছামছামুল
হক-এর
পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

প্রকাশকের কথা

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালো রাত্রি আমাদের ইতিহাসের এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এর প্রেক্ষাপট এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ সৃষ্টি করেছে এক নতুন ইতিহাস এবং জন্ম দিয়েছে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের। কিন্তু এর সঠিক ইতিহাস এবং ২৫শে মার্চের আগের ও পরের ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ নতুন প্রজন্মের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। জাতীয় জীবনের অতীত ইতিহাসের ঘটনাবলীকে সঠিকভাবে পরিবেশন না করা হলে তা জাতির জন্যই ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে।

রাজনৈতিক উত্থান, পতন ও পট পরিবর্তনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যথাযথভাবে উপস্থাপন না করা আত্ম প্রবঞ্চনারই শামিল। ইতিহাস কখনো বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা নয়। এ এক ধারাবাহিক এবং প্রবাহমান বিষয়বস্তু। আর ইতিহাসের নিরপেক্ষ উপস্থাপনা খুবই কঠিন কাজ। বিশেষ করে যারা ইতিহাসের অংশ বা ইতিহাস সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান রাখেন তাদের জন্য এ কাজ আরো কঠিন। জাতি ঐ বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে কিভাবে সাড়া দিয়েছিল বা তখনকার পরিস্থিতিতে রাজ নীতির চালচিত্র এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলোর ভূমিকা কি ছিল পরবর্তী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে অবস্থান করে তার চুলচেরা মূল্যায়ন নিসন্দেহে এক জটিল ব্যাপার। ঘটনা সংঘটিত হয়ে যাবার পর মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে অভ্যস্ত। আর এ কারণেই সঠিক ঘটনা অনেক সময় তলে পড়ে যায়। ঘটনার পেছনে যে ঘটনা থাকে সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার অবকাশ অনেকের থাকে না। বিশিষ্ট লেখক এবং সাংবাদিক জনাব আবুল আসাদ দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে ২৫শে মার্চের আগের ও পরের ঘটনাবলী উপস্থাপনের কষ্টকর প্রয়াস চালিয়েছেন। যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টিতেই তিনি ঐ সময়কার একটি বাস্তব চিত্র অংকনের চেষ্টা করেছেন। তিনি কতটুকু সফল হয়েছেন তা বিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণই বিচার করবেন। আধুনিক প্রকাশনী পাঠক পাঠিকার জন্য সেই সুযোগ সৃষ্টির মানসেই '২৫শে মার্চের আগে ও পরে' গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। একথা বলারই অপেক্ষা রাখে না যে একটি নির্ভুল ও সুন্দর গ্রন্থ উপহার দেয়া কত কঠিন। তদুপরি আমাদের আছে অনেক সীমাবদ্ধতা। মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের সাথে সাথে এ গ্রন্থটি প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

ভূমিকা

গতকাল যা ঘটলো, তা আজকের ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস ক্যামেরার ছবি নয়, কিংবা নয় ঘটনার ধারা বিবরণী। ঘটনার পেছনে যে ঘটনা থাকে তাও ইতিহাসের অংগ। তাই মনে হয় সব লেখার মধ্যে ইতিহাস লেখার কাজ সবচেয়ে কঠিন। আমি পেশায় সাংবাদিক। কোনো ইতিহাস লেখায় হাত দেব, তা কোনো দিন ভাবিনি। না ভাবলেও তা হয়ে গেল। লেখা সবসময় পরিকল্পনার পথ ধরে চলে না, এটাই তার প্রমাণ।

জাতীয় জীবনের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ সময় ১৯৭১ সাল। এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মাধ্যমে পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে এ বছর স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পত্তন হয়। জাতীয় ইতিহাসের অবিস্মরণীয় অধ্যায় এ মহা ঘটনা। এ মহা ঘটনার ইতিহাস আমি এখানে লিখিনি। সে এক বিরাট কাজ। আমি মাত্র দুটো প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে চেষ্টা করেছি। প্রশ্ন দুটো হলো, কোন্ পটভূমিতে স্বাধিকারের আন্দোলন রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপান্তরিত হলো এবং জাতীয় জীবনের সে মহা ঘটনায় কেন জাতি একমত হয়ে এক কাতারে দাঁড়াতে পারেনি।

প্রশ্ন দুটির উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে আমি যা লিখেছি, তা বিভিন্ন সংবাদপত্র ও গ্রন্থের বিবরণী এবং অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তির উক্তির সমাহার মাত্র। সেই সময়ের একজন কর্মজীবী সাংবাদিক হিসেবে যা দেখেছি, যা অনুভব করেছি, তাও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। মানুষ অবশ্যই ক্যামেরা নয়, মানুষ মানুষই। ইচ্ছা, আবেগ বিশিষ্ট জীবন্ত সত্তা সে। এ সীমাবদ্ধতার কথা আমার সামনে ছিল। ইতিহাস বর্ণনায় আমি তাই চেষ্টা করেছি ঘটনাকে অনুসরণ করতে, ঘটনা আমাকে অনুসরণ করেনি। গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতি এক সাথে এক কাতারে দাঁড়াতে পারলো না কেন–এ প্রশ্নের আলোচনায় একজন সাধারণ দর্শকের অবস্থান থেকে গোটা বিষয়কে আমি দেখেছি।

ইতিহাস কারো ইচ্ছা বা আবেগের অধীন নয়। কিংবা কোনো গ্রুপ বা মহলও একে কুক্ষিগত করতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে ইতিহাসের নামে খেয়াল খুশীর চর্চা চলছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেই এটা বেশী হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক যাকে 'মুক্তিযুদ্ধের রূপকথা' রচনার

www.bjilibrary.com

প্রবণতা বলে অভিহিত করেছেন। তবে আমি হতাশ নই। এখন যা কিছু হচ্ছে তা সবই ইতিহাসের কাঁচামাল। এসব কাঁচামাল পরখ করেই লিখিত হবে ইতিহাস। আমি এ গ্রন্থে আমার ইতিহাস বর্ণনায় প্রাপ্ত কাঁচামাল নাড়াচাড়া করে ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুদের কাছে কিছু কথা রাখতে চেষ্টা করেছি।

ঢাকা
২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০

আবুল আসাদ

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

১। প্রথম অধ্যায় ১৭
স্বাধিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপান্তরের কাহিনী ১৭
২। দ্বিতীয় অধ্যায় ১৮৩
স্বাধীনতা যুদ্ধে বিভেদের পটভূমি ও পরিণতি ১৮৩

www.bjilibrary.com

প্রথম অধ্যায়

স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপান্তরের কাহিনী

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

এক

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হলো। সকলের অংশগ্রহণে নির্বাচনটি যেমন সর্বাঙ্গ সুন্দর হতে পারতো তা হয়নি, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে। ভাসানী ন্যাপ শুধু নির্বাচন থেকে সরেই দাঁড়ায়নি, নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোর বিরোধিতাও করেছে। নির্বাচনের প্রায় পূর্ব মুহূর্তে এসে মুসলিম লীগ, আতাউর রহমান খানের ন্যাশনাল লীগও নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াল। নির্বাচনে যে ফল হলো তা পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে আগেই আঁচ করা গিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে বরাদ্দ জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেল ১৬৭টি। আওয়ামী লীগের বাইরে নূরুল আমীন নির্বাচিত হলেন তাঁর পার্টি পি. ডি. পি. থেকে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে উপজাতীয় রাজা ত্রিদিবরায় নির্বাচিত হলেন স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টি পেল ৮৮টি আসন। সেখানে অন্যান্য দলের মধ্যে কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৭, মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) ৯, ন্যাপ (মস্কো) ৭, জমিয়তে উলামা ৭, জামায়াতে ইসলামী ৪, মুসলিম লীগ (কনভেনশন) ২, মারকাযী উলামা ৭ এবং স্বতন্ত্র সদস্যরা ১৪টি আসন লাভ করলো।

নির্বাচনের ফল প্রমাণ করলো, পাকিস্তানের দু অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ দুটি আঞ্চলিক দলের উপর তাদের আস্থা স্থাপন করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে বলা যায় এটা বাঞ্ছিত ছিল। দেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের বাস ছিল এই পূর্ব পাকিস্তানে। অথচ তারাই অর্থনৈতিক এবং নানাদিক থেকে ছিল বঞ্চিত। এ বঞ্চনার অনুভূতি ছিল তাদের মধ্যে অত্যন্ত তীব্র। আর আওয়ামী লীগ যেহেতু আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই তাদের বিজয় ছিল অবধারিত। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক দলের বিজয়কে এ দৃষ্টিতে দেখা যায়নি। তাই সেখানে পিপলস পার্টির বিজয় আঞ্চলিকতাবাদের পাল্টা উত্থান বলে বিবেচিত হলো। পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন বিজয়ী শেখ মুজিবুর রহমান স্বাভাবিকভাবেই এ অঞ্চলের স্বার্থের প্রতীক অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়ালেন। অনুরূপভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর মানুষ, যাদের অবস্থান ছিল ক্ষমতার আশে-পাশে, পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে 'জাতীয় বীর'-এর মর্যাদায় বরিত করলো। তাদের কাছে ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। তারা বলে উঠলো,

www.bjilibrary.com

কিভাবে একটি প্রদেশ সারা দেশকে শাসন করতে পারে ?[১] নির্বাচনের প্রচারণা চলাকালে নানা কথা, নানা উক্তি, নানা আচরণ দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যকার বিশ্বাসের বুনিয়াদকে অনেকখানিই দুর্বল করেছিল, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এ মনোভাবের উত্থান পরিস্থিতিকে সংকট শুধু নয়, সংঘাতের দিকে ঠেলে দিল। এ সংঘাতে ভুট্টো এলেন 'ভিলেন'-এর ভূমিকায়। এ ভিলেন-এর ভূমিকা কি হতে যাচ্ছে, তার উপর একটা সুন্দর মন্তব্য করেছিল ঢাকার একটি দৈনিক। নির্বাচনের পাঁচ দিন পর অর্থাৎ ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৭০, পত্রিকাটি তার সংবাদ ভাষ্যে লিখে ঃ

> "জনসংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দাবী অনেক ঘাটে পানি খেয়ে যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার দ্বারা স্বীকৃতি হলো, তখন থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক বিরাট মোড় নিলো। মনে হলো, রাতারাতি যেনো পুবের হাওয়া পশ্চিমে বইতে শুরু করলো। পশ্চিমের যে শোষক মহল এতোদিন আওয়ামী লীগ সরকার প্রবর্তিত সংখ্যা সাম্যের বদৌলতে পূর্ব পাকিস্তানকে শ্মশানে পরিণত করছিল, হঠাৎ তাদের টনক নড়ে গেল। পশ্চিমের এ শোষক মহলটি হঠাৎ প্রমাদ গুণল। তারা বুঝতে শুরু করলো আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব তার হাতে কেন্দ্রের একচেটিয়া ক্ষমতা অর্পণ করলো। ফলে দীর্ঘ ২৩ বছরের লুট তরাজের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। স্বভাবতই সে মহলের দুর্ভাবনা দেখা দিল। কেন্দ্রীয় ক্ষমতা পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানীরা এতদিনের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেবে। এ মহল আরো মনে করলো, পূর্ব পাকিস্তান থেকে নেবার মত এখন আর কিছুই নেই। এখন কেবল দেবার পালাই চলবে। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে উপর্যুপরি যে হারে ঝড়-বন্যা হচ্ছে তাতে এটাকে তারা বোঝা বই আর কিছুই ভাবছে না।
>
> এ দুর্ভাবনা থেকেই উক্ত মহল যে কোনো অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে রেহাই পাবার পথ খুঁজছিল। তাদের ধারণা দীর্ঘ শোষণে রিক্ত পূর্ব পাকিস্তানকে যদি তারা নিজেরা আলাদা করতে যায়, তাহলে তাদের অভিসন্ধি ধরা পড়ে যাবে। উক্ত মহল তাই পূর্ব পাকিস্তানীদের বিভিন্ন কৌশলে বাধ্য করছিল বিচ্ছিন্নতার কথা ভাবতে।

---

১. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল–সিদ্দিক সালিক, পৃষ্ঠা–৪৫।

www.bjilibrary.com

সাধারণ নির্বাচনই এ মহলের আশার গুড়ে বালি ঢেলেছে। এ মহলের ধারণা ছিলো, কোনো দলই একচেটিয়া আসন পাবে না। শেখ সাহেবও বড়জোর শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ আসন পাবেন। তখন শেখ সাহেবকে ক্ষমতায় বসিয়েও পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকার আদায়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নতার পথে ঠেলে দিবে। সাধারণ নির্বাচন উক্ত মহলের এ চক্রান্ত নস্যাত করে দিয়েছে। সাধারণ নির্বাচনে একটি মাত্র দলের নিরংকুশভাবে জয়ী হবার পর পূর্ব পাকিস্তানীরা এককভাবে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হবে।"[২]

কিন্তু পত্রিকাটির এ আশাবাদ সফল হয়নি। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী পূর্ব পাকিস্তানের দল আওয়ামী লীগের হাতে অবশেষে শাসন ক্ষমতা দেয়া হলো না। পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চলের নেতা হিসেবে আবির্ভূত ভুট্টোর ভূমিকা পরিস্থিতিকে ভয়াবহ সংঘাত ও বিচ্ছিন্নতার দিকেই নিয়ে গেল।

দুই

নির্বাচন হলো সাতই ডিসেম্বর। আট তারিখ সকালের মধ্যেই নির্বাচনের সবটা ফল মানুষের জানা হয়ে গেল। মানুষের প্রতিক্রিয়ার খবর জানাতে গিয়ে ৯ ডিসেম্বর সকালে ঢাকার একটি দৈনিক বললো, দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অবিস্মরণীয় বিজয়ে গণমনের প্রতিক্রিয়া লিখিতভাবে প্রকাশের অবকাশ রাখে না। সংক্ষেপে এতোটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পরক্ষণ হতেই শহরের সকল মহলেই পারস্পরিক সাক্ষাত লগ্নে প্রথম সম্বোধনসূচক কথাটি হয়ে দাঁড়িয়েছে 'জয় বাংলা'।[৩] পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দী জামায়াতে ইসলামীর নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম যদিও বললেন যে, নির্বাচনে পাকিস্তানের রাজনীতি যুক্তির চেয়ে ভাবাবেগ দ্বারাই অধিক পরিচালিত হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশনের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শতকরা ২৫ ভাগ নির্বাচনী আইন সঠিকভাবে পালিত হয়নি, তবু তিনি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলের বিজয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন এবং নিশ্চয়তা দিলেন, আওয়ামী লীগ যাতে জনতাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মতে দেশের

২. দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৭০।
৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭০।

www.bjilibrary.com

শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারে এবং তার সম্ভাব্য সরকার যাতে জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে সে জন্যে আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।[৪]

কিন্তু নির্বাচন বিজয়ী আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়াই ধীরে প্রকাশ পেল। এমন ঐতিহাসিক বিজয়ের পর বড় ধরনের কোনো সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রধান কথা বলবেন, এটাই ছিল স্বাভাবিক। একজন বিদেশী সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্নও করেছিলেন, নির্বাচনে আপনি চূড়ান্তভাবে জয়ী হয়েছেন, তবু আপনি আনুষ্ঠানিক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করছেন না কেন ? জবাবে শেখ সাহেব বলেছিলেন, আমি ১৭ই ডিসেম্বরের প্রতীক্ষা করছি।[৫] অর্থাৎ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ধীরে চলতে চাইছিলেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাড়াহুড়া করে কিছু করা বা বলার পক্ষে তিনি ছিলেন না। সম্ভবত পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের নির্বাচনের ফলাফলই এর কারণ ছিল। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশের চাইতে ওপারের প্রতিক্রিয়াই হয়তো আগে জানতে চাইছিলেন।

কিন্তু মুখ বন্ধ করে থাকতে তিনি পারলেন না। ৯ ডিসেম্বর তারিখে দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকরা দলে দলে গিয়ে হাজির হলো আওয়ামী লীগ অফিসে। সাংবাদিকদের কাছে কথা বলতে বাধ্য হলেন আওয়ামী লীগ প্রধান। এ অনানুষ্ঠানিক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বললেন ঃ

> জনগণের সংগ্রামকে বিজয় মুকুটে ধন্য করার জন্যে আমরা আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ। জনগণের যে বিজয় অর্জিত হয়েছে, তাকে অভিনন্দিত করার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ এবং প্রকৃতির করালগ্রাস হতে জনগণকে রক্ষার জন্যে আমাদের সকল সম্পদ ও শক্তি প্রয়োগের শপথ গ্রহণ করা। পশ্চিম পাকিস্তানে গণজাগরণের যে শুভ সূচনা হয়েছে আমরা তাকে অভিনন্দন জানাই। বাংলার জনগণের বহু বাঞ্ছিত আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে সাহায্য করার জন্যে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের জাগ্রত জনশক্তির প্রতি আহ্বান জানাই। আমাদের পক্ষ হতে আমরা আশ্বাস দিচ্ছি, সামন্ত প্রভু ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের নিস্পেষণ হতে মুক্তির সংগ্রামে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের আমরা সমর্থন জানাব।
>
> আমাদের সামনে যে বিরাট চ্যালেঞ্জ সমুপস্থিত, একমাত্র জনগণের ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তার মুকাবিলা করা সম্ভব হবে

৪. দৈনিক সংগ্রাম এবং দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭০।
৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭০।

www.bjilibrary.com

বলে আমরা বিশ্বাস ও আশা করি। আমাদের জনগণ ভবিষ্যত বংশধরদের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন—এ সত্যই আমাদের শক্তি ও আশার উৎস। মঞ্জিল এখনও দূরে। লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম আমাদের চলতেই থাকবে। ৬ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের বিধান সহ শাসনতন্ত্র এবং তা সার্বিকভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে।[৬]

এ কথাগুলো আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ লিখিত বক্তব্যের একটা অংশ। বক্তব্যের অন্যান্য অংশে তিনি জনগণের এবং আওয়ামী লীগের যারা আন্দোলনে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছে, জেল-জুলুম স্বীকার করেছে, জীবন দিয়েছে, তাদের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছেন। প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসাবে গোটা বক্তব্যটাই সুচিন্তিত এবং জাতীয় নেতাসূলভ। তিনি এখানে পাকিস্তানের সকল মানুষের কথাই চিন্তা করেছেন এবং পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চলের জনগণের তিনি সাহায্য চেয়েছেন এবং তাদের তিনি সহযোগিতা করতে চেয়েছেন। অবশ্য এ বক্তব্যের এক জায়গায় নির্বাচনকে ৬ দফা ও ১১ দফার রেফারেণ্ডাম বলে তিনি অভিহিত করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, ৬ দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে যা নির্বাচনের ভিত্তি লিগাল ফ্রেম ওয়ার্কের বিপরীতার্থক মনে হতে পারে। লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্কটি জারি হয় ১৯৭০ সালের ৩০শে মার্চ। ৪৮টি ধারা এবং বহু উপধারা সম্বলিত এ 'আইন কাঠামো'র মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রশ্নে প্রধান দিক-নির্দেশনাগুলো নিম্নরূপ ছিল ঃ[৭]

(এক) পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্র যার নাম হবে 'পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র'। ফেডারেশনের সাথে প্রদেশগুলো এমনভাবে অন্বিত থাকবে যাতে আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং জাতীয় সংহতি রক্ষিত হয়।

(দুই) পাকিস্তান সৃষ্টির বুনিয়াদ ইসলামী আদর্শ সংরক্ষিত থাকবে এ রাষ্ট্রে। রাষ্ট্র প্রধান হবেন একজন মুসলমান।

(তিন) গণতন্ত্রের মৌল নীতি অনুসারে এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ফেডারেল ও প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত করা হবে।

---

৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭০।

৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ-দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০২।

www.bjilibrary.com

(চার) আইনগত, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা ফেডারেল সরকার এবং প্রদেশগুলোর মধ্যে এমনভাবে বণ্টিত হবে যাতে প্রদেশগুলো সর্বাধিক আইনগত, প্রশাসনিক ও আর্থিক অধিকার ভোগ করতে পারে, আবার অন্যদিকে ফেডারেল সরকার যাতে আইন, প্রশাসন ও আর্থিক ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বিষয়াবলী পরিচালনায় এবং রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় যথেষ্ট শক্তিশালী হন তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(পাঁচ) পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের মানুষ জাতীয় সকল কর্মকাণ্ডে পুর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদেশগুলো এবং প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলসমূহের মধ্যকার অর্থনৈতিক সহ সকল বৈষম্য দূর হবে–এর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

'আইন কাঠামো'র আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের এখানে উল্লেখ করতে হয়। একটি হলো, নির্বাচনের পরে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের প্রথম দিন থেকে ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে না পারলে জাতীয় পরিষদ বাতিল বলে গণ্য হবে। অপরটি হলো, জাতীয় পরিষদের প্রণীত শাসনতন্ত্র যদি প্রেসিডেন্টের মঞ্জুরী লাভে ব্যর্থ হয় তাহলেও জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে।

মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ 'আইন কাঠামো' শুধু নয়, নির্বাচনকেই প্রত্যাখ্যান করে। মস্কোপন্থী ন্যাপ গ্রহণ-বর্জনের কোনো কথা না বলে 'আইন কাঠামো'র ২০ ধারাভুক্ত উপরোল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের বাতিল দাবী করে। আওয়ামী লীগ সহ বাদ-বাকী দল 'আইন কাঠামো' মেনে নেয়।[৮] কিন্তু এ সময় কথা ওঠে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনের লোভেই তার ৬ দফার বিপরীত এ 'আইন কাঠামো' গ্রহণ করে। অভিযোগে বলা হয়, মুজিব-ইয়াহিয়া আঁতাতের কারণেই সরকার নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের 'আইন কাঠামো' বিরোধী তৎপরতা নীরবে মেনে চলে।[৯] জেনারেল ইয়াহিয়ার 'আইন কাঠামো' এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফার মধ্যকার ঝগড়া পাকিস্তানের শেষ দিন পর্যন্ত টিকে ছিল। সেই ঐতিহাসিক ৬ দফায় নিম্নলিখিত ৬টি ধারা ছিল।[১০]

৮. স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতপর, কামরুদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা–৯৯ এবং জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৭ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা–৪৪৮।

৯. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৭ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা–৪৪৮।

১০. Bangladesh-Birth of a Nation, Yatintranath Bhatnagar, pp-68, 69 এবং জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৭ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা–৩৫৯।

www.bjilibrary.com

(এক) পাকিস্তান সত্যিকার অর্থে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হবে। সরকার পদ্ধতি হবে পার্লামেন্টারী ধরনের এবং ফেডারেল ও ফেডারেশনের ইউনিটসমূহের আইন সভা জনসংখ্যা ভিত্তিক প্রত্যক্ষ ও সার্বজনীন নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হবে।

(দুই) ফেডারেল সরকারের হাতে দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় থাকবে। অন্যান্য বিষয় ন্যস্ত থাকবে ফেডারেশনের ইউনিটগুলোর হাতে।

(তিন) পাকিস্তানের দুই অংশের জন্যে পৃথক ও সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে অথবা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যবস্থাসহ দুই অঞ্চলের জন্যে একই মুদ্রা থাকবে। এতে আঞ্চলিক ফেডারেল ব্যাংক থাকবে। এ ব্যাংকগুলো এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদ হস্তান্তর করবে এবং মূলধন পাচার বন্ধের ব্যবস্থা করবে।

(চার) ট্যাক্স ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা ন্যস্ত হবে ফেডারেশনের অংগ রাষ্ট্রগুলোর উপর। অংগ রাষ্ট্রগুলোর ট্যাক্সের একটা অংশ ফেডারেল সরকারকে দেয়া হবে তার আর্থিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে। কর নীতির উপর অংগ রাষ্ট্রগুলোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অভিলক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে ফেডারেল সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন মিটাবার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

(পাঁচ) ফেডারেশনের অন্তর্গত অংগ রাষ্ট্রগুলোর নিয়ন্ত্রণে প্রত্যেকটি ইউনিটের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসাব রাখার শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকবে। শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী ধার্য হারের ভিত্তিতে অংগ রাষ্টগুলো ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাবে। ফেডারেল সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পররাষ্ট্র নীতির কাঠামোর মধ্য থেকে আঞ্চলিক সরকারগুলোকে বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা ও চুক্তির ক্ষমতা শাসনতন্ত্রে দেয়া হবে।

(ছয়) জাতীয় নিরাপত্তায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের জন্যে ফেডারেশনের অংগ রাষ্টগুলোকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিশিয়া রাখার ক্ষমতা দেয়া হবে।

জেনারেল ইয়াহিয়ার 'আইন কাঠামো' এবং আওয়ামী লীগের এই ৬ দফা উভয়ের মধ্যেই ফেডারেল সরকারের কথা আছে এবং আছে ফেডারেল সরকার ও ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগির

www.bjilibrary.com

কথা। কিন্তু আওয়ামী লীগের ছয় দফায় এ ভাগাভাগির ব্যাপারটা স্পষ্ট। ফেডারেল সরকার কি পাবে, ফেডারেল ইউনিটগুলোর কি কি ক্ষমতা থাকবে তা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। জেনারেল ইয়াহিয়ার আইন কাঠামোতে তা নেই। সেখানে শক্তিশালী ও কার্যকর ফেডারেল সরকারের কথা আছে এবং সেই সাথে আছে ইউনিটগুলোকে 'সর্বাধিক' ক্ষমতা দেবার কথা। সুতরাং আইন-কাঠামোতে ব্যাখ্যা এবং দর কষাকষির ফাঁকে রয়ে গেছে। এ ফাঁক অবলম্বন করেই ২৫শে মার্চ, ৭১, পর্যন্ত বিতর্ক চলেছে এবং চেষ্টা হয়েছে আইন কাঠামো এবং ৬ দফার সমন্বয় সাধনের। আওয়ামী লীগ চেয়েছে আইন কাঠামোকে ৬ দফার উপর এনে সেট করতে। আর সরকার চেয়েছে আইন কাঠামো সম্পর্কে তার নিজের যে ব্যাখ্যা রয়েছে, সেই অনুসারে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন–সমস্যার সমাধান করতে। বস্তুত আওয়ামী লীগ নির্বাচনের স্বার্থে 'আইন কাঠামো' মেনে নিয়েছে বটে, কিন্তু ৬ দফার দাবী থেকে সে এক ইঞ্চিও সরে আসেনি। আওয়ামী লীগ তার গোটা নির্বাচনী প্রচারণা ৬ দফার ভিত্তিতেই চালিয়েছে।[১১] সুতরাং নির্বাচনের পরে যদি আওয়ামী লীগ প্রধান নির্বাচনকে ৬ দফার রেফারেণ্ডাম বলেন এবং ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে চান, তাহলে তাঁর জন্যে এটা অন্যায় নয়।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কথা রাখলেন। ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের আগে কিছুই বললেন না আর তিনি। মাঝখানে ১১ই ডিসেম্বর অবশ্য নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পশ্চিম পাকিস্তানস্থ সহ-সভাপতি বি. এ. সলিমী নির্বাচনোত্তর এক সাংবাদিক সম্মেলনে লাহোরে বললেন, দেশের সকল অঞ্চলের স্বার্থে ৬ দফা প্রণীত হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের দাবী-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তার দল ৬ দফা কর্মসূচীতে সামান্য সংশোধনের কথা বিবেচনা করতে পারে।[১২] নির্বাচনোত্তর কালে ৬ দফা প্রশ্নে আওয়ামী লীগের প্রথম নমনীয় মনোভাবের প্রকাশ এ বক্তব্যে পাওয়া গেল। কিন্তু এ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের প্রতি আওয়ামী লীগ হেড কোয়ার্টারের তখন স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির কোনোটাই পাওয়া যায়নি। আওয়ামী লীগ হেড কোয়ার্টারের মতোই এ সময় ভুট্টোর পিপলস পার্টি নীরব ছিল। সরকারও এ সময় কিছু বলেনি। মনে হয়েছে, সবাই বিবেচনা করেই কথা বলতে চায়। পার্শ্ব রাজনীতি কিন্তু এ সময় নীরব

১১. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৭ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা–৪৪৮।
১২. পি পি আই, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ এবং দৈনিক সংগ্রাম, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৭০।

www.bjilibrary.com

এ সময় নীরব ছিল না। ৮ই ডিসেম্বর মাওলানা ভাসানী ভোলার এক জনসভায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার সর্বশেষ সংগ্রামে সকলকে শামিল হবার জন্যে আহ্বান জানালেন।[১৩] পরের দিন ঢাকায় তিনি একটি সাংবাদিক সম্মেলনে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' আন্দোলনের ঘোষণা দিলেন। তিনি আওয়ামী লীগের বিজয়কে স্বাধীনতার জন্যে গণভোট বলে অভিহিত করলেন।[১৪] ১২ই ডিসেম্বরের দিকে মাওলানা ভাসানীর সাথে কণ্ঠ মেলালেন কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা এ. এস. এম. সুলায়মান এবং জনাব আতাউর রহমান খানের মতো আরও কিছু নেতা।[১৫] বৃটিশ প্রচার মাধ্যমও এ সময় আওয়ামী লীগ প্রধানের সাথে সাক্ষাতকারের বরাত দিয়ে এ ধরনের প্রচারণা চালায়। বৃটেনের পত্র-পত্রিকাগুলো পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনের ফলাফলকে বিচ্ছিন্নতার পক্ষে রায় বলে প্রচার করে। এমনকি বৃটেনের একটা টেলিভিশনে একথাও বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার দাবী যদি বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থা সৃষ্টি করে, তাহলে রিলিফ কাজে নিয়োজিত মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্য অবিলম্বে দুর্গত এলাকা ত্যাগ করবে।[১৬]

এ পার্শ্ব রাজনীতি পূর্ব পাকিস্তানের মূল রাজনৈতিক ধারার কোনো ক্ষতি করতে পারলো না। মাওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান, এ. এস. এম. সুলায়মান প্রমুখ নেতারা নির্বাচন বিজয়ী আওয়ামী লীগের তখনকার প্রয়াসকে বিপদগ্রস্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে, নির্বাচনে (পূর্ব পাকিস্তানে) দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে আবির্ভূত জামায়াতে ইসলামী আওয়ামী লীগকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। ১৯শে ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম প্রাদেশিক নির্বাচনের রায় মেনে নিয়ে সত্যিকার গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সাথে সহযোগিতার কথা ঘোষণা করে বলেন, 'নির্বাচনে সকল প্রকার অনিয়ম ও অসদুপায় সত্ত্বেও জনগণের রায় স্পষ্ট। জনগণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শেখ সাহেবের প্রতি তাদের যে আস্থা প্রকাশ করেছেন, তাকে আমরা শ্রদ্ধা করি।[১৭] তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে দেশের সংঘবদ্ধ এক বিদেশী

---

১৩. সংবাদ, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭০।
১৪. সংবাদ, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭০।
১৫. Bangadesh-Birth of a Nation, Yatintranath Bhatnagar, p-333.
১৬. দৈনিক সংগ্রাম, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৭০।
১৭. দৈনিক পাকিস্তান (পরিবর্তে দৈনিক বাংলা), ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭০।

www.bjilibrary.com

চক্রের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এরা যে কোনো মুহূর্তে অগণতান্ত্রিক ও অনিয়মতান্ত্রিক পন্থার আশ্রয় নিয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াসে লিপ্ত হতে পারে।[১৮]

পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক মূলধারাটি বিজ্ঞতার সাথেই সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু ভুট্টোর একটি বিবৃতি নাজুক এক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটাল। জনাব ভুট্টো ২০শে ডিসেম্বর লাহোরে বললেন, 'আমার দলের সহযোগিতা ছাড়া কোনো শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কিংবা কেন্দ্রে কোনো সরকার পরিচালনা করা যাবে না। পাঞ্জাব ও সিন্ধু ক্ষমতার দুর্গ বিশেষ। যেহেতু পিপিপি এ প্রদেশ দুটিতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে, সে কারণে যে কোনো কেন্দ্রীয় সরকারের জন্যে তাঁর দলের সহযোগিতা অনিবার্য প্রয়োজন।[১৯]

জনাব ভুট্টো এ উক্তির মাধ্যমে স্পষ্টতই হুমকি দিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগকে। পশ্চিম পাকিস্তানের, যাকে তিনি ক্ষমতার দুর্গ বলেছেন, প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে শাসন ক্ষমতায় স্থান পাওয়া তাঁর যেন অধিকার। পরে এ মনোভাবটা তাঁর আরও স্পষ্টভাবে জানা গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে একমাত্র তাঁর দলই পশ্চিম পাকিস্তানীদের পক্ষে কথা বলতে পারে।'[২০] অর্থাৎ জনাব ভুট্টো গণতান্ত্রিক পথ পরিহার করে পশ্চিম পাকিস্তানকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের সামনে দাঁড় করালেন এবং নিজেকে উপস্থিত করলেন তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে। এ মনোভাব পশ্চিম পাকিস্তানের যারা ভুট্টোকে তাদের স্বার্থের সর্বজয়ী বীর মনে করেছিল, তাদের খুশিই করলো। তবে সেখানকারও অনেকে এতে বিরক্ত হলো, উদ্বিগ্ন হলো। তারা বললো, তেইশ বছর ধরে আমরা তাদের (বাঙ্গালাদেশীদের) উপর আধিপত্য করেছি, এখন তাদের সময়, সবসময় তাদের সাথে প্রতারণা করা উচিত নয়।[২১] আর ভুট্টোর বক্তব্য তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো পূর্ব পাকিস্তানে। আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব তাজউদ্দীন ভুট্টোর বক্তব্যের সাথে সাথে প্রতিবাদ জানালেন। তিনি বললেন, আওয়ামী লীগ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে এবং কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে একাই যোগ্য। কেউ সাহায্য করলে ভালো, সাহায্য না করলেও আওয়ামী লীগ

১৮. দৈনিক সংগ্রাম, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭০।
১৯. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, সিদ্দিক সালিক, পৃষ্ঠা-৪৫।
২০. পিপিআই পরিবেশিত খবর, দৈনিক সংগ্রাম, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭০।
২১. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, সিদ্দিক সালিক, পৃষ্ঠা-৪৫।

www.bjilibrary.com

এককভাবেই সেটা করবে। পাঞ্জাব এবং সিন্ধু কোনোভাবেই 'ক্ষমতার দুর্গ' হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে পারে না।[২২] অত্যন্ত কঠোর ভাষায় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন জামায়াতে ইসলামীর পূর্ব পাক নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম। তিনি বলেন, জনাব ভুট্টো আগে জনৈক ডিক্টেটর কর্তৃক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বের পরিবর্তনশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখন তিনি একজন রাজনীতিবিদে পৌঁছেছেন। জনাব গোলাম আযম ভুট্টোকে গণতান্ত্রিক মনোভাবগ্রহণ করে একজন দায়িত্বশীল রাজনীতিকের মতো কথাবার্তা বলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, নির্বাচনের পূর্বে জনাব ভুট্টোর ভাবধারা যাই হোক না কেন, যেহেতু তিনি এখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছেন, সুতরাং এক্ষণে তাঁর গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগি গ্রহণ করা উচিত।[২৩] শীঘ্রই জনাব ভুট্টোকে কিছুটা নরম দেখা গেল। ২৭শে ডিসেম্বরের করাচী সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি নরমে-গরমে মিশিয়ে বক্তব্য রাখলেন। তিনি একদিকে জানালেন, জাতীয় পরিষদে তাঁর দলকে বিরোধী দলে রাখার যে কোনো প্রচেষ্টা প্রতিহত করবেন, অন্যদিকে তিনি বললেন, আমরা সরকারে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং তাদের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করছি।' এই সাথে কেন্দ্রকে দুর্বল না করে শাসনতন্ত্রে সমস্ত প্রদেশকে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন দানে জনাব ভুট্টোর সম্মত হবার কথাও জানা যায়।[২৪] ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে সংবাদ সংস্থা এপিপি আরেকটা সুসংবাদ পরিবেশন করে। খবরটিতে বলা হয়, আগামী মাসের প্রথম দিকে জনাব ভুট্টোর ঢাকা সফরের পরিকল্পনা রয়েছে। ঢাকায় তিনি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাত করবেন এবং তাঁর সাথে দেশের পাঁচটি প্রদেশের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলনকারী একটি শাসনতন্ত্র তৈরির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আলোচনা করবেন।[২৫]

জনাব ভুট্টোর এই এগিয়ে আসা পূর্ব পাকিস্তানের শুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। ঢাকায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, আইন সভায় নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও আমি বলতে পসন্দ করি না যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য প্রতিনিধিদের সহযোগিতা চাই না। অবশ্যই আমরা এটা চাই।[২৬]

---

২২. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, সিদ্দিক সালিক, পৃষ্ঠা-৪৫।

২৩. দৈনিক সংগ্রাম, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭০।

২৪. দৈনিক সংগ্রাম, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭০, নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা-৪৬ এবং দৈনিক পাকিস্তান, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭০।

২৫. দৈনিক সংগ্রাম, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭০।

২৬. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, সিদ্দিক সালিক, পৃষ্ঠা-৪৬।

www.bjilibrary.com

মুজিব-ভুট্টোর মধ্যে এ বাক্য বিনিময়ের পর মনে হলো, শাসনতন্ত্র প্রশ্নে ৬ দফা এবং 'আইন কাঠামো' কাছাকাছি হওয়ার বোধহয় একটা সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ ভুট্টো রাজি হলে ইয়াহিয়া বা সরকার গররাজি থাকবে না সবাই তা জানে। তাই সকলেই আশা করলো, ঢাকায় মুজিব-ভুট্টো সাক্ষাত পরিস্থিতির জটিলতা সহজ করবে, সমাধানকে ত্বরান্বিত করবে। কিন্তু শীঘ্রই এ আশাবাদে বিরাট ছেদ নামলো। ৩রা জানুয়ারী আওয়ামী লীগ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তার জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান করলো। লক্ষ লক্ষ লোকের এ সমাবেশে শেখ মুজিব দীর্ঘ ভাষণ দেন। ভাষণে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তিনি বললেন, '৬ দফা আজ জনগণের ম্যাণ্ডেট লাভ করেছে। ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্র তাই ৬ দফার ভিত্তিতেই রচিত হবে। আওয়ামী লীগ আজ শুধু বাংলাই প্রতিনিধিত্ব করছে না। সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যা গুরু দল। তাই সমগ্র দেশ শাসনের অধিকার আমাদেরই। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আমরা যে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো, তাই পাকিস্তানের জনগণ গ্রহণ করবে। শাসনতন্ত্রের পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করলে চরম সংগ্রাম শুরু হবে।' এ বক্তৃতাই শুধু নয়, এ বিষয়ের উপর শপথ গ্রহণও করা হয়। এ শপথ গ্রহণের ভাষা ছিল এ রকম ঃ

> "আমরা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় নবনির্বাচিত সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহণ করিতেছি পরম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার নামে ছয় দফা ও এগার দফা কর্মসূচীর উপর প্রদত্ত সুস্পষ্ট গণরায়ের প্রতি আমরা একনিষ্ঠরূপে বিশ্বস্ত থাকিব এবং শাসনতন্ত্রে ও বাস্তব প্রয়োগে ছয় দফা কর্মসূচী ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ও এগার দফা কর্মসূচীর প্রতিফলন ঘটাইতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিব।"[২৭]

ছয় দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আওয়ামী লীগের এ ঘোষণা নতুন নয়। একথা সে নির্বাচনের আগেও বলেছে, পরেও বলেছে। তবে সকলে মিলে আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ এই প্রথম। আল্লাহর শপথ যেহেতু, তাই একে স্বাভাবিকভাবেই আলাদা দৃষ্টিতে দেখার কথা। সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে এ ব্যাপারটা কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায় ঢাকাস্থ পাক সেনাবাহিনীর একজন অফিসারের কথায়। তিনি বলেছেন, 'মনে হলো আমরা আবার চতুষ্কোণ

---

২৭. দৈনিক সংগ্রাম, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭১।

www.bjilibrary.com

পরিসরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি। আওয়ামী লীগ এবং তার নির্বাচিত সদস্যরা ছয় দফার ব্যাপারে শপথ নিয়ে প্রকাশ্যে নিজেদের বেঁধে ফেললেন। দেয়া-নেয়ার যাবতীয় আশার সুতো যেন ছিন্ন হয়ে গেল।'[২৮] লক্ষণীয় একটা ব্যাপার হলো, শেখ মুজিবের এ কঠোর সিদ্ধান্ত ঘোষণার কোনো প্রতিক্রিয়া ভুট্টোর কাছ থেকে এলো না। ভুট্টো ২৮শে জানুয়ারীর আগে মুখ খুললেন না। সরকারকেও নীরব দেখা গেল। কিছু বলার চেয়ে এ না বলাটাই বেশী মারাত্মক মনে হলো। শেখ মুজিব তাঁর ৩রা জানুয়ারীর শপথ-সমাবেশেই নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ইয়াহিয়ার কর্মচারীদের একাংশ নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।' সন্দেহ নেই এ ধরনের ষড়যন্ত্র তখন থাকলে শেখ মুজিবের ৩রা জানুয়ারীর সিদ্ধান্ত তাকে আরও জোরদার হবারই সুযোগ করে দিল। ৪ঠা জানুয়ারী ছিল ছাত্র লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। ছাত্র লীগের সম্মেলনে শেখ মুজিবকে কথা বলতে হয়। ৩রা জানুয়ারী তিনি যা বলেছিলেন, তাঁর চেয়েও বেশী কিছু বলার প্রচণ্ড চাপ এলো তার উপর। কিন্তু ছাত্রদের এ চাপ এড়িয়ে গিয়ে তিনি তাদের বুঝালেন, যদি প্রয়োজন পড়ে আমি ডাক দেব, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে।[২৯] আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের এ বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট কোনো কথা নেই, কিন্তু নিজেদের সিদ্ধান্তের উপর অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কথা এখানে পুর্নব্যক্ত হয়েছে। আর 'আমি ডাক দেব' কথার মধ্যে কেউ নতুন হুমকির সন্ধান পেতে পারেন।

এ পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভাষণের ঠিক এক সপ্তাহ পর ১১ই জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা এলেন। বিমান বন্দরেই সাংবাদিকরা তাঁকে ছেঁকে ধরলো। তিনি অনেক প্রশ্নের জবাব দিলেন। প্রশ্নগুলোর সবই ছিল পরিস্থিতির বিভিন্ন দিকের উপর। তিনি যা বললেন, তার সারাংশ হলো ঃ 'আইনগত কাঠামো অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে ১২০ দিনের প্রয়োজন এবং তিনি আশা করছেন এটা দশ দিনের ভেতরও হতে পারে। তা নির্ভর করছে নির্বাচিত সংসদের উপর। আইনগত কাঠামো নির্দেশ ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা স্কীম। ক্ষমতা হস্তান্তরের সব পদ্ধতি এর উপরই নির্ভর করছে।'[৩০] ইয়াহিয়া খানের কথাগুলোর মধ্য দিয়ে বুঝা গেল শাসনতন্ত্র আইনগত কাঠামোর ভিত্তিতে হতে হবে এবং তা হতে হবে ১২০ দিনের মধ্যেই। তার পরেই হতে পারে

২৮. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা-৪৬।

২৯. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা-৪৭।

৩০. দৈনিক সংগ্রাম, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৭১।

www.bjilibrary.com

ক্ষমতা হস্তান্তর। অর্থাৎ আইন কাঠামোই মূল কথা। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এ সংক্রান্ত আরও কঠোর মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর আর একটি কথায়। জনৈক সাংবাদিক প্রেসিডেন্ট এখনো আইনগত কাঠামো নির্দেশের উপর দৃঢ় কিনা জিজ্ঞেস করলে জেনারেল ইয়াহিয়া বলেন, যদি আমি ক্ষমতা হস্তান্তর করবো না বলে আমার মনোভাব পরিবর্তন করে থাকি, তাহলে আইনগত কাঠামো নির্দেশ থাকবে না।[৩১] প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার একথার পরিষ্কার অর্থ হলো, আইনগত কাঠামো না মানলে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন না। এদিন আরেকটা মজার কথা বলেন জেনারেল ইয়াহিয়া। শাসনতন্ত্র তৈরির ব্যাপারে শেখ মুজিব, ভুট্টো এবং প্রেসিডেন্টের মধ্যে কোনো ত্রিদলীয় সম্মেলন হবে কিনা জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, তাদের নিজেদের মধ্যেই আলোচনা হতে পারে। আমি কেউ না, আমি কোনো আলাদা শক্তি নই।[৩২] এখানে জেনারেল ইয়াহিয়া 'আমি কোনো আলাদা শক্তি নই' বলে নিজেকে সম্ভবত তিনি জনাব ভুট্টোর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। ভুট্টো রাজী হলে তিনিও রাজী। তাই তিনি তাদের দুজনের আলোচনার কথা বলেছেন। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে 'আইনগত কাঠামো' বড় কথা নয়, বড় কথা হলো ভুট্টোর একমত হওয়া।

শেখ মুজিব এবং জেনারেল ইয়াহিয়া ১২ই জানুয়ারী সকালে প্রেসিডেন্ট ভবনে আলোচনা শুরু করলেন দুজন দুই প্রান্তিক মনোভাব নিয়ে। দু ঘণ্টা আলোচনা হলো। শেখ মুজিবের সাথে কেউ ছিলেন না। ইয়াহিয়ার সাথে ছিলেন প্রেসিডেন্টের মুখ্য স্টাফ অফিসার জেনারেল পীরজাদা এবং গবর্নর আহসান। বৈঠক শেষে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব সাংবাদিকদের জানালেন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও জাতীয় সমস্যা নিয়ে তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা করেছেন। তাঁদের আলোচনা সন্তোষজনক হয়েছে।[৩৩] পরদিন ১৩ই জানুয়ারী দ্বিতীয় দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো। এ দিন শেখ মুজিবের সাথে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব মনসুর আলী, জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এবং জনাম কামারুজ্জামান। এদিনও শেখ মুজিব বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। তিনি জানালেন, পরিষদের অধিবেশনের সম্ভাব্য তারিখ নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁর আলোচনা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কেও তাঁদের মধ্যে

৩১. দৈনিক সংগ্রাম, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৭১।
৩২. দৈনিক সংগ্রাম, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৭১।
৩৩. দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৭১।

www.bjilibrary.com

আলোচনা হয়েছে এবং আলোচনায় তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।[৩৪] উল্লেখ্য, এ বৈঠকেই ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠানেও রাজী হন। ১৪ই জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন। বিমান বন্দরে জেনারেল ইয়াহিয়া সাংবাদিকদের বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের উভয়ের মধ্যকার বৈঠক সম্পর্কে যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ ঠিক। আলোচনা করে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমান শীঘ্রই তাঁর সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন। তিনি পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী।'[৩৫] করাচী পৌঁছেও ইয়াহিয়া খান অনুরূপ কথাই বলেন। সেখানে সাংবাদিকদের তিনি জানান, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের সাথে তাঁর আলোচনা সন্তোষজনক হয়েছে, শেখ সাহেবও আলোচনায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আলোচনা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং ইনশাআল্লাহ আমরা গন্তব্যে পৌঁছতে পারবো।[৩৬]

মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার উপরোক্ত বিবরণে মূল সমস্যা অর্থাৎ আইন-কাঠামো এবং ৬ দফার মধ্যকার সমন্বয় সংক্রান্ত কোনো কথা না থাকলেও শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার কথাবার্তা থেকে বুঝা যায়, তাদের সন্তোষজনক আলোচনা হয়েছে এবং পরিস্থিতিরও উন্নতি ঘটেছে। বিশেষ করে শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলা এবং জাতীয় পরিষদের বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে আলোচনায় কোনো সংকট সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত এটাই প্রকৃত চিত্র নয়। এ সুন্দর বহিরাংগের আড়ালে আরেকটা দৃশ্য আছে যা নয়ন-সুখকর নয়। মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনায় উপস্থিত পূর্ব পাক গবর্নর এডমিরাল আহসানের বরাত দিয়ে পাক সেনাবাহিনীর একজন অফিসার আলোচনার যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা এই ঃ ইয়াহিয়া, পীরজাদা এবং আহসান আলোচনার এক পাশে বসলেন। অন্য পাশে বসলেন মুজিব, খন্দকার মোশতাক, তাজউদ্দীন এবং অন্যান্য সহকর্মী। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মুজিবই কথা বললেন বেশী। তাঁর ৬ দফাকে তিনি এক এক করে তুলে ধরলেন। প্রত্যেকটা দফা ব্যাখ্যার পর তিনি বললেন, 'দেখুন এর মধ্যে আপত্তিজনক কিছু নেই। এখানে খারাপ কি আছে ? এটা অত্যন্ত সরল।' ইয়াহিয়া এবং তাঁর সাহায্যকারীরা শুধু শুনলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া মাঝে-মধ্যে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। কিন্তু মুজিব অত্যন্ত চমৎকারভাবে তাঁকে হটিয়ে দিলেন। সবশেষে ইয়াহিয়া বললেন, 'আমি

৩৪. দৈনিক সংগ্রাম, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৭১।
৩৫. দৈনিক সংগ্রাম, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭১।
৩৬. দৈনিক সংগ্রাম, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭১।

www.bjilibrary.com

আপনার ছয় দফা গ্রহণ করছি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে এর বিরুদ্ধবাদী মতামত দারুণ প্রবল। পশ্চিম পাকিস্তানকে সাথে নিয়ে আপনার এগুতে হবে।' মুজিব সাথে সাথে বললেন, 'অবশ্যই অবশ্যই। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানকে আমাদের সাথে নিয়েই এগুবো। আমরা তাদের সাথে পরামর্শ করবো। আমরা শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। আমরা ছয় দফার ভিত্তিতেই সেটা তৈরি করবো। এর মধ্যে কোনো গলদ থাকবে না।' ইয়াহিয়া খান তাঁর পুরু ভ্রূ জোড়া নাচিয়ে বিদেশী সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন এবং চুপচাপ রইলেন।[৩৭]

মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার আরেকটা চিত্র পাওয়া যায় তদানীন্তন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব জি. ডব্লিউ. চৌধুরীর কাছ থেকে। তিনি প্রেসিডেন্টের সফর সঙ্গী ছিলেন। তিনি জানান, 'যে মুহূর্তে (মুজিব-ইয়াহিয়া মিটিং শেষ হলো, সেই মুহূর্তে) প্রেসিডেন্ট হাউজ থেকে ডাক এলো ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করার জন্যে। আমি তাকে হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায় দেখলাম। তাঁর মন ছিল বিতৃষ্ণ। তিনি আমাকে বললেন, 'মুজিব আমাকে ডুবিয়ে দিয়েছে। যারা তার ব্যাপারে আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল, দেখছি তারাই ঠিক। আমি এ লোকটিকে বিশ্বাস করে ভুল করেছি।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি মুজিবকে নির্বাচনের আগে দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন ?' ইয়াহিয়ার জবাব ছিল মনস্তাপমূলক। বললেন, 'আপনি এবং আমি কেউ রাজনীতিক নই। তাঁদের মন ও চিন্তাধারা আমার পক্ষে বুঝা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবু আসুন আমরা ভালোর জন্যে আশা পোষণ করতে পারি এবং প্রার্থনা করতে পারি।[৩৮]

মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার উপরোক্ত অন্তর-চিত্র সন্তোষজনক আলোচনার বহির্দৃশ্যকে মিথ্যা প্রমাণ করলো। ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের ছয় দফা গ্রহণ করেননি, বরং তাঁকে প্রতিশ্রুতি ভংগকারী হিসেবে ধরে নিয়েছেন। নির্বাচনের আগে শেখ মুজিব তাঁকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা বলা মুশকিল। হয়তো শেখ মুজিব আইন কাঠামো (L.F.O.) মেনে নিয়ে নির্বাচনের পর ৬ দফা থেকে সরে আসতে চেয়েছিলেন। এখন শেখ মুজিব ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে চাওয়ায় তিনি রুষ্ট হয়েছেন। গবর্নর আহসানের দেয়া তথ্য থেকে আরেকটা জিনিসও পরিষ্কার হচ্ছে, ইয়াহিয়া আসলে কোনো ফ্যাক্টর নয়। পশ্চিম পাকিস্তান অর্থাৎ ভুট্টোর ইচ্ছা

৩৭. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, সিদ্দিক সালিক, পৃষ্ঠা–৪৭।
৩৮. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, সিদ্দিক সালিক, পৃষ্ঠা–৪৮।

www.bjilibrary.com

-অনিচ্ছাই হলো আসল ব্যাপার। প্রশ্ন হলো, ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের ৬ দফা গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন কেন ? হয়তো তিনি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবকে বোকা বানাতে অথবা তাঁকে এক মিথ্যা সন্তোষ্টিতে ভরে রাখতে চেয়েছিলেন।

ইয়াহিয়াকে শেখ মুজিব কি সে দিন বুঝেছিলেন ? মনে হয় না। ইয়াহিয়া তার ৬ দফা গ্রহণ করায় তিনি খুশীই হয়েছিলেন। ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের সম্মতিও তাঁকে আনন্দিত করেছিল। তবে একথা তিনি নিশ্চয় বুঝেছিলেন, ৬ দফা গ্রহণ করা বা না করার আসল সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে ভুট্টোর উপর। সুতরাং সমস্যা যেখানে ছিল, সেখানেই রয়ে গেছে। এরপরও ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনা শেষে তিনি সরল সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন এ জন্য যে, তিনি ইয়াহিয়ার মনের কথাটা জানতেন না, দ্বিতীয়ত তিনি হয়তো মনে করেছিলেন ইয়াহিয়াকে তিনি তাঁর কথা বুঝাতে পেরেছেন এবং তৃতীয়ত তিনি আন্তরিকভাবে সমস্যার সমাধান চাইছিলেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা থেকে করাচী গিয়ে সেখানে একদিন থাকলেন। তারপর চলে গেলেন লারকানায় ভুট্টোর বাড়ীতে। ঢাকাতেই ইয়াহিয়া সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন, তিনি ঢাকা থেকে ফিরে লারকানা অঞ্চলে যাবেন পাখি শিকারে, সেখানে ভুট্টোর সাথেও দেখা হবে। আসলে পাখি শিকারের ব্যাপারটা ছিল একটা বাহানা। প্রেসিডেন্টের প্রোগ্রাম এভাবেই ঠিক হয়েছিল যে, তিনি ঢাকায় মুজিবের সাথে আলোচনা করেই দেখা করবেন ভুট্টোর সাথে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, আলোচনার ফলাফল ভুট্টোকে অবহিত করা।

ইয়াহিয়া ১৭ই জানুয়ারী ভুট্টোর সাথে তাঁর লারকানার বাড়ীতে আলোচনা করলেন। কি আলোচনা হয়েছিল তা কোনো দিনই জানা যাবে না। তবে এ ব্যাপারে ভুট্টো তাঁর বইতে একটা বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ঢাকা থেকে ফিরে এসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর কয়েকজ ন উপদেষ্টা সহ ১৭ই জানুয়ারী লারকানা শহরে আমার বাড়ীতে আসেন। ঢাকা আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন। ঐ আলোচনায় তিনি মুজিবুর রহমানকে বলেন যে, 'আওয়ামী লীগের জন্যে তিনটি বিকল্প পথ খোলা আছে, যথা, এককভাবে চলার চেষ্টা করা, পিপলস পার্টির সাথে সহযোগিতা করা অথবা পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট ও পরাজিত পার্টিসমূহের সহযোগিতা নেয়া এবং তাঁর মতে উত্তম হচ্ছে দুটি

www.bjilibrary.com

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়া। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা ছয় দফার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এতদসত্ত্বেও আমরা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছি যে, অবস্থার উন্নতির জন্যে আমরা যে কোনো ধরনের প্রচেষ্টা নিতে স্থির প্রতিজ্ঞ।[৩৯]

লারকানায় ভুট্টো-ইয়াহিয়া যে সলাপরামর্শ হয়েছিল, তার মাত্র দু একটা কথাই এখানে ভুট্টোর কথার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। তবু এ থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে, ভুট্টোর সাথে শেখ মুজিবের আপোস করার মধ্যেই সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে। অবশ্য ইয়াহিয়ার কথায় পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট ও পরাজিত দলগুলোর সাথে শেখ মুজিবের সহযোগিতাকেও একটা বিকল্প হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু এটা ছিল কথার কথা। ভুট্টো যেখানে নিজেকে পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলার একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে স্থাপন করেছেন, সেখানে এ বিকল্পের অবকাশ কোথায়! মনে পড়ে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের পাঁচ দিন পর ১৩ই ডিসেম্বর ঢাকার একটি পত্রিকা তার এক ভাষ্যে এ বিকল্পের কথাই লিখেছিল। বলেছিল, 'দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে শেখ সাহেবকে পশ্চিম পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য একটি অংশের সমর্থন পেতে হবে। সে ক্ষেত্রে হয় জনাব ভুট্টো সাহেবের সাথে, নয় তো তাঁর বিরোধী দলগুলোর সাথে তাঁকে হাত মেলাতে হবে। ভুট্টো সাহেবকে যেহেতু উক্ত স্বার্থান্বেষী (যারা ২৩ বছর ধরে পূর্বে পাকিস্তানকে শোষণ করার জন্য দায়ী) চক্রের সমর্থনে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব পেতে হয়েছে তাই তিনি তাদের স্বার্থের প্রশ্নে কোনোরূপ আপোষ করতে রাজী হবেন না। এ অবস্থায় কেবল ভুট্টো বিরোধী দলগুলোই শেখের কাছে অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য হবে।[৪০] আসলে এ বিকল্পটিই ছিল সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে সহজ উপায়। কিন্তু ভুট্টো সাহেব তা হতে দেননি। যাই হোক, ইয়াহিয়া-ভুট্টো বৈঠককে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভালো চোখে দেখা হয়নি। অনেকেই একে 'লারকানা ষড়যন্ত্র' বলে অভিহিত করেছেন।[৪১] বিশেষ করে এ আলোচনার সময় হঠাৎ করে সেখানে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হামিদের উপস্থিত হওয়াকে সবাই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেছেন। এছাড়া সংখ্যালঘু দলের নেতার বাড়ীতে গিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সংখ্যাগুরুদলের নেতাকে বঙ্গভবনে ডেকে পাঠিয়ে আলোচনাকে সংখ্যাগুরু

---

৩৯. The great Tragedy : Z. A. Butto.
৪০. দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭০।
৪১. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা–৪৯।

www.bjilibrary.com

দলের নেতার প্রতি অপমান বলেও মনে করা হয়েছে। প্রকৃতই বিষয়টা একেবারে এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়।

২৭শে জানুয়ারী ভুট্টো এলেন ঢাকায়। ইয়াহিয়ার সাথে লারকানা বৈঠকেই প্রকাশ পেয়েছিল ভুট্টোর এ ঢাকা আগমনের কথা। সন্দেহ নেই তিনি ঢাকা এসেছিলেন তাঁর মত এবং ইয়াহিয়ার মতের সমন্বিত একটা যোগফল নিয়ে। ঢাকা বিমান বন্দরে ভুট্টো সাংবাদিকদের বললেন, শাসনতন্ত্র রচনার প্রশ্নে বিশেষ করে একটি ফেডারেল রাষ্ট্রের জন্যে শাসনতন্ত্র রচনা করতে হলে দেশের সকল অংশের নেতৃবৃন্দের একটি বিশেষ ঐকমত্যে পৌছা একান্ত কর্তব্য। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মতামত সম্পর্কে তাদের সাথে বসে খোলাখুলি আলাপ করার মন নিয়েই তিনি এখানে এসেছেন। সাম্প্রতিক নির্বাচনে দেশের দু অংশের বিজয়ী প্রতিনিধিরা জনগণের কাছ থেকে ম্যাণ্ডেট লাভ করেছেন। ফলে তাদের কাঁধে অপরিসীম দায়িত্বের বোঝা চেপেছে। জনগণের আস্থার তারা অশ্রদ্ধা করতে পারেন না।[৪২]

ভুট্টোর বিমান বন্দরের কথার দ্বারা বুঝা গেল নিজের জন্যে নির্দিষ্ট একটা অবস্থান স্থির করেই ভুট্টো ঢাকা এসেছেন। জনগণের ম্যাণ্ডেট লাভ করার কারণে শেখ মুজিব যদি ৬ দফা থেকে কিছু ছাড় দিতে না পারেন, তাহলে তিনিও পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের ম্যাণ্ডেট থেকে এক ইঞ্চিও সরে আসবেন না।

২৭শে জানুয়ারী তারিখেই শেখ মুজিবের ধানমণ্ডীস্থ বাসভবনে শেখ মুজিবের সাথে ভুট্টোর প্রথম দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো। ৭৫ মিনিট আলোচনা শেষে দুই নেতা বেরিয়ে এসে সংবাদিকদের জানালেন, আমরা সবে আলোচনা শুরু করেছি। আমরা তা চালিয়ে যাবো।[৪৩] পরের দিন আলোচনা হলো হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালস্থ ভুট্টোর স্যুটে। এদিন দুই নেতা অপেক্ষমান সাংবাদিকদের কোনো সুখবর দিতে পারলেন না। ৭০ মিনিট ব্যাপী আলোচনা শেষে দু নেতা বেরিয়ে এলেন। শেখ মুজিব সাংবাদিকদের বললেন আমাদের আলোচনা চলছে এবং আগামীকালও চলবে। আমরা দেশের সকল সমস্যা নিয়েই আলাপ করছি।' শেখ মুজিবের সাথে সাথে ভুট্টোও বললেন, তাদের আলোচনার ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। অনেক আলোচনাই শেষ হয়েছে। আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ দিনই সাংবাদিকদের কাছে ভুট্টো ইংগিত দিলেন যে, তিনি পর

৪২. দৈনিক সংগ্রাম, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৭১।
৪৩. দৈনিক সংগ্রাম, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৭১।

www.bjilibrary.com

দিন অর্থাৎ ২৯শে জানুয়ারী ঢাকা ত্যাগ করছেন। তিনি সাংবাদিকদের আরও জানান, এ সময়ের মধ্যে আলোচনা সমাপ্ত করার সম্ভব না হলে তিনি আবার ঢাকায় আসবেন।[৪৪] ভুট্টোর এ কথায় বুঝা গেল আলোচনার অবস্থা ভালো নয়। অগ্রগতির কথা ভুয়া। পরদিনই এ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সময়টা ২৯শে জানুয়ারীর বিকেল। প্রায় ১ ঘণ্টাকাল স্থায়ী রুদ্ধদ্বার আলোচনা শেষে দুই নেতা বেরিয়ে এলেন। এই ছিল শেষ দফার বৈঠক। আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে দুই নেতার কাছ থেকে কোনো যৌথ ঘোষণা এলো না। পৃথকভাবে তারা কথা বললেন সাংবাদিকদের সাথে। শেখ মুজিব জানালেন, ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে জনতার কাছে আওয়ামী লীগ যে প্রতিজ্ঞা করেছে, সে কথা তিনি ভুট্টোকে বুঝিয়েছেন। আর ভুট্টো বললেন, শেখ সাহেবের ভূমিকা ও ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে তাঁর দৃঢ়তাকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে তাঁর দলের সাথে আলাপ করবেন।[৪৫]

নেতাদ্বয়ের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হলো, তাদের আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি তারা জাতীয় পরিষদ বৈঠকের তারিখের ব্যাপারেও একমত হতে পারেননি। সাংবাদিকদের কাছে শেখ মুজিব যখন বললেন যে, তিনি ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদ ডাকার জন্যে প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করেছেন। এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ভুট্টো সাথে সাথেই বললেন, শীগগিরই জাতীয় পরিষদ ডাকার ব্যাপারে তাঁর দল আগ্রহান্বিত, কিন্তু তা ১৫ তারিখেই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আবার ভুট্টো ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে তাড়াহুড়ো করে ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে এমন কথা বললেন যা সাময়িকভাবে আলোচনায় বসার পথও যেন বন্ধ করে দিল। তিনি বললেন, আওয়ামী লীগের ৬ দফার দুই দফা এবং তিনটি ছাত্র দলের ১১ দফার ১০ দফা তিনি মানেন।[৪৬]

২৭শে জানুয়ারী থেকে ২৯শে জানুয়ারী পর্যন্ত ভুট্টো-মুজিবের মধ্যে তিন দফায় মোট ২০৫ মিনিট আলোচনা হয়। আলোচনায় কি কথোপকথন হয়েছিল, আলোচনা কোন্ কথায় কিভাবে ব্যর্থ হলো, তা জানার কোনোই উপায় নেই। তবে ছিটেফোঁটা কিছু জানা যায় সংশ্লিষ্টদের দু একজনের কথা থেকে। আলোচনা সম্পর্কে পরবর্তীকালে ভুট্টো বলেছেনঃ '১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসের ২৭ তারিখে পিপল্‌স পার্টির নেতারা

৪৪. দৈনিক সংগ্রাম, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৭১।
৪৫. দৈনিক সংগ্রাম, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৭১।
৪৬. দৈনিক সংগ্রাম, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৭১।

www.bjilibrary.com

ঢাকায় এলেন। আমাদের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করলাম, শেখ মুজিবুর রহমান তার ছয় দফার ব্যাপারে অনমনীয়। আমাদের সোজাসুজি বললেন, তিনি ছয় দফার প্রশ্নে জনগণের কাছ থেকে ম্যাণ্ডেট লাভ করেছেন। সুতরাং এর থেকে এক ইঞ্চিও তাঁর সরে আসা সম্ভব নয়। আমাদের অবস্থা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা আওয়ামী লীগ সভাপতিকে বললাম, আমরা ছয় দফার প্রশ্নে কোনো ম্যাণ্ডেট লাভ করিনি। আমরা কিছু শাসনতান্ত্রিক বিষয়াবলী উপস্থাপন করলাম। কিন্তু অখণ্ডভাবে যতক্ষণ ছয় দফাকে গ্রহণ না করা হচ্ছে, ততক্ষণ আওয়ামী লীগ নেতারা পরবর্তী কোনো আলোচনায় যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমরা মুজিবুর রহমানকে জানালাম যে, দেশের পশ্চিমাংশের জনগণ ছয় দফা বিরোধী। বললাম, ছয় দফার নিশ্চিত ফল হচ্ছে পাকিস্তান শেষ হয়ে যাওয়া। এবং আমাদের মতামত হচ্ছে, জনগণের ধারণাও আমাদের থেকে দূরে নয়। আওয়ামী লীগ নেতা আমাদের অসুবিধাগুলো উপলব্ধি করলেন, কিন্তু এগুলো গ্রহণে রাজী হলেন না।'[৪৭] মুজিব-ভুট্টো আলোচনা সম্পর্কে অন্য একটা চিত্র পাওয়া যায়। শেখ মুজিবের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মিঃ রেহমান সোবহানের কাছ থেকে। তিনি বলেছেন, মিঃ ভুট্টো জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকা এসেছিলেন। মুজিবের সাথে তাঁর সরাসরি বৈঠক হয়। এরপর তাঁর দলের 'শাসনতন্ত্র' বিষয়ক টীম আওয়ামী লীগের 'শাসনতন্ত্র' বিষয়ক টীমের সাথে বসেন। আলোচনা চলতে থাকাকালে সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পিপিপি কোনো শাসনতান্ত্রিক খসড়া তৈরি করেনি। শুধু ইয়াহিয়া আগে যেমন করেছিলেন, তেমনি ৬ দফাকে পরিপূর্ণভাবে বুঝার চেষ্টা করেছেন। এ অবস্থা আনুষ্ঠানিক সমঝোতার বিষয়কে অসম্ভব করে তুললো। কেননা, দূরত্ব কমিয়ে বিকল্প অবস্থান সন্নিবেশ অপরিহার্য।'[৪৮] অধ্যাপক জি ডব্লিউ চৌধুরীর বরাত দিয়ে পরিবেশিত আরেকটা বিবরণে আমরা পাই : 'ভুট্টো ও তাঁর দল ঢাকা এলেন ২৭শে জানুয়ারী। এ দুজন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা হিসেবে যাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁদের আলোচনা পর্যবেক্ষণের জন্যে ছিলাম। সংলাপ বিনিময় হয়েছিল তিন দিন। কিন্তু পারস্পরিক আপোসহীনতার কারণে আলোচনায় কোনোই অগ্রগতি হয়নি। আমি বিভিন্ন উৎস থেকে জেনেছিলাম যে, মুজিব ভুট্টোকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, তিনি ৬ দফার কোনোই অদল-বদল করতে প্রস্তুত নন। অন্যদিকে

---

৪৭. The great Tragedy, Z. A. Butto.
৪৮. Negotioting for Bangladesh Rahman Sobhan, A participants View, The south East Asia Review, London, July, 1971.

www.bjilibrary.com

ভুট্টোও জানিয়ে দেন যে, তিনি এ পরিকল্পনার ছদ্মাবরণে বিচ্ছিন্নতাবাদ সমর্থন করবেন না।'[৪৯]

উপরোক্ত তিনটি বিবরণের মধ্যে ভুট্টো ও জি ডব্লিউ চৌধুরীর বক্তব্য একই রকম, নতুন কোনো তথ্য এগুলোতে নেই। কিন্তু মিঃ রেহমান সোবহান নতুন তথ্য দিয়েছেন। ভুট্টো শুধু ৬ দফা বুঝতে এসেছিলেন, কোনো বিকল্প পরিকল্পনা নিয়ে আসেননি যা একটা সমঝোতা আলোচনার জন্য প্রয়োজন। এ থেকে বুঝা যায়, ইয়াহিয়ার মতো ভুট্টো চেয়েছেন শেখ মুজিবকে ৬ দফা থেকে সরাতে, কিন্তু তাঁর বিবেচনার জন্য কোনো বিকল্প পরিকল্পনা আনেননি। এর অর্থ কি এই যে, মুজিব সম্পর্কে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁদের সফরগুলো ছিল নিছকই শেখ মুজিবকে বেশী বেশী পরখ করার জন্যে ?

ইয়াহিয়ার সফরের মতো ভুট্টোর সফর পাকিস্তানের সামরিক সরকার ও ভুট্টোর সাথে শেখ মুজিবের সম্পর্কের অবনতিই ঘটাল। শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা ব্যর্থ হবার পর আওয়ামী লীগের সাথে সমঝোতার আশা সুদূর পরাহত হয়ে দাঁড়াল। এ অবস্থায় সমঝোতায় আসতে বাধ্য করার লক্ষ্যে অধিকতর হার্ড লাইনের দিকে ঝুঁকে পড়া আওয়ামী লীগের জন্যে অবধারিত হয়ে পড়লো। এ সময়ই ঘটল একটি ভারতীয় যাত্রীবাহী বিমান হাইজ্যাক করে লাহোরে নিয়ে যাবার ঘটনা। ৩০শে জানুয়ারী, '৭১, মোঃ হাশেম কোরেশী এবং মোঃ আশরাফ নামক জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের সদস্য বলে পরিচয় দানকারী দুজন কাশ্মীরী যুবক ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে লাহোর ইয়ারপোর্টে নিয়ে যায় এবং তাদের ছত্রিশজন আটক সহকর্মীর মুক্তি দাবী করে। ২রা ফেব্রুয়ারী বিমানটি তারা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। এ ঘটনা পাকিস্তানে তুমুল বিতর্ক এবং নতুন সংকটের সৃষ্টি করে। ভুট্টো বিমান ছিনতাই-এর ঘটনা সমর্থন করেন, অন্যদিকে শেখ মুজিব একে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন। কিন্তু ঘটনার ফল দাঁড়ায় এই যে, ভারত সরকার তার দেশের উপর দিয়ে সকল প্রকার পাকিস্তানী বিমান চলাচল বন্ধ করে দিল।

অনেকেই বিমান ছিনতানই এবং তা ধ্বংসের ঘটনাকে পুরোপুরি একটা ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করলো। ভারতীয় কাশ্মীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদ সাদিক ছিনতাইকারীদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে জানালেন, মোহাম্মাদ হাশেম কোরেশী একজন ডবল এজেন্ট এবং ভারতীয় কাশ্মীর

৪৯. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা–৫০।

www.bjilibrary.com

সরকার কয়েক মাস আগেই ছিনতাই পরিকল্পনা কোরেশীর কাছ থেকে জেনেছিলেন। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের এক এজেন্সীর আশ্রয়ে থাকায় কাশ্মীর সরকারের পক্ষে ছিনতাইকারী কোরেশীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।[৫০] কাশ্মীরের ভারতীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য যেহেতু আমরা অবিশ্বাস করতে পারি না, তাই ধরে নিতে পারি ছিনতাই ষড়যন্ত্রের সাথে ভারত যুক্ত ছিলো। ভুট্টো যেভাবে ছিনতাইকারীদের সাথে কথা বলেন, তাতে তাদের প্রশ্রয় দেয়া বুঝায় এবং যেভাবে তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়ার ব্যবস্থা হয়, তাতে ভুট্টোকেও ষড়যন্ত্রের সাথে শামিল করা হয়। ষড়যন্ত্রের ফল এ দাঁড়ালো যে, মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে ব্যবধান আরও বাড়লো এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগের পথে একটা বাধার প্রাচীর খাড়া হলো। এক্ষেত্রে ভারতের সাথে কোনো যোগাযোগ কি ভুট্টোর ছিলো ? তিনি কি যুক্ত পাকিস্তানে ক্ষমতা লাভের প্রশ্নে হতাশ হয়ে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সবকিছু ভণ্ডুল করে দিতে চাচ্ছিলেন ? প্রশ্নগুলোর জবাব তখন কেউই পায়নি। আরেকটা জিনিস লক্ষণীয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের সকল দায়িত্বশীল মহলই বিমান ছিনতাইকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে অশুভ দৃষ্টিতে দেখেছে, এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের একটা আলামত তারা লক্ষ্য করেছে। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী দল জামায়াতে ইসলামীর পূর্ব পাক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বিমান ছিনতাই-উদ্ভূত পরিস্থিতির উপর প্রদত্ত তাঁর দীর্ঘ বিবৃতির উপসংহারে বলেন, 'আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, একমাত্র জনগণের সরকারই দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর সুষ্ঠু মুকাবিলা করতে পারে। এমনকি 'ফিল্ড মার্শালও' ফারাক্কা ও কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং বর্তমান সরকারের সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত যেন কোনো কিছুই শাসনতন্ত্র তৈরি ও জনগণের সরকার গঠনের পথে বিলম্বের সৃষ্টি করতে না পারে।'[৫১] বিমান ছিনতাই-এর ঘটনা ক্ষমতা হস্তান্তরকে বিলম্বিত করার ব্যাপারে কোনো ভূমিকা রেখেছিলো কিনা তা সুনির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। তবে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদ সাদিকের তথ্য ফাঁস এবং ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানের সকল প্রকার বিমান চলাচল বন্ধের ঘটনাকে পাকিস্তানের শাসক মহল শেখ মুজিবের ব্যাপারে অধিকতর সাবধান হওয়ার একটা অজুহাত দাঁড় করিয়ে নিতে পারে যা ক্ষমতা

৫০. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-৪৬২।
৫১. দৈনিক সংগ্রাম, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

হস্তান্তর প্রয়াসকে বিলম্বিত বা সংকটাপন্ন করা স্বাভাবিক। বিমান ছিনতাই ষড়যন্ত্রের সার্থকতা এখানেই।

মুজিব-ভুট্টো আলোচনার ব্যর্থতা পূর্ব পাকিস্তানের চিন্তাশীল মহলকে হতাশ করে দিলো। পাকিস্তানের অস্তিত্ব সম্পর্কেই তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। একথা তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়লো যে, উভয় অঞ্চলের মধ্যে অবিশ্বাসের এক বিরাট ফাটল। এ ফাটলই মুজিব ও ভুট্টোকে কাছে আসতে দিচ্ছে না। সংখ্যা গরিষ্ঠ, অথচ বঞ্চিত পূর্ব পাকিস্তানীদের অবিশ্বাস ছিলো বাস্তব। কিন্তু ভুট্টোদের অবিশ্বাস ছিলো তাদের অন্যায় স্বার্থভিত্তিক। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রবীন সাহিত্যিক ও রাজনীতিক এবং আওয়ামী লীগ সরকারের এককালীন মন্ত্রী জনাব আবুল মনসুর আহমদ ভুট্টোর ঢাকা ত্যাগের ১ দিন পরই এক দীর্ঘ বিবৃতিতে সমস্যা সমাধানের একটা পথ বাতলালেন। তিনি দেশের দু অংশে দুটি রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রস্থাপনের প্রস্তাব পেশ করে বললেন, 'নিজ নিজ এলাকায় থেকে দেশের দু অংশের জনসাধারণ যাতে করে সমভাবে তাদের সার্বভৌমত্ব ভোগ করতে পারে সেজন্যে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা উচিত। পাকিস্তান শুধুমাত্র একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাতেই টিকে থাকতে পারে। এতে থাকতে হবে ফেডারেল সরকারের বিভিন্ন আসনসহ আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমতা বিধানের ভিত্তিতে ঢাকা ও ইসলামাবাদের মধ্যে একটি নয়া ক্ষমতা সাম্য। এ মৌলিক নীতির ভিত্তিতেই শেখ মুজিবুর রহমান ও জনাব ভুট্টোর শাসনতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করা উচিত। দেশের শোষণকারী অংশের প্রতিনিধিত্বকারী জনাব ভুট্টোর প্রতি আমি আবেদন জানাচ্ছি, পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতারা কেন পূর্ব-পশ্চিম সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছেন তাঁকে তা বুঝতে হবে।'[৫২]

কিন্তু ভুট্টো ও ভুট্টোর দল এসব আবেদন-নিবেদন কিছুই বুঝতে চাননি। গঠনমূলক কোনো পরিকল্পনা প্রস্তাব নিয়ে এগুবার পরিবর্তে তারা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে, এমন বিবৃতি-বক্তব্য অব্যাহত রাখলেন। লাহোরে জনাব ভুট্টোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাবের নবনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক সদস্যদের যুক্ত বৈঠক শেষে পিপলস পার্টির মুখপাত্র মিয়া আরিফ ইফতিখার বললেন, 'আওয়ামী লীগের ছয় দফা শাসনতন্ত্র রচনার পথে বাধা স্বরূপ। আওয়ামী লীগ যদি ৬ দফার ব্যাপারে অটল থাকে, তাহলে শাসনতন্ত্র তৈরি কঠিন হয়ে পড়বে।'[৫৩] এ বিবৃতি প্রকাশের ৮ দিন

৫২. দৈনিক সংগ্রাম, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

৫৩. দৈনিক সংগ্রাম, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১।

www.bjilibrary.com

পর এর চেয়ে গুরুতর কথার বোমা ফাটালেন জনাব ভুট্টো। তিনি ১০ই ফেব্রুয়ারী মুলতানে নবনির্বাচিত সদস্যদের সম্মেলনে ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে শেখ মুজিব ও সরকারের মধ্যে একটি 'পরিকল্পনা'র অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করে বললেন, দেশের শাসনতন্ত্র ৬ দফার ভিত্তিতে রচিত হলে তিনি সেই শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করবেন।'[৫৪] জনাব ভুট্টোর এ বক্তব্য যে ইয়াহিয়া সরকারকে আরো বাগে আনার জন্যে একটা চাপ ও হুমকি তা বলাই বাহুল্য।

জনাব ভুট্টোরা যখন পশ্চিম পাকিস্তানে এ রকম তর্জন-গর্জন করছিলেন, তখন পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নীরব ভূমিকা পালন করছিলো। ভুট্টোর সাথে আলোচনা শেষ হওয়ার সময় থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শেখ মুজিব অথবা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে কোনো বিতর্কমূলক বক্তব্যই রাখা হয়নি। এটা নিশ্চয় এজন্যে যে, শেখ মুজিব পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে চায়নি। জনাব ভুট্টোর ১৪ তারিখের আক্রমণাত্মক ও উস্কানিমূলক বক্তব্যের পরেও শেখ মুজিব তার কোনো জবাব দেননি। আওয়ামী লীগ এ সময় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বানের জন্যে চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন ১৫ই ফেব্রয়ারী। এ লক্ষ্যেই তিনি চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু ১৫ তারিখে বৈঠক ডাকা হলো না। ১০ ফেব্রুয়ারী ভুট্টো ইয়াহিয়া সরকারের বিরুদ্ধে এবং ৬ দফার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেবার পর ১১ তারিখেই ইসলামাবাদে ইয়াহিয়ার সাথে তাঁর দীর্ঘ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে কি আলোচনা হয়, তা কোনো দিনই হয়তো দিনের আলো দেখবে না। তবে এ আলোচনার দুদিন পর প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে একটা বড় ধরনের ঘোষণা পাওয়া গেলো। ৩ মার্চ তিনি জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করলেন ঢাকায়। এটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো সব মহলে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে। অগ্রগতির একটা ধাপ তো রাখা হলো !

১৫ ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাহী কমিটির সদস্যসহ নবনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের একটি যুক্ত অধিবেশন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হলো। প্রায় দু সপ্তাহের নীরবতার পর শেখ মুজিব এ অধিবেশনে দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। পত্র-পত্রিকা তাঁর এ ভাষণকে নীতি নির্ধারণী ভাষণ হিসেবে অভিহিত করলো। তিনি

---

৫৪. দৈনিক সংগ্রাম, ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, আমরা জাতির সাথে ওয়াদাবদ্ধ আছি ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র তৈরি করার জন্যে। শুধু পূর্ব পাকিস্তানের নয়, সারা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ৬ দফার পক্ষে রায় দিয়েছে। পরিষদের অধিবেশনে অন্যান্য দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও যদি শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে ৬ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেন তবেই পাকিস্তানের জনগণ ভাই ভাই হিসেবে বসবাস করতে পারবে। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হলে সংখ্যাগুরু প্রতিনিধিদের মতামতই মানতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতাই গণতন্ত্রের চূড়ান্ত কথা। আর যারা তা মানতে চায় না, তাদের থেকে ফ্যাসিবাদের গন্ধ পাওয়া যায়। আওয়ামী লীগ ৬ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং একে কোনো শক্তিই রোধ করতে পারবে না।' এ বক্তৃতায় শেখ মুজিব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠোর সাবধানবানী উচ্চারণ করেন তিনি বলেন, ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত এখনও শেষ হয়নি। তাদের এতো সাহস নির্বাচনের ঐতিহাসিক ফলাফলের পরও ষড়যন্ত্র করছে। যারা ষড়যন্ত্র করছে, তারা জানে না যে, তারা আগুন নিয়ে খেলা করছে।[৫৫]

ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আওয়ামী লীগের এ যুক্ত বৈঠক যখন চলছিলো, তখন পশ্চিম পাকিস্তানে পেশওয়ারে ভুট্টো এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি সেখানে বলছিলেন, ৬ দফা প্রশ্নে আপোসের নিশ্চয়তা না পেলে তার দলের সদস্যরা আগামী ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের বৈঠকে যোগ দেবে না। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের বদলে শাসনতন্ত্র গ্রহণের জন্যে তার দল ঢাকা যাবে না। কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র সকল প্রদেশের মতামত গ্রহণ অপরিহার্য। আপোস ও সমঝোতার ব্যাপারে তাঁকে নিশ্চয়তা দেয়া হলে তিনি আজই ঢাকা যেতে প্রস্তুত।[৫৬] এর একদিন পর করাচীর সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে পিপলস পার্টির সদস্যদের কোনো অংশ বা বক্তব্য লাগবে না, সে শাসনতন্ত্র অনুমোদন করার জন্য পিপলস পার্টির সদস্যরা ঢাকা সফর করতে পারেন না। এই সাথে তিনি নতুন এবং মজার যুক্তির অবতারণা করে বললেন, 'পাকিস্তানের প্রতি ভারতের যুদ্ধংদেহী মনোভাব পশ্চিম পাকিস্তানে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। লাহোর সীমান্ত ও নিকটবর্তী এলাকাসমূহে ভারতীয় বাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়েছে এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরও মারাত্মক পদক্ষেপ

---

৫৫. দৈনিক সংগ্রাম, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১
৫৬. দৈনিক সংগ্রাম, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

গ্রহণ করার জন্যে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। এসব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পিপলস পার্টির ৮৫জন সদস্যের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকা সফর করা মোটেই সাধারণ ব্যাপার নয়, বরং বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের জনগণের সাথে থাকাই সর্বপ্রথম দায়িত্ব। পশ্চিম পাকিস্তানের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এবং স্বার্থান্বেষী মহলের ভয়ে শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তান আসতে পারবেন না বলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে জানিয়েছেন। স্বার্থান্বেষী মহল থেকে কোনো ভয়ের আশংকা থাকলে পিপলস পার্টির উপরও তা সমভাবে প্রযোজ্য। আওয়ামী লীগের সাথে সমঝোতায় আসার ব্যাপারে তাঁর দল সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। আওয়ামী লীগের সাথে পুনরায় আলাপ-আলোচনার অবকাশ এখন আর নেই।'[৫৭] জনাব ভুট্টোর জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ না দেয়া এবং অন্যান্য বক্তব্য আওয়ামী লীগকে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ করলো এবং পাকিস্তানের উভয় অংশে তীব্র প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি করলো। পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বললেন, 'পরিষদের বাইরে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধান করতে চাওয়া এবং পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে অস্বীকৃতির মাধ্যমে এ সন্ধিক্ষণে এক শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সৃষ্টির উদ্যোগ ভুল পদক্ষেপ। সঠিক পন্থা হচ্ছে, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা পরিষদের অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করবেন। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সব দলই পরিষদে তাঁদের নিজস্ব শাসনতান্ত্রিক খসড়া পেশ করবেন না। পরিষদে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই শাসনতান্ত্রিক খসড়া উপস্থাপন করবেন এবং শাসনতান্ত্রিক খসড়ার যেসব অংশ রাষ্ট্রের ইসলামী চরিত্র দেশকে ঐক্য ও সংগতি গণতান্ত্রিক মূলনীতি, মৌলিক অধিকার এবং প্রতিটি অঞ্চলে সমানাধিকার ও অর্থনৈতিক সুবিচারের মূলনীতির অনুকূল, তা গ্রহণ করা হবে এবং যেসব অংশ এসব মূলনীতির অনুকুল নয়, তার অবশ্যই বিরোধিতা করতে হবে। এরপরেও যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শুধু তার সংখ্যাধিক্যের জোরেই তা গ্রহণ করার জন্যে চাপ প্রদান করে, তাহলে এ ধরনের শাসনতন্ত্র গৃহীত হলেও এটা সাফল্যজনক কিছু হবে না এবং এর পরিণতি সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে।[৫৮] অনুরূপ ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন পশ্চিম পাকিস্তানের মুফতী মাহমুদ, চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং পূর্ব পাকিস্তানের মাওলানা সিদ্দিক আহমদ, নূরুল আমীন, অধ্যাপক গোলাম আযম প্রমুখ নেতাগণ।

৫৭. দৈনিক সংগ্রাম, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১
৫৮. দৈনিক সংগ্রাম, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

৩ মার্চের জাতীয় পরিষদে যোগদান সম্পর্কিত ভুট্টোর বক্তব্য প্রকাশ হবার পর ১৯ ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্টর সাথে ইসলামাবাদে তাঁর বৈঠক হয়। বৈঠক পাঁচ ঘন্টা চলে। বৈঠক শেষে ভুট্টো বললেন, ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে আওয়ামী লীগের সাথে সহযোগিতা করতে তাঁর দল রাজী আছে, তবে মুদ্রা, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং কর-এর ব্যাপারে 'কিছু আপোস মীমাংসা' করতে হবে। তিনি আবার শেখ মুজিবের সাথে বৈঠকে মিলিত হতে রাজী আছেন। জাতীয় পরিষদে যোগদান করা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করা সংক্রান্ত পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয়।'[৫৯] পরদিন ২০ ফেব্রুয়ারী করাচীতে ওয়েস্ট পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত পিপলস পার্টির জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সভায় পরিষদ সদস্যরা ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে দলীয় মনোভাবে অটল থেকে স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের পদত্যাগপত্র পার্টির চেয়ারম্যানের কাছে পেশ করার ঘোষণা দেয়। সম্মেলনে পিপলস্ পার্টির মুখপাত্র জনাব আবদুল হাফিজ পীরজাদা বলেন, পরিষদের সদস্যপদ থেকে সম্ভাব্য পদত্যাগের বিষয়ে সদস্যরা পার্টির চেয়ারম্যানকে পূর্ণাঙ্গ রায় দিয়ে দিয়েছে।[৬০] এখানে উল্লেখ্য যে, পিপলস পার্টির এ সিদ্ধান্ত ঘোষণার দিনই সরকার 'আইন কাঠামো' সংশোধন করে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রথম অধিবেশনের পূর্বে সদস্যদের পদত্যাগের অধিকারের প্রতি আইনগত স্বীকৃতি দেয়া হয়। এ সংশোধনের ব্যাপারটা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা, না ভুট্টো-ইয়াহিয়ার কোনো যোগ-সাজশের ফল তা বলা মুশকিল। তবে সংশোধনটি সংকটকে আরও জটিল করারই পথ খুলে দিলো।

জনাব ভুট্টোর দল আট ঘাট বেঁধে যখন ৩ ফেব্রুয়ারীর জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বয়কট করা এমনকি অধিবেশনের আগে সবাই মিলে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলে পশ্চিম, পাকিস্তানের ছোট ছোট দলগুলো ভুট্টোর দলের তীব্র বিরোধিতা করলো। কাউন্সিল মুসলিম লীগ, মারকাযী জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালি), জামায়াতে ইসলামী, কনভেনশন মুসলিম লীগ, কাইয়ুম মুসলিম লীগ এবং স্বতন্ত্র সদস্য মিলে সদস্যদের মোট সংখ্যা ছিলো ৫৭জন। এর মধ্যে কাইয়ুম মুসলিম লীগের ৯জন সদস্য ছাড়া অবশিষ্ট সকলেই ৩ মার্চের জাতীয়

৫৯. দৈনিক সংগ্রাম, ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১
৬০. দৈনিক সংগ্রাম; ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের কথা ঘোষণা করলো। সংকট সম্পর্কে কথা প্রায় একই রকম, যা মাওলানা মওদূদীর বক্তব্য থেকে আগেই জানা গেছে (শাসনতন্ত্র ব্যাপারে ভিন্নমত থাকলে তা আলোচনার উপযুক্ত জায়গা পরিষদ কক্ষই)। এছাড়া খান ওয়ালি খান বললেন, 'নির্বাচন নিজেই শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে একটি রায় এবং বর্তমান অবস্থায় অতি ব্যাখ্যার বাড়াবাড়ি এ রায়কেই বানচাল করে দেবে।' কাউন্সিল মুসলিম লীগের মিয়া মমতাজ দৌলতানা বললেন, 'ছয় দফা এবং সব ব্যাপারেই আলোচনার জায়গা জাতীয় পরিষদ।' আর কনভেনশন মুসলিম লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী বললেন, 'ভোটদাতাদের রায়কে আমাদের সম্মান করতে হবে।' মারকাযী জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান-এর মাওলানা সিদ্দিক আহমদের কথা ছিলো, 'ভুট্টোর কোনো শর্ত আরোপ চলবে না।'[৬১]

পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট ছোট দলগুলো জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের প্রতি সমর্থন ঘোষণার পর ভুট্টোর সাথে থাকলো মাত্র কাইয়ুম মুসলিম লীগ। দুই দলের মোট সদস্য সংখ্যা ৯৭ যা মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও কম। কিন্তু এরপরেও অবস্থা উন্নতির দিকে না এসে অবনতির দিকেই গড়াল।

৩ মার্চের জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ না দেয়া সংক্রান্ত ভুট্টোর ঘোষণার দিন দুয়েক পর, সম্ভবত ১৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর বেসামরিক মন্ত্রিসভা ভেংগে দিলেন। দেশ পুরোপুরি সামরিক নিয়ন্ত্রণেই আবার ফিরে এলো। এরও দুদিন পর ২২ ফেব্রুয়ারী ইসলামাবাদে জেনারেল ইয়াহিয়া সামরিক ও সামরিক আইন প্রশাসকদের এক সম্মেলন আহ্বান করলেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে গবর্নর ভাইস এডমিরাল আহসান এবং পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি জেনারেল ইয়াকুবের ডাক পড়লো ইসলামাবাদে। এমন সম্মেলন আহ্বান তাঁদেরকেও উদ্বিগ্ন করেছিলো। তাঁরা ইসলামাবাদে যাবার আগে সহকর্মীদের নিয়ে সলা-পরামর্শে বসলেন। জেনারেল ইয়াকুব বললেন, মিঃ ভুট্টো তাঁর বক্তব্য নমনীয় করেছেন। যদি মুজিব কিংবা প্রেসিডেণ্ট তাঁর মতামত গ্রহণ করার আশ্বাস দেন, তাহলে জাতীয় পরিষদের বৈঠকে তিনি যোগদান করবেন। জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর নিজের কথাকে কার্যকর করার জন্যে লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক দ্বারা নিজেকে সজ্জিত রেখেছেন। আর যদি অচলাবস্থা অব্যাহত থাকে, তাহলে এ অনিবার্যভাবে সামরিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাবে এবং সেটা হবে বিপর্যকর।[৬২]

---

৬১. Bangladesh-birth of a nation, yatindra Bhatnagar, page-101-102.

৬২. নিয়াজীর আত্মসমর্পণ দলিল, সিদ্দিক সালিক, পৃষ্ঠা-৫২

www.bjilibrary.com

এ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যাবার আগে জেনারেল ইয়াকুব ও এ্যাডমিরাল আহসান শেখ মুজিবের সাথে দেখা করলেন। তাঁদের আলোচনায় বর্তমান সংকটের কথা উঠলো। শেখ মুজিবও পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করছিলেন। তিনি তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, তাঁর 'ছয় দফা আপোসমূলক'[৬৩] শেখ মুজিবের এ বক্তব্য আন্তরিক ছিলো না তা নয়, কিন্তু জেনারেল ইয়াকুব কিংবা এডমিরাল আহসান কেউ-ই তাঁর একথার উপর আস্থা রাখতে পারেননি। কারণ শেখ মুজিবের প্রকাশ্য ঘোষণা ছিলো তাঁর এ বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

১৫ ফেব্রুয়ারীর বক্তব্যের পর শেখ মুজিব পরিস্থিতির উপর উল্লেখযোগ্য আর কোনো কথা বলেননি। ২০ তারিখ মধ্যরাতে শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত সমাবেশে তিনি দেশবাসীকে ঘরে ঘরে প্রস্তুত থাকার জন্যে আহ্বান জানালেন। বললেন, ৫২তে যে ষড়যন্ত্রের শুরু সেই ষড়যন্ত্র আজও অব্যাহত রয়েছে।[৬৪] পরদিনও শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনের সামনে শ্লোগানমুখর, বিক্ষুব্ধ অনেক খণ্ড মিছিলের সমাবেশে বললেন, '৭ কোটি বাঙালীর দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অপ্রতিহতগতিতে চালিয়ে যেতে হবে। আন্দোলনের চরম মুহূর্তে কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা বা অনিয়মতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেয়া যাবে না।'[৬৫] লক্ষণীয়, শেখ মুজিবের এ উক্তিগুলোতে আন্দোলনের কথা আছে, কিন্তু ৬ দফা সম্পর্কে এমন কথা নেই যা পরিস্থিতি উন্নয়নের প্রতিকূল হয়।

ইসলামাবাদে আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক ও সামরিক গবর্নরদের নিয়ে ইয়াহিয়া কি সলাপরামর্শ করলেন, তার পুরো চিত্রটা কোনো দিনই দিনের আলোর মুখ দেখবে না। জেনারেল ইয়াকুব এবং এডমিরাল আহসান ফিরে এলেন। তাঁরা ফিরে আসার পর উর্ধতন সামরিক অফিসারদের মধ্যে যে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো, তার সারাংশ হলো এই ঃ মুজিবকে আরেকটি সুযোগ দেয়া হবে তার উদ্দেশ্যের সততা প্রমাণের জন্যে। অন্যথায় সামরিক আইনের পুনঃ প্রত্যাবর্তন ঘটবে এর চিরাচরিত ধারা অনুযায়ী।[৬৬] সরকারের এ মূলনীতি অনুসারে দু ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য ছিলো। এক, শেখ মুজিবের সাথে রাজনৈতিক সংলাপের নতুন উদ্যোগ নেয়া, দুই, সামরিক নিয়ন্ত্রণের জন্যে সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণ।

---

৬৩. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, সিদ্দিক সালিক, পৃষ্ঠা-৫২
৬৪. দৈনিক সংগ্রাম, ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১
৬৫. দৈনিক সংগ্রাম, ২২ ফেব্রুয়ারী, [illegible]১
৬৬. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা-৫২

www.bjilibrary.com

কিন্তু দেখা গেল শেখ মুজিবের সাথে কেন্দ্রীয়ভাবে রাজনৈতিক সংলাপের কোনো উদ্যোগ নেয়া হলো না। অবশ্য স্থানীয়ভাবে গবর্নর আহসান শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা শুরু করলেন। শেখ মুজিবের সাথে গবর্নর আহসানের কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। গবর্নর আহসান তাঁকে বুঝালেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে গ্রহণযোগ্যতার জন্যে আপনাকে ছয় দফার অবস্থান থেকে নেমে আসা উচিত। আপনি ছয় দফা প্রচারকালে বলেছেন, এটা পূর্ব পাকিস্তানের কাছে যেমন পশ্চিম পাকিস্তানের কাছেও তেমনি। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের জনগণ এর চরম বিরুদ্ধে। অতএব আপনার এমন পদক্ষেপ নেয়া উচিত যা উপরোক্ত মনোভাবকে ধুয়ে-মুছে দিতে পারে।' এ্যাডমিরাল আহসানের কথানুযায়ী মুজিব তেমন পদক্ষেপ নেয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন।[৬৭] কিন্তু ২৪ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দলীয় কার্যালয়ে আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে ৬ দফা সম্পর্কে যা বললেন, তা এ আশ্বাসের কথা প্রমাণ করে না। তিনি বললেন, '৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য জনগণ তাঁর দলকে ম্যাণ্ডেট দিয়েছে এবং সে ম্যাণ্ডেট বাস্তবায়নের তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর উপর ছয় দফা চাপিয়ে দেয়া হবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলো যদি বাংলাদেশের সমপরিমাণ স্বায়ত্তশাসন না চায় অথবা কেন্দ্রের হাতে কতিপয় অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকার ব্যাপারে স্বীকৃতি জানায় কিংবা কতিপয় আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করে, তবে ৬ দফা কর্মসূচী আদৌ অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। ছয় দফা সতর্কভাবে পরীক্ষা করার পর তাতে কোনো ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। .... কেন্দ্র কর্তৃক কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থে বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক সাহায্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষের উপর উপনিবেশবাদী শোষণ চালান হয়েছে এবং সকল সম্পদ দেশের অন্য অঞ্চলে পাচার করা হয়েছে। এ পটভূমিকায় কেন্দ্রের হাতে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক ঋণের ক্ষমতা থাকলে তাতে শুধু জাতীয় সংহতি বিপন্ন হবে তা নয়, বরং কেন্দ্র কর্তৃক বাংলাদেশকে শোষণের পথ নিশ্চিত করবে। প্রদেশ থেকে সমান প্রতিনিধিত্ব সম্পন্ন একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পরিষদের প্রস্তাব একটি প্রকৃত ফেডারেশনের জন্য কার্যকরী মডেলতো নয়ই। বরং বাংলাদেশে উপনিবেশবাদী শোষণ জিইয়ে রাখার একটি অনিষ্টকর প্রয়াস মাত্র।[৬৮]

---

৬৭. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা-৫২

৬৮. দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

শেখ মুজিব ছয় দফার ব্যাপারে কোনো আপোস না করা এবং এর উপর অটল থাকার কথা আবার এভাবে পুনর্ব্যক্ত করলেন। সেই সাথে তিনি ভুট্টোর পিপলস পার্টির সর্বশেষ সুপারিশকেও প্রত্যাখ্যান করলেন। ভুট্টোর পিপলস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ২২ ফেব্রুয়ারী তাদের করাচী বৈঠকে সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করেছিলো ঃ '(১) ফেডারেল সরকার এবং কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংস্থা প্রত্যেকটি ফেডারেটিং ইউনিটের সমান প্রতিনিধিত্ব পাবে। (২) আন্তঃপ্রদেশ ও আন্তঃআঞ্চলিক শোষণ বন্ধ করার নিমিত্ত সুষম মুদ্রা ও কর ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে। (৩) ভায়াবল (Viable) কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার প্রয়োজনে ফেডারেল সরকার কর আরোপ ও আদায় করবে। (৪) বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য ফেডারেল সরকারাধীন থাকবে এবং (৫) প্রদেশগুলোর মধ্যে পণ্যদ্রব্য ও চলাচলের অবাধ অধিকার থাকবে।'[৬৯] শেখ মুজিব তাঁর ২৪শে ফেব্রুয়ারীর সাংবাদিক সম্মেলনে ৬ দফার প্রশ্নে অটল থাকার ঘোষণা সহ ভুট্টোর দলের এ সুপারিশগুলোরই জবাব দেন এবং তাদের কয়েকটি সুপারিশ ও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

শেখ মুজিবের এ সাংবাদিক সম্মেলনের বিবরণ প্রকাশিত হলো ২৫ ফেব্রুয়ারীর কাগজে। ২৬ তারিখেই ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে করাচীর প্রেসিডেন্ট ভবনে আলোচনায় বসলেন। বৈঠক চললো চার ঘণ্টা। যা আলোচনা হলো তার কিছুই জানা গেলো না। তবে বৈঠকের একদিন পর ২৮ ফেব্রুয়ারী ভুট্টো লাহোরের জনসভায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে স্থগিত রাখা অথবা একশ' বিশ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনার সময়সীমা প্রত্যাহার করার দাবী জানালেন। তিনি হুমকি দিলেন, নারী সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা চালালে[৭০] খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হবে এবং পিপলস পার্টির কোনো সদস্য পরিষদ অধিবেশনে যোগ দিলে তাকে নিশ্চিহ্ন করা হবে।[৭১] মনে করা হয়, ভুট্টোর এসব বক্তব্য ছিলো ইয়াহিয়া-ভুট্টো আলোচনারই ফলশ্রুতি। কিন্তু ভুট্টোর এসব জ্বালাময়ী কথা, দাবী ও হুমকি সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট ছোট দলগুলোর ৩৫জন সদস্য ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্যে ঢাকায় এলেন।

---

৬৯. জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৫ থেকে '৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা–৪৬৫

৭০. নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের ১৩জন নারী সদস্যের জন্যে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ২রা মার্চ ধার্য করা ছিলো এবং ১লা মার্চ ঢাকায় রিটার্নিং অফিসার সমীপে নমিনেশন পেপার জমা দেয়ার জন্য প্রার্থীদের বলা হয়েছিলো।

৭১. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫ অলি আহাদ, পৃষ্ঠা–৪৬৬

www.bjilibrary.com

পরিস্থিতির স্রোত তখন কিন্তু অন্যদিকে বইতে শুরু করেছে। শেখ মুজিবের ২৪ ফেব্রুয়ারীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে গবর্নর আহসানের সাথে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সংলাপ ব্যর্থ হবার পর জেনারেল ইয়াকুব তাঁর স্টাফদের সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। সবুজ সংকেত পাওয়া মাত্রই যাতে দ্বিতীয় বিকল্প সামরিক পদক্ষেপ নিতে সেনাবাহিনী এগিয়ে যেতে পারে গোপনে তার প্রস্তুতি চললো। ২৭ ফেব্রুয়ারী থেকে পিআইএ বিমানে ২৭ বালুচ এবং ১৩ ফ্রন্টিয়ার্স ফোর্সের সৈন্যরা ঢাকায় আসতে শুরু করলো। ১লা মার্চ পর্যন্ত এ সৈন্য আমদানির কাজ চলে।[৭২] যদিও বাঙালী সামরিক অফিসারদেরকে এ আয়োজন ও ব্যবস্থার সবকিছু থেকে দূরে রাখা হয়েছিলো, কিন্তু কিছুই গোপন থাকলো না। বিমান বন্দরের অধিকাংশ কর্মচারীই বাঙালী। তাদের চোখের সামনে দিয়েই শত শত সৈন্য প্রতিদিন আসছে। তাদের মারফতে সব খবর ছড়িয়ে পড়লো।

স্বভাবতই এ খবর আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। তারা উদ্বিগ্ন হলো। আওয়ামী লীগ চাপ দিচ্ছিলো ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের জন্যে, অন্য কোনো পরিস্থিতি সে চায়নি যা জনগণের রায়কে বানচাল করে দিতে পারে। কিন্তু সেই আশংকাই তার সামনে প্রকট হয়ে উঠলো। এ সময় রাজনৈতিক মহলের একটি ধারণা হিসেবে সংবাদপত্রে খবর বেরুলো যে, ৩ মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আবার পিছিয়ে যেতে পারে।[৭৩] অন্যদিকে কাউন্সিল মুসলিম লীগের ৭জন সদস্য এবং কাইয়ূম মুসলিম লীগের ৯জন সদস্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের ব্যাপারে ভুট্টোকে সমর্থন করায় ভুট্টোর হাত আরও মযবুত হলো, তার জেদ আরও বেড়ে গেল। সবকিছু মিলে চারদিক থেকে উদ্বেগজনক অনিশ্চয়তার এক অন্ধকার যেন নেমে আসছিলো। এ সময় পাকিস্তানের একজন প্রবীণ রাজনীতিক মাওলানা মওদূদী এক তারবার্তায় শেখ মুজিবের কাছে আবেদন জানালেন এভাবে ঃ 'গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনা জাতিকে সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান মর্মান্তিক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে চরম সতর্কতা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত যদি পরিষদের অধিবেশন মুলতবি হয়ে যায় অথবা অন্য কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তবে আল্লাহর ওয়াস্তে পুনঃ অবনতি থেকে পরিস্থিতিকে রক্ষা করুন।'[৭৪] অর্থাৎ সংকটজনক অবস্থার অনুভূতি সবখানে সব চিন্তাশীলের

৭২. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা-৫৩
৭৩. দৈনিক সংগ্রাম ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১
৭৪. দৈনিক সংগ্রাম ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

মধ্যেই সমানভাবে অনুভূত হচ্ছিল। এ অবস্থায় শেখ মুজিব সুবিবেচনারই পরিচয় দিলেন। তারা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন।[৭৫] এ চেষ্টার গোটাটাই চলেছে পর্দার অন্তরালে যার কোনো কিছুই পত্রিকায় প্রকাশ হয়নি। এ পর্দার অন্তরালের কিছু বিবরণ মেলে সে সময় সেনাবাহিনীর গণসংযোগের জন্যে দায়িত্বশীল একজন সেনা-অফিসারের জবানবন্দীতে। তিনি বলছেন, "২৫ ফেব্রুয়ারী একটি প্রভাবশালী বাংলা দৈনিকের সম্পাদক আমাকে টেলিফোন করলেন। তাঁর সাথে একটি জরুরী বৈঠকে বসার জন্যে জোরাজুরি করতে থাকলেন। আমি জানতাম যে, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের উচ্চ পর্যায়ে তিনি খুব ঘনিষ্ঠ। সুতরাং ভাবলাম, বিষয়টি সর্বশেষ পরিস্থিতি সংক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আমি সকাল এগারটায় তাঁর অফিসে গেলাম। সেখানে তিনি দুজন ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আওয়ামী লীগ নির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন ঐ দুই ব্যক্তি। এ খবর অবশ্য আমি পরে জেনেছি। তাঁরা বললেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে দ্রুত ঢাকায় আসতে বলতে হবে। আমি বললাম, 'দুঃখিত, আমি প্রেসিডেন্টের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করি না।' তাঁরা বললেন, 'কিন্তু সর্বোচ্চ পর্যায়ে আপনি আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারেন। বিষয়টি অতীব জরুরী।' এরপর তাঁরা জানালেন, 'যদি প্রেসিডেন্ট আসেন, তাহলে আওয়ামী লীগ তাঁর সফরকে সম্মানিত করবে পর্যাপ্ত পরিমাণ সুবিধা দান করে।' তাঁরা বললেন, 'প্রকাশ্যে আমরা ছয় দফার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো। আসলে ভেতরে কিছু সংশোধনী আনবো যা আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।' তাঁরা তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে জানান, মুজিবের অনুমোদন নিয়েই তাঁরা কথা বলছেন।' যেসব সংশোধনীর কথা তাঁরা বলেন, সেগুলো হলো ঃ

১. বৈদেশিক বাণিজ্য প্রাদেশিক বিষয় হিসেবে থাকবে। প্রদেশসমূহ বাণিজ্য প্রতিনিধি দল পাঠাবে। এরাই বৈদেশিক বাণিজ্যের বাজার অনুসন্ধান এবং বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত করবে। কিন্তু কোনো বাণিজ্য চুক্তিই চূড়ান্ত হবে না যতক্ষণ না কেন্দ্র কর্তৃক অনুমোদিত হচ্ছে।

২. প্রদেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সূত্র থেকে আয়কৃত অর্থ প্রাদেশিক রিজার্ভ ব্যাংকে জমা থাকবে। কিন্তু এ অর্থ কোনো প্রকল্পেই ব্যয়িত হবে না যতক্ষণ না কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হচ্ছে। এ সমন্বয় কমিটিতে প্রতিটি ফেডারেটিং ইউনিটের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে।

---

৭৫. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা-৫৩

www.bjilibrary.com

৩. খাজনা এবং অন্যান্য অর্থ আদায়ের বিষয়টি প্রাদেশিক বিষয় হিসেবেই থাকবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার খাজনা আদায়েব ব্যাপারটি নিজেই যদি করতে চায়, করতে দেয়া হবে।

৪. আলাদা মুদ্রার জন্যে আমরা চাপ দেবো না। এ সংশোধনী দেয়ার পর তাঁরা জানান, এ ব্যাপারে তাঁরা লিখিত দিতে প্রস্তুত। যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের মতামত পৌছে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম।[৭৬] সেদিনই ঢাকার সামরিক সদর দফতর থেকে প্রেসিডেন্টকে সবকিছু জানিয়ে জরুরী ভিত্তিতে ঢাকা আসার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে টেলিগ্রাফ করা হলো।

আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, এমনকি এখানকার সেনা কর্মকর্তারা যখন আশাবাদী যে, আওয়ামী লীগের নতুন নমনীয়তার দিকটাকে প্রেসিডেন্ট বিবেচনা করবেন এবং আরও আলোচনার জন্যে তিনি ঢাকা আসবেন, ঠিক তখন ঘটলো অন্য ঘটনা। ২৮ ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার জেনারেল পীরজাদা এক অশুভ টেলিফোন করলেন ঢাকায় এডমিরাল আহসানের কাছে। বললেন, প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরিষদের বাইরে খসড়া শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলসমূহ যাতে ঐকমত্যে পৌছতে পারে, সে ব্যাপারে সময়দানের উদ্দেশ্যে তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।[৭৭]

পিণ্ডির কাছে সিদ্ধান্তটা হয়তো খুবই সহজ ছিলো। কিন্তু ঢাকার কাছে ছিলো খুবই ভারী। ঢাকা প্রশাসনের দায়িত্বে যারা ছিলেন, তাঁরা জানতেন, এ খবর এখানে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। প্রেসিডেন্টের ঘোষণা যাতে প্রতিক্রিয়ার কোনো ভয়াবহ বিস্ফোরণ না ঘটায়, সেজন্যে বিষয়টা শেখ মুজিবকে জানিয়ে আগে থেকেই তাঁকে তৈরি রাখা দরকার ঘোষণা গ্রহণের জন্যে। এসব চিন্তা করে গবর্নর আহসান শেখ মুজিবকে গবর্নর হাউজে নিয়ে এলেন। তারপর নানা কথার পর আসল কথাটা পাড়লেন। এতবড় খবর শোনার পরেও 'আশ্চর্যজনকভাবে মুজিব শান্ত থাকলেন এবং বললেন, 'এ নিয়ে আমি কোনো ঘটনা সৃষ্টি করবো না যদি আমাকে নতুন কোনো তারিখ দেয়া হয়। যদি নতুন তারিখটি সামনের মাসে (মার্চে) হয়, আমি পরিস্থিতি সামলাতে পারবো। এপ্রিলে হলে আমার পক্ষে কষ্টকর

---

৭৬. নিয়াজীর আত্মসমর্পরেণ দলিল, পৃষ্ঠা-৫৩-৫৪
৭৭. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা–৫৬

www.bjilibrary.com

হবে। কিন্তু স্থগিতকরণটি যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্যে হয়, তাহলে পরিস্থিতি সামলানো আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে।'[৭৮] গবর্নর হাউজ থেকে বের হয়ে আসার সময় শেখ মুজিব মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে আরেকটা কথা বলেছিলেন যার মধ্যে দিয়ে তাঁর তখনকার অবস্থার একটা সুন্দর প্রকাশ ঘটে। তিনি বলেছিলেন, 'আমার অবস্থা-দু পাশে আগুন, মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে। হয় সেনাবাহিনী আমাকে মেরে ফেলবে, না হয় আমার দলের ভেতরকার চরমপন্থীরা আমাকে হত্যা করবে। কেন আপনারা আমাকে গ্রেফতার করছেন না ? টেলিফোন করলেই আমি চলে আসবো।'[৭৯]

গবর্নর আহসান এবং তাঁর সংগীরা শেখ মুজিবের অবস্থা মনে হয় অনুধাবন করেছিলেন এবং তাঁর প্রস্তাব খুবই সংগত মনে করেছিলেন। ২৮ তারিখ সন্ধ্যাতেই শেখ মুজিবের প্রতিক্রিয়া তাঁরা পিণ্ডিকে টেলিফোনে জ ানালেন এবং অনুরোধ করলেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণার সাথে সাথে যেন বৈঠকের নতুন তারিখও ঘোষণা করা হয়।

ভেতরে যখন এ অবস্থা, বাইরে তখন একদিকে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের জন্যে জোরদার প্রস্তুতি, অন্যদিকে এর বিরোধী প্রতিক্রিয়া। ২৮ তারিখের কাগজে দেখা গেল আওয়ামী লীগের খসড়া শাসনতন্ত্র বিবেচনার বিরাট খবর। আওয়ামী লীগ পার্লামেণ্টারী কমিটি দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা ব্যাপী বসে খসড়া শাসনতন্ত্র বিবেচনা করেছে। ২৮ তারিখেও তারা বসছে। ৩রা মার্চের আগে তাঁরা খসড়া শাসনতন্ত্র বিবেচনা চূড়ান্ত করবে। এই ২৮ তারিখেই লাহোরের এক জনসভায় ভুট্টো বললেন, 'পিপলস পার্টির নির্বাচিত সদস্যদের অংশগ্রহণ ছাড়াই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হলে পশ্চিম পাকিস্তানে গণআন্দোলন শুরু করা হবে।' আওয়ামী লীগের ৬ দফা সম্পর্কে জনাব ভুট্টো ঐ জনসভায় বলেন, '৬ দফা কর্মসূচী তিনি পসন্দ না করলেও তিনি কখনো তা প্রত্যাখ্যান করেননি।' তিনি মত প্রকাশ করেন, 'দেশের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই ব্যাপক সমঝে াতায় আসা প্রয়োজন এবং এ উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টির মধ্যকার মতভেদ দূর করার জন্যে আরো কিছু সময়ের আবশ্যকতা রয়েছে।[৮০] এ ২৮ তারিখেই পূর্ব পাকিস্তানের একটি ছাত্র সংগঠন ইসলামী

---

৭৮. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা-৫৬
৭৯. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা-৫৬
৮০. দৈনিক সংগ্রাম, ১লা মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

ছাত্রসংঘ সব ষড়যন্ত্র বানচাল করে ৩রা মার্চ তারিখেই জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্যে দাবী জানাল। সংগঠনটির সভাপতি জনাব মতিউর রহমান নিজামী বললেন, 'নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দলের কর্মসূচীর সাথে আমাদের মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু অগণতান্ত্রিক পথে বা শক্তি প্রয়োগে সে কর্মসূচীকে নস্যাত করার রাজনীতিতে ইসলামী ছাত্রসংঘ শুধু অবিশ্বাসই করে এমন নয়, বরং ছাত্রসংঘ এ কলংকজনক পদ্ধতিকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করে। ছাত্র সংঘ মনে করে যে, প্রতিটি গণতন্ত্রকামী মানুষের উচিত বর্তমান জটিলতা ও চক্রান্তের বেড়াজাল থেকে জাতিকে মুক্ত করে যে কোনো মূল্যে আগামী ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানকে সংশয়মুক্ত করে তোলা।'[৮১] ২৮ তারিখ সন্ধ্যায় গবর্নর হাউজে যাওয়ার আগে জনাব মুজিবুর রহমান ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতির সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, '৬ দফা কর্মসূচী কেবল বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্যেই নয়, বরং আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকেও বাংলাদেশের সমপরিমাণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেয়ার পক্ষপাতী। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই জাতীয় পরিষদে সমাধান খুঁজে বের করা যেতে পারে। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পর্কে অগ্রিম আশ্বাস কেউই দিতে পারে না। তবে কেউ কোনো ভালো পরামর্শ দিলে অন্যরা তা শুনবেন না কেন ? তিনি ঘোষণা করেন, পাকিস্তান যেমন টিকে থাকবে, তেমনি টিকে থাকবে বাংলাদেশ, সিন্ধু সীমান্ত, পাঞ্জাব ও বেলুচিস্তান। আর যা থাকবে না তা হচ্ছে মানুষে মানুষে শোষণ। .... আমরা মরতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কিছুতেই নতি স্বীকার করবো না।[৮২]

তিন

৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে কনভেনশন মুসলিম লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, জ মিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান, মস্কোপন্থী ন্যাপের সদস্যরা যখন ঢাকা আসছেন, অধিবেশন পর্যবেক্ষণের জন্য বিদেশী কূটনীতিকরা যখন ঢাকার পথে, পূর্ব পাকিস্তানের সকল মানুষ ৩রা মার্চের অধিবেশনের দিকে যখন তাকিয়ে, সেই সময় ১লা মার্চের ১টা ৫ মিনিটে প্রেসিডেন্টের ঘোষণা রেডিওতে পাঠ করে বলা হলো, পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল অর্থাৎ পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার

৮১. দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ মার্চ, ১৯৭১
৮২. দৈনিক সংগ্রাম, ১লা মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এছাড়া ভারত কর্তৃক সৃষ্ট সাধারণ উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সার্বিক অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছে। অতএব আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান পরবর্তী কোনো তারিখের জন্যে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।[৮৩] প্রেসিডেন্ট তাঁর এ ঘোষণা উপলক্ষ্যে বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং তার পুরোটা রেডিওতে প্রচার হয়েছিলো। কিন্তু এ বক্তব্য কেউ শুনেনি। অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার কথা কানে যাবার পরে আর কিছু শোনার ধৈর্য কারো ছিলো না। মানুষের বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের মতোই হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো।

মনে পড়ে এ লেখক সেদিন ঢাকা স্টেডিয়ামে বি সি সি পি একাদশ এবং আন্তর্জাতিক একাদশের ক্রিকেট খেলা দেখছিলেন। সময় দেড়টা কিংবা তার কিছু বেশী হতে পারে। দেখলাম, পশ্চিম গ্যালারীর এক জায়গায় আগুন জ্বলে উঠলো। সেই সাথে গোটা স্টেডিয়াম গ্যালারীতে ছুটোছুটি ও হৈচৈ। শোনা গেল, প্রেসিডেন্ট ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বাতিল করেছেন। স্টেডিয়ামের বাইরে থেকে তখন মাইকের শব্দ ভেসে আসছিলো। ব্যাপার কি জানার জন্যে গ্যালারী দিয়ে উপরে গিয়ে নীচে আউটার স্টেডিয়ামের দিকে তাকালাম। দেখলাম, মাইক ফিট করা একটা চলন্ত বেবিট্যাক্সি। মাইক থেকে একটা ঘোষণা ভেসে আসছে। যতদূর মনে পড়ে গলাটা ছিলো আ. স. ম. আবদুর রবের। বলা হচ্ছিলো, যতটা এখন স্মরণ আছে, 'ভাইসব, স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে আসুন, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করুন।' খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। বেরিয়ে এলাম স্টেডিয়াম থেকে। বেরিয়ে এসে বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণের চত্বর দিয়ে সামনে এগুলাম। চারদিকে অশান্ত অবস্থা। জি পি ও'-এর বিপরীত দিকে যেখানে আজ কসকর দোকান, সেখানে ছিলো গ্রীনিজ নামের একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। তার সামনে জটলা। ওটার দরজা ভাঙ্গা হয়েছে। কে যেন পাশ থেকে বললো, বায়তুল মোকাররমের বন্দুকের দোকানও ভাঙা হয়েছে। আমি তখন একটি দৈনিকে কর্মরত সাংবাদিক। তাড়াতাড়ি আমি আমার পত্রিকা অফিসে ফিরে এলাম।

বায়তুল মোকাররম এলাকায় যা দেখা গেছে, সে অবস্থা ছিলো সবখানেই। সে সময়ের দৃশ্য সম্পর্কে প্রবীন রাজনীতিক অলি আহাদ সাহেবের বর্ণনা ঃ 'জাতীয় পরিষদ মুলতবি ঘোষণায় হতচকিত ঢাকাবাসী স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। ঢাকা স্টেডিয়ামের ক্রিকেট ম্যাচ বন্ধ হইয়া যায়। ঢাকা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন এবং ঢাকা জেলা

৮৩. দৈনিক সংগ্রাম, ২রা মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

এসোসিয়েশনের প্রতিবাদ মিছিল রাস্তায় নামে। ছাত্র সম্প্রদায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে রাজপথে নামিয়া আসে। বিভিন্ন শিল্প এলাকা হইতে শ্রমিকরা দলে দলে মিছিল সহকারে রাজধানী ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করে। সকল সিনেমা হল বন্ধ হইয়া যায়। এইসব বিক্ষোভ মিছিলের স্রোত হোটেল পূর্বাণীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। হোটেল পূর্বাণীতে তখন আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারী পার্টির সভা চলিতেছিল। মিছিলকারীরা সহস্র কণ্ঠে আওয়াজ উঠায়, পাকিস্তানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কর, বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা কর।'[৮৪]

এ চরম বিক্ষুব্ধ পরিবেশে হোটেল পূর্বাণী থেকে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, 'জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ গণতান্ত্রিক মূলনীতি লংঘন করেছেন। আমরা পরিষদ অধিবেশন মুলতবি ঘোষণাকে বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেব না। আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলবো। তবে আমাদের প্রতিরোধ হবে গণতান্ত্রিক অহিংস-অসহযোগ। এ মুহূর্তে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা এক সুদীর্ঘ ষড়যন্ত্রেরই ফলশ্রুতি এবং আমরা এর কঠোর নিন্দা ও প্রতিবাদ না করে পারি না। পূর্ব পাকিস্তানের সকল এম. এন. এ. এখন ঢাকায় এবং ভুট্টো ও কাইয়ুম খানের দল ছাড়া আর বাকী সকল পশ্চিম পাকিস্তানী এম. এন. এ. অধিবেশনে যোগ দান করে শাসনতন্ত্র রচনায় সহায়তা করতে প্রস্তুত এমতাবস্থায় একটি সংখ্যালঘু দলের একগুয়েমি দাবীর ফলে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষিত হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এটা সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক। এর প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকায় এবং আগামীকাল বুধবার সারাদেশে সাধারণ হরতাল পালিত হবে এবং আগামী রোববার রেসকোর্সে এক গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।'[৮৫]

জনাব নূরুল আমীন, আতাউর রহমান খান, গোলাম আযম প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণার তীব্র নিন্দা করে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। জনাব গোলাম আযম বললেন, 'এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, দেশ যখন একটি গণ-সরকারের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, ঠিক তখনই গণতন্ত্রের স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। গত কয়েক দিনের ঘটনা প্রবাহ থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভুট্টোর যোগসাজশে পশ্চিম পাকিস্তানের

---

৮৪. জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-৪৬৮
৮৫. দৈনিক সংগ্রাম, ২রা মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

কতিপয় বিশেষ শক্তিশালী মহল দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করার অপচেষ্টা করছে।'[৮৬] অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি জনাব মতিউর রহমান নিজামী। তিনি এক প্রতিবাদ সভায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণাকে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মুহূর্তে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের বিরুদ্ধে একটি পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করে বলেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি অধিকার সচেতন জনগণ এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।'[৮৭]

এ বিক্ষুব্ধ গণ-প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি সামরিক শাসনের শক্তিকেন্দ্র ঢাকা সেনানিবাসও শান্ত ছিলো না। সেখানকার অনেকেই প্রেসিডেন্টের এ ঘোষণাকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি। সেখানকার আভ্যন্তরীণ চিত্র সম্পর্কে একটা সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন সে সময় সেনাবাহিনীর গণসংযোগের দায়িত্বশীল সেনা-অফিসার মেজর সিদ্দিক সালিক। তাঁর বিবরণীতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে ঘিরে কাল-ষড়যন্ত্রের একটা জাল যে দানা বেঁধে উঠেছিলো তারও কিঞ্চিত স্বীকৃতি ও পরিচয় মেলে। তিনি বলেন,

> 'ঘোষণাটি প্রচারিত হলো ১লা মার্চ ১টা ৫ মিনিটে। প্রচণ্ড আশা আর আবেগ আমাদেরকে রেডিওর সাথে একাকার করে দিলো। আমরা শুধু বিস্মিতই হলাম না, ভীতও হলাম। ঘোষণার নতুন তারিখ সম্পর্কে কিছুই বলা হলো না। অশুণতি ভয়াবহ দৃশ্যাবলী আমার মানসপটে ভেসে উঠলো। তারিখ বাদ পড়ার বিষয়টি ছাড়াও আমাকে আরেকটি বিষয় দারুণভাবে বিস্মিত করলো। সেটা ছিলো প্রেসিডেন্টের কণ্ঠের অনুপস্থিতি। এর অর্থ কি এই, তিনি ঘোষণা সংক্রান্ত বিষয়ে কেউ নন।' এটাই আমাদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন অধ্যাপক জি. ডব্লিউ. চৌধুরী। তিনি বলেছেন, এ ঘোষণায় ইয়াহিয়া শুধু সই করেছিলেন মাত্র। এ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সন্ধান নিতে গিয়ে আমি কথা বললাম মেজর জেনারেল 'আই'-এর সাথে। তিনি ইয়াহিয়ার ব্যক্তিগত স্টাফ ছিলেন। বললেন, 'ওই সময় প্রেসিডেন্ট করাচীতে ছিলেন। আমরা সবাই নীচের তলায় ছিলাম। মেজর জেনারেল 'এইচ' এবং মেজর জেনারেল 'ও' বার বার উপর নীচ করছিলেন। তাঁরা প্রেসিডেন্টের কাছে এমন একটি ছবি তুলে ধরেন যে, তাঁকে খসড়া ঘোষণায় সম্মতি দিতেই হয়।[৮৮]

---

৮৬. দৈনিক সংগ্রাম, ২রা মার্চ, ১৯৭১
৮৭. দৈনিক সংগ্রাম, ২রা মার্চ, ১৯৭১
৮৮. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা–৫৬-৫৭

www.bjilibrary.com

শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠক শেষ করে বিক্ষুব্ধ জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার পর সোজা চলে এলেন গবর্নর হাউজে। তিনি গবর্নর আহসানকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের নতুন তারিখ নির্ধারণের অনুরোধ করলেন এবং বললেন, 'আমি আপনাদের আশাবাদ দিচ্ছি এবং বলছি এখনও সময় আছে। এখনও যদি আমাকে একটা নতুন তারিখ দেন, তাহলে আগামীকালই জনগণের ক্রোধ প্রশমিত করতে পারবো। এর পরে হলে অনেক দেরী হয়ে যাবে।'[৮৯]

এ দিনই সন্ধায় গবর্নর আহসান শেখ মুজিবের অনুরোধ এবং পরামর্শ পিণ্ডিকে অবহিত করলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার জেনারেল পীরজাদা এসব কথায় কান দিতেই চাইলেন না। পরে গবর্নর আহসান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হামিদকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়ে প্রেসিডেন্টকে রাজি করাবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ফল কিছুই হলো না। উপরন্তু ঐ রাতেই গবর্নর আহসানকে তাঁর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হলো এবং জেনারেল ইয়াকুবকে ঐ দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে নির্দেশ দেয়া হলো। গবর্নর আহসান তাঁর সংবেদশীল মানসিকতার জন্যে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তাঁর পরিবর্তন সরকারের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আওয়ামী লীগকে আরও সন্দিগ্ধ করে তুললো।

এরপরও শেখ মুজিব ২রা মার্চ জনগণের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য রাখলেন, তা শান্ত এবং খুবই সুবিবেচনাপূর্ণ। তিনি এ বিবৃতিতে লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ থেকে বিরত থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, ১লা মার্চ আন্দোলনের সুযোগে ঢাকায় ও দেশের অন্যান্য স্থানে অগ্নি সংযোগ, লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অবাংগালীরাই এর শিকার হন। এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শেখ মুজিব বলেন, 'জনসাধারণকে বিশেষ করে উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে, ভাষা ও জন্মস্থান নির্বিশেষে বাংলাদেশে বসবাসকারী সবাই আমাদের কাছে বাঙালী। তাদের জান, মাল ও সম্মান আমাদের কাছে পবিত্র আমানত। শেখ মুজিব তাঁর এ বিবৃতিতে অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে বলেন, একদিনের জন্যেও আর সামরিক আইন অব্যাহত রাখার যুক্তি নেই।'[৯০] লক্ষণীয় যে, নির্বাচনোত্তরকালে সামরিক আইন প্রত্যাহারের কথা শেখ মুজিব এ প্রথমবারের মতো বললেন। এর দ্বারা প্রমাণ হলো, আন্দোলন নতুন দাবী

---

৮৯. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা-৫৭
৯০. দৈনিক সংগ্রাম, ৩রা মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

দাওয়া সমৃদ্ধ হয়ে নতুন মোড় নিতে যাচ্ছে। ২রা মার্চের বিবৃতিতে জনাব শেখ মুজিব ৭ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের কর্মসূচী বর্ধিত করলেন। ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত হরতাল চলবে। কর্মসূচীতে আরও ঘোষণা করা হলো, ৩রা মার্চ জাতীয় শোক দিবস। ঐ দিন ছাত্র জনসভা শেষে অপরাহ্ন চার ঘটিকায় পল্টন ময়দান থেকে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে মিছিল। ৭ই মার্চ রেসকোর্স থেকে শেখ মুজিব জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে ভবিষ্যত কর্মপন্থা ঘোষণা করবেন।

২রা মার্চ আরও কিছু ঘটনা ঘটলো। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে বেসরকারী প্রশাসন সৈন্য মোতায়েন দাবী করে। গণ-রোষের শিকার গবর্নর হাউজ পাহারার জন্যে হেলিকপ্টারে সৈন্য এনে সেখানে মোতায়েন করা হলো। সন্ধ্যায় কারফিউ জারি করা হলো। উত্তেজনা এখানে তুংগে উঠলো। গুলী বর্ষণের ঘটনাও ঘটলো। জনতার মধ্য থেকে ৬জন মারা গেল। তার তিনজন গবর্নর হাউজের কাছে। তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ এলো শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে। তিনি চার পৃষ্ঠায় একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি পত্রিকা অফিসে পাঠালেন। যাতে জনপ্রতিনিধিদেরকে একমাত্র বৈধ ক্ষমতার উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বেআইনী সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে সরকারী কর্মচারীসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হলো।

৩রা মার্চ ছিলো শোক দিবস। ছাত্র লীগ ও জাতীয় শ্রমিক লীগ শোক সভার আয়োজন করে। শেখ মুজিব এ শোক সভায় বললেন, "আমরা চাই পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতি। আমরা চাই তাদের সাথে ভাই ভাই হয়ে থাকতে। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের পথ রোধ করে আছে। তারা চায় না যে, আমরা একত্র থাকি। তারা আমাদের এতোদিন শোষণ করেছে। এখন যখন আমরা সম্পদ ও উৎপাদনে পশ্চাৎপদ, আমরা রক্তহীন ছোবড়া, তখন তারা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়।[৯১] ৭ কোটি মানুষকে কেউ হত্যা করতে পারবে না। আমরা মারা গেলেও বাংলার মানুষের স্বাধিকার অর্জিত হবে। তারা আর কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা শোষিত হতে রাজী নয়। আমাদের সমগ্র আন্দোলন সুশৃঙ্খলভাবে চালাতে হবে। তা না হলে জীবন যাবে, কিন্তু দাবী আদায় হবে না। ৭ মার্চের মধ্যে সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন না হলে রেসকোর্সে আমি আমার পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করবো। সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে ব্যারাকে ফিরিয়ে না নিয়ে যাওয়া এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সরকারের দায়িত্বভার ছেড়ে না দেয়া পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন চলবে।'[৯২]

৯১. স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর, কামরুদ্দীন আহমদ, পৃষ্ঠা-১০৮
৯২. দৈনিক সংগ্রাম, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

এ বক্তৃতাতেও শেখ মুজিব গুণ্ডামি ও লুটতরাজের কঠোর নিন্দা করে বলেন, 'বাঙালী, অবাঙালী, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষই দেশ-মাতৃকার সন্তান। তাদের সবার জানমাল রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবার।[৯৩]

গোটা দেশ এবং ঢাকার তখন যে উত্তপ্ত অবস্থা এবং পল্টন এলাকার জনসমুদ্রে বিক্ষোভের যে উত্তাল ঢেউ, সে তুলনায় শেখ মুজিবের ভাষণ ছিলো খুবই ঠাণ্ডা। পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবে যতদূর গড়ায়, তার চেয়ে বেশী যেন তিনি আনতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু তিনি সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন প্রচণ্ড চাপ। আর কর্মসূচীগুলো ছিলো শুধু তাঁর দাবী আদায়ের হাতিয়ার নয়, আত্মরক্ষারও বর্ম।

তাঁর এ চাপ কাজ করছিলো। ৩রা মার্চ সকালেই জেনারেল ইয়াকুব রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্টকে পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে ধাবিত হবার কথা জানালেন। এভাবে পরিস্থিতির সার্বক্ষণিক অবস্থা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে জানানো হচ্ছিলো। কিন্তু ওপারের পাথরের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছিলো সব কথা। কোনো ফলই হচ্ছিলো না। অবশেষে বরফ গললো। সংশ্লিষ্ট একজন সামরিক অফিসারের ভাষায়, 'যখন প্রেসিডেন্ট নিশ্চিত হলেন যে, ফিরে আসার কোনো পথ নেই, তখন তিনি তাঁর উদ্দেশ্য জানালেন।'[৯৪] জেনারেল ইয়াহিয়া ১০ মার্চ ঢাকায় রাজ নীতিবিদদের সাথে মিলিত হতে চাইলেন। প্রেসিডেন্টের এ ইচ্ছার কথা ঢাকার সামরিক কর্তৃপক্ষ মুজিবকে জানালেন[৯৫] শেখ মুজিব বৈঠকে সম্মত হলেন। শেখ মুজিবের সম্মতি রাওয়ালপিণ্ডি পাবার পরই প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে ১০ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের সকল পার্লামেন্টারী গ্রুপের নির্বাচিত নেতাদের সম্মেলন আহ্বান করা হলো। সাথে সাথেই পিপলস পার্টির তরফ থেকে সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হলো। কিন্তু শেখ মুজিব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'এখনও যখন বিভিন্ন সড়কে শহীদের রক্ত শুকিয়ে যায়নি এবং এখনও যখন কিছু কিছু লাশ কবর না দেয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং শত শত ব্যক্তি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছে, সে সময় নিষ্ঠুর পরিহাসের মত এ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আর এমন কিছু ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হবার জন্যে এ আমন্ত্রণ জানানো

৯৩. দৈনিক সংগ্রাম, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১

৯৪. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা–৬০-৬১

৯৫. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা–৬১

www.bjilibrary.com

হয়েছে, যাদের দূরভিসন্ধিই নিরপরাধ ও নিরস্ত্র কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের মৃত্যুর জন্যে দায়ী।'৯৬

শেখ মুজিবের এভাবে সম্মেলন প্রত্যাখ্যান করা ঢাকার সমরকর্তাদের বিস্মিত করলো। কারণ শেখ সাহেবের সম্মতি নিয়েই সম্মেলন ডাকা হয়েছিলো। শেখ মুজিবকে তাঁরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি পরিষ্কারই বললেন, 'রাজনীতিবিদদের সাথে একক ভিত্তিক আলোচনার প্রশ্নে আমি ইয়াহিয়ার প্রস্তাবিত বৈঠকে অংশ নিতে রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু আমি চাইনি কিংবা বসতেও চাই না ভুট্টোর মতো লোকের সাথে বসতে যে বাঙালীর রক্তপাতের জন্যে দায়ী।'৯৭ এ তিন (মার্চ) তারিখে আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিবৃতি এলো পূর্ব পাক জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের কাছ থেকে। বিবৃতিটি উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে, এ বিবৃতিতেই সর্বপ্রথম একটা বিকল্প পন্থা হিসেবে শাসনতন্ত্র রচনার আগে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানানো হলো। বিবৃতিতে সুস্পষ্টভাবে পরামর্শ রাখা হলো যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে শাসনতন্ত্র রচনার কাজে হাত দেয়া হোক। বিবৃতিটির বিবরণ এই ঃ 'নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার সাথে আলোচনা না করে জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত রাখার মতো চরম দায়িত্বহীন সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে দেশে যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষের হৃদয়েই গভীর বেদনার ছায়াপাত হয়েছে। এ অবিবেচনাপ্রসূত কাজের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে যে বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়েছে, তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, স্বাধীনতাকামী জনগণ এ ধরনের ষড়যন্ত্র আর বেশী দিন বরদাশ্‌ত করতে রাজী নয়। বিগত ২৩ বছর যাবত জনগণের শাসনের বিরুদ্ধে যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র পরিচালিত হয়ে এসেছে, এ সিদ্ধান্ত নিসন্দেহে তারই অন্যতম পদক্ষেপ মাত্র। জনগণ তাদের নিজেদের শাসনই কামনা করে এবং শক্তির মাধ্যমে তাদেরকে প্রতিহত করা হলে তারা তাদের জীবন বিলিয়ে দিতেও ইতস্তত করবে না। এমতাবস্থায় নির্বাচনে জনগণের পরিষ্কার রায় ঘোষণা হওয়ার পর সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের আর মোটেই ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার অধিকার নেই।' জনাব গোলাম আযম সামরিক আইন প্রত্যাহার করে অবিলম্বে এ ভুল পদক্ষেপ বন্ধ করা এবং নির্বাচিত

৯৬. দৈনিক সংগ্রাম, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১

৯৭. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা-৬১

www.bjilibrary.com

গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'প্রিয় মাতৃভূমিকে অধিকতর দুর্যোগ থেকে রক্ষা করতে হলে শাসনতন্ত্র রচনার পূর্বে অবশ্যই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। গণ-প্রতিনিধিদেরকে দেশ শাসনের সুযোগ দেয়া হোক এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে শাসনতন্ত্র রচনা করা হোক।'[৯৮] এই ৩রা মার্চের ডেট লাইনে জনাব অলি আহাদের বাংলা জাতীয় লীগের পক্ষ থেকে আরেকটা প্রস্তাব শেখ সাহেবের কাছে পেশ করার কথা জানা যায়। ৩রা মার্চ বেলা ১০টায় শেখ মুজিবের কাছে পেশকৃত এ প্রস্তাবটিতে বলা হয় ঃ (১) জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত সংক্রান্ত প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ঘোষণাকে উপেক্ষা করেই আওয়ামী লীগ দলীয় একশত সাতষট্টি (১৬৭) জন জাতীয় পরিষদ সদস্য ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত সদস্যবর্গের আজই ঢাকায় সংবিধান প্রণয়নকল্পে যথারীতি অধিবেশনে মিলিত হওয়া উচিত এবং যথাশীঘ্র সংবিধান প্রণয়ন করে তার মুতাবেক জন প্রতিনিধিগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে সামরিক আইন শাসনকর্তা প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্বান জানানো উচিত। (২) প্রেসিডেন্ট এ আহ্বান অস্বীকার করলে অস্থায়ী সরকার ঘোষণা করা এবং জাতি সংঘের সাহায্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন। (৩) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কনফেডারেশন গঠন। এবং (৪) উপরে বর্ণিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনতার ঐক্য সুদৃঢ় করার জন্যে সংগ্রামী জনতার মোর্চা গঠন।'[৯৯] কিন্তু বাংলা জাতীয় লীগের এ প্রস্তাবকে জনাব তাজউদ্দীন আহমদ ও জনাব মনসুর আলী তাৎক্ষণিকভাবেই অবাস্তব বলে অভিহিত করেন।[৯৯-ক]

৩রা মার্চের কর্মসূচীর মধ্যে বিকেল ৪টার ছাত্র জনসভা শেষে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে মিছিলের কথা ছিলো। কিন্তু সভা শেষে শেখ মুজিব মিছিলে যোগ দেননি। ছাত্র লীগের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হলে তিনি বললেন, ৭ই মার্চ তারিখে তিনি রেসকোর্স ময়দানে জনসভা ডেকেছেন, ঐ জনসভায় তিনি তাঁর পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করবেন, তাঁর আগে তাঁর পক্ষে ৩রা মার্চের মিছিলে যোগ দেয়া সম্ভব নয়। এর দ্বারা শেখ মুজিব সম্ভবত বাড়তি আবেগকে সংযত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হয়তো জানতেন না, চরমপন্থী ছাত্র ও যুবনেতারা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন, যখন এ ধরনের সংযম সম্বরণের উপদেশ যুক্তিগ্রাহ্য হয় না। ছাত্র ও যুব নেতারা শেখ মুজিবের ভূমিকাকে তাঁর দুর্বলতা হিসেবে গণ্য করলো।

৯৮. দৈনিক সংগ্রাম, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১

৯৯. জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-৪৭০

৯৯ক. জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-৪৭০

www.bjilibrary.com

এরপর ছাত্র ও যুব নেতারা ভিন্ন ধারায় চলা শুরু করলো। তাদের বক্তব্য আলাদা হয়ে গেল। তাদের আন্দোলনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে। তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক লড়াই। আর শেখ মুজিব তাঁর দাবী আদায়ের জন্য নিজের বাড়ী ৩২নং কে কেন্দ্র করে অহিংসা ও অসহযোগ নীতির ভিত্তিতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন। এ বিষয়টিকে জনাব কামরুদ্দিন আহমদ তাঁর গ্রন্থে সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। লিখেছেন ঃ 'অসহযোগ আন্দোলনের নির্দেশ দেয়া হতো শেখ সাহেবের ধানমণ্ডীর বাড়ী থেকে, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকগণ কাজের নির্দেশ পেত জহুরুল হক হল থেকে। শেখ মুজিবকে ছাত্ররা যদিও বিপ্লবের প্রতীক বলে মনে করতো, কিন্তু তারা তাদের নিজস্ব কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতো। ভারতের স্বাধীনতার জন্য বৃটিশ শাসিত উপমহাদেশে যেমন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন এবং নেতাজী সুভাষ বোসের নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রামের দুটি ধারা পরিচালিত হয়েছিলো, ঠিক তেমনি দুটি ধারায় বিভক্ত হলো দেশের সংগ্রামী চেতনা ও নেতৃবৃন্দ। .... নেতাজী অহিংসায় বিশ্বাস করতেন না। তাই তিনি ভারত ভূখণ্ডের বাইরে স্বাধীন ভারত সরকার ও আযাদ হিন্দু ফৌজ গঠনের মাধ্যমে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জাপান ও জার্মানের সমর্থনে ভারত-ব্রহ্মদেশ সীমান্তে ব্যাপক আক্রমণ করেছিলেন। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বও চাচ্ছিল ঐ একই পন্থায় স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করে পশ্চিমা শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে এবং স্বাধীনতা অর্জন করতে। এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিই ছিলো স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন।'[১০০] এ পতাকা সর্বপ্রথম উত্তোলিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২রা মার্চ তারিখে। উত্তোলন করেন ছাত্র নেতৃবৃন্দ। এরও অনেক আগে ১৯৬৭ সালের দিকে সিরাজুল আলম খান স্বাধীনতা সংগ্রামের গোপন তৎপরতা শুরু করেন। এ সময়ে এ তৎপরতার বিবরণ দিতে গিয়ে জনাব কামরুদ্দিন আহমদ লিখেছেন ঃ '১৯৬৭ সনের এপ্রিল মাসে আমার "Socio political history of Bangladesh" প্রকাশিত হয়। বইটি হঠাৎ এতো জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, ছয় মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ করা হয়। ঐ পুস্তকখানি প্রকাশিত হবার পর পরই সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাকের সাথে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর রূপ নেয়। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ওরা দুজন আমার অফিসে যেত

১০০. স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর, কামরুদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা–১০৯

www.bjilibrary.com

আমার সাথে বাঙালী জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যে। সিরাজুল আলম খান তখন মুখে বাংলার স্বাধীনতার কথা না বললেও স্বাধীনতা লাভের জন্যে শেখ মুজিবের অজ্ঞাতে আওয়ামী লীগের কিছু কর্মী নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় গুপ্ত সংস্থা গঠন করেছিলেন। ঐ সংগঠনসমূহের জন্যে প্রচারপত্র লিখা হতো ও তাদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। এ সংগঠনের কথা আওয়ামী লীগ নির্বাহী কমিটির কেউ এমনকি শেখ সাহেবও জানতেন না।'[১০১] ছাত্র ও যুব আন্দোলনের এ স্বতন্ত্র পটভূমির কারণেই অবশেষে তাদের আন্দোলনের কেন্দ্র, কর্মসূচী এবং বক্তব্য আলাদা হয়ে গেল। ৩রা মার্চ তারিখে শেখ মুজিব যে বক্তব্য রাখলেন এবং যে নির্দেশাবলী দিলেন, যে ভাষায় দিলেন, তার সাথে ছাত্র ও যুব নেতাদের কথা মেলে না। তারা পল্টনের জনসভায় যে ৫টি প্রস্তাব গ্রহণ করে, তার শেষ তিনটি প্রস্তাব এই ঃ

(১) এ সভা পাকিস্তান উপনিবেশবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে সমাজ তান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েমের শপথ গ্রহণ করিতেছে।

(২) এই সভা স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া তাহার সকল সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

(৩) এই সভা দলমত নির্বিশেষে বাংলার প্রতিটি নর-নারীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আবেদন জ ানাইতেছে।[১০২]

এ প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথে এই ৩রা মার্চ তারিখেই ছাত্র ও যুব নেতাদের তরফ থেকে 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর নামে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচী' সম্বলিত 'এক নম্বর ইশতিহার' প্রকাশ করা হয়। শেখ মুজিব ২রা মার্চ তিনটি দাবী তুলে ধরেন। দাবীগুলো হলো ঃ অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার, অবিলম্বে সংঘাতের নিরসন এবং জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা গ্রহণের পথ থেকে সকল বাধা দূরীকরণ।[১০৩] এ দাবী উত্থাপন করে তিনি ৭ তারিখ পর্যন্ত কর্মসূচী

১০১. স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর, কামরুদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা-১০৪

১০২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৬৬

১০৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৭০

৫—

www.bjilibrary.com

দিলেন এবং বললেন, এ দাবিগুলো আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। কিন্তু 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঐ ইশতিহারে শেখ মুজিবের এ দাবী ও কর্মসূচীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর আহ্বান এবং পৃথক কর্মসূচী ঘোষণা করা হলো। ইশতিহারের পূর্ণ বিবরণ ঃ

"জয় বাংলা
ইশতিহার নং/এক
(স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচী)
স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

গত তেইশ বছরের শোষণ, কুশাসন ও নির্যাতন একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাত কোটি বাঙালীকে গোলামে পরিণত করার জন্য বিদেশী পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র তা থেকে বাঙালীর মুক্তির একমাত্র পথ স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকা। গত নির্বাচনের গণরায়কে বানচাল করে শেষ বারের মতো বিদেশী পশ্চিমা শোষকেরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করেছে।

৫৪ হাজার ৫ শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের জন্য আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম 'বাঙলাদেশ'। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

(১) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালী সৃষ্টি ও বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক, শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে।

(৩) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

(ক) বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহাকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করতে হবে।

www.bjilibrary.com

(খ) সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

(গ) শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুসংগঠিত করে, গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায় মুক্তিবাহিনী গঠন করতে হবে।

(ঘ) হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালী-অবাঙালী সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

(ঙ) স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশৃঙ্খলার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং লুটতরাজ সহ সকল প্রকার সমাজবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা নিম্নরূপ হবে ঃ

(অ) বর্তমান সরকারকে বিদেশী উপবিনেশবাদী গণ্য করে বিদেশী সরকারের ঘোষিত সকলআইনকে বেআইনী বিবেচনা করতে হবে।

(আ) তথাকথিত পাকিস্তানের স্বার্থের তল্পিবাহী পশ্চিমা অবাঙালী মিলিটারীকে বিদেশী ও হামলাকারী শত্রু সৈন্য হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং এ হামলাকারী শত্রু সৈন্যকে খতম করতে হবে।

(ই) বর্তমান বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা দেয়া বন্ধ করতে হবে।

(ঈ) স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণরত যে কোনো শক্তিকে প্রতিরোধ, প্রতিহত, পাল্টা আক্রমণ ও খতম করার জন্য সকল প্রকার সশস্ত্র প্রস্তুতি নিতে হবে।

(উ) বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী দৃষ্টিভংগি নিয়ে সকল প্রকার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

(ঊ) স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ....' সংগীতটি ব্যবহৃত হবে।

(ঋ) শোষক রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানী দ্রব্য বর্জন করতে হবে এবং সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(এ) উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের পতাকা ব্যবহার করতে হবে।

(ঐ) স্বাধীনতা সংগ্রামে রত বীর সেনানীদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

www.bjilibrary.com

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশের' সর্বাধিনায়ক ঃ

স্বাধীন ও সাবৃভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন আন্দোলনের এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি ব্যবৃহৃত হবে–

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক
স্বাধীন কর স্বাধীন কর বাংলাদেশ স্বাধীন কর
স্বাধীন বাংলার মহান নেতা শেখ মুজিব
গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড় .... মুক্তবাহিনী গঠন কর
বীর বাংগালী অস্ত্র ধর......... বাংলাদেশ স্বাধীন কর
মুক্তি যদি পেতে চাও .... বাংগালীরা এক হও
বাংলা ও বাংগালীর জয় হোক
জয় বাংলা।
স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।"[১০৪]

স্বাধীনতার এ ঘোষণা দেয়ার জন্যেই স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের একক উদ্যোগের ফলে এগার দফা দাবী আদায়ের জন্য গঠিত সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' বিলুপ্ত করে ১লা মার্চ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি আ. স. ম. আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন সমবায়ে চার সদস্য বিশিষ্ট 'স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।[১০৫] এ 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হবার পর দিন ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত ছাত্র সভায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়।[১০৬] ৮ মার্চ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ কেন্দ্রীয় সংসদ ছাত্র লীগের নাম থেকে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম বাদ দেয়া এবং 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর উপর স্বাধীনতা সংগ্রামের দায়িত্বার্পণসহ নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ

"অদ্যকার এ সভা আগামী কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'ছাত্র লীগ' নাম ব্যবহৃত হইবে।

১০৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, ৬৬৬-৬৬৮
১০৫. জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা–৪৭৩-৪৭৪
১০৬. জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা–৪৬৮

www.bjilibrary.com

প্রত্যেক জেলা শহর হতে প্রাথমিক শাখা পর্যন্ত শাখার সভাপতিকে আহ্বায়ক, সাধারণ সম্পাদককে সাধারণ সম্পাদক করিয়া এবং ৯জন সদস্য সর্বমোট ১১জনকে নিয়া 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে। সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ব্যাপারে কলেজ ছাত্র সংসদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

প্রত্যেক শাখাকে তাহার আওতাভুক্ত এলাকার আঞ্চলিক সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে। বটতলা ও পল্টনের জনসভার প্রস্তাবাবলী এক নম্বর ইশতেহার এই সভার প্রস্তাব হিসেবে গ্রহণ করা হইল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যে 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের' সদস্যদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করিতেছে।

দেশের সকল প্রেক্ষাগৃহে পাকিস্তানী পতাকা প্রদর্শন, পাকিস্তানী সংগীত বাজানো এবং উর্দু বই প্রদর্শন বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে এবং বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত সিনেমা করও প্রদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।"[১০৭]

এসব ঘোষণা ও বক্তব্য প্রকাশের সাথে সাথে ছাত্র ও যুব নেতারা তাদের কর্মসূচী এগিয়ে নেয়ার জন্যে শিক্ষা প্রশিক্ষণের কাজও শুরু করে দেয়। সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে লণ্ডন-এর 'Times' পত্রিকার Paul Martin তাঁর এক রিপোর্ট লিখেন ঃ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে চরমপন্থী গ্রুপগুলো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং নিচ্ছিল। বহু জায়গায় স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেড গঠন করা হয়েছিলো পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে লড়াই করার জন্যে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পেট্রোল ও অন্যান্য বোমা তৈরি হচ্ছিল দেদার।'[১০৮] ২৩ মার্চ ছিলো পাকিস্তান দিবস। ছাত্র নেতারা সকলের কাছে আহ্বান জানাল সেদিন পাকিস্তানী পতাকার বদলে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের জন্যে। সামরিক ছাউনিগুলো ছাড়া সর্বত্রই সেদিন বাংলাদেশের পতাকা উড়লো। ছাত্রদের আহ্বানক্রমে ঢাকাস্থ বৃটিশ হাই কমিশন ও সোভিয়েত কনসুলেট বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করলো। কিন্তু ঢাকাস্থ চীনা, ইরানী, ইন্দোনেশিয়া ও নেপালী দূতাবাস পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করে। কিন্তু ছাত্ররা এসব দূতাবাসে গিয়ে পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের

১০৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭০৮

১০৮. Times, London, 25th March, 1971

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে।'[১০৯] ছাত্র ও যুব নেতাদের এই যে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি হলো, স্বাধীনতা যুদ্ধকালেও তা অব্যাহত থাকে। কেউ কেউ স্বাধীনতা যুদ্ধকে চারটি[১১০] ধারায় বিভক্ত করেছেন। চারটি ধারার একটি ছিলো এই ছাত্র ও যুব নেতাদের নিয়ে গঠিত। এ ধারার নেতৃত্বে ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমদ, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ ছাত্র যুব নেতাগণ। মূলধারা '৭১-এর লেখক মঈদুল হাসানের ভাষায় 'ভারতে প্রবেশের পর থেকে তারা (এই নেতারা) স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠীগত ভূমিকা গ্রহণ করেন। এদের নেতৃত্বে এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'Research and Analysis Wing' (RAW)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় 'মুজিব বাহিনী' নামে প্রবাসী সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এমন এক সশস্ত্র বাহিনীর জন্ম হয়, এক সময় যার কার্যকলাপ স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিভক্ত করে ফেলতে উদ্যত করে।'[১১১] এ যুব নেতাগণ সীমান্ত অতিক্রম করার পর প্রকাশ্যেই দাবী করতে থাকেন যে, সশস্ত্র বাহিনী ট্রেনিং এবং মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব শেখ মুজিব কেবলমাত্র তাদের চারজনের (মণি, তোফায়েল, সিরাজুল আলম ও রাজ্জাক) উপরই ন্যস্ত করেছেন, অপর কারো উপর নয়। মুক্তিযুদ্ধের শেষ অবধি তাদের এ দাবী ও ভূমিকা অপরিবর্তিত থাকে।[১১২] এরা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য করেনি, নিয়ন্ত্রণও মানেনি। ভারত সরকারের সাথে এ ছাত্র ও যুব নেতাদের গোপন ও দুর্বোধ্য সম্পর্কের কারণেই তারা কিছুই পরোয়া করতো না। RAW -এর এক বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে দেরাদুনের চাকরাতায় মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এদের প্রথম দল বেরিয়ে আসার পর তাদের ভূমিকা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন এবং সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী উভয়কেই উদ্বিগ্ন করে তোলে। 'মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা মুজিব বাহিনীর' লক্ষ্য বলে প্রচার করা হলেও এ সংগ্রামে তাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা, কার্যক্রম ও কৌশল কি, কোন্ এলাকায় এরা নিযুক্ত হবে, মুক্তিবাহিনীর অপরাপর ইউনিটের সাথে এদের তৎপরতার কিভাবে সমন্বয় ঘটবে, কি পরিমাণ বা কোন্ শর্তে এদের অস্ত্র ও রসদের যোগান ঘটছে, কোন্ প্রশাসনের এরা নিয়ন্ত্রণাধীন, কার শক্তিতে বা কোন্ উদ্দেশ্যে এরা অস্থায়ী সরকারের বিশেষত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে, এ

---

১০৯. দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ মার্চ, ১৯৭১
১১০. মূলধারা, '৭১, মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা–৬
১১১. মূলধারা, '৭১, মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা–৭
১১২. মূলধারা, '৭১, মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা–৮

www.bjilibrary.com

সমুদয় তথ্যই বাংলাদেশ সরকারের কাছে রহস্যাবৃত থেকে যায়। ক্রমে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ পায়, মুজিব বাহিনীর কেবল প্রশিক্ষণ নয়, অস্ত্রশস্ত্র ও যাবতীয় রসদের যোগান আসে RAW -এর এক বিশেষ উপসংস্থা থেকে এবং এ উপসংস্থার প্রধান মেজর জেনারেল উবান গেরিলা প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ হিসেবে 'মুজিব বাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছেন।'[১১৩] ছাত্র ও যুব নেতাদের অধীন মুজিব বাহিনী শুধু স্বাধীন ও বেপরোয়া চলেই ক্ষান্ত হয়নি, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র কেড়ে নেয়া, তাদের আনুগত্য পরিবর্তনের জন্যে চাপ দেয়া ও মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের প্ররোচনা দিয়ে চলে।[১১৪] এ অবস্থার নিরসনের জন্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আগস্ট, '৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে কোলকাতা থেকে দিল্লী যান। দিল্লী প্রশাসনের কাছে 'মুজিব বাহিনীকে বাংলাদেশ সরকারের অধীনে ন্যস্ত করা এবং তাদের অন্তর্ঘাতী তৎপরতা বন্ধ করার দাবী জানান। ভারত-প্রশাসনের একজন শীর্ষ ব্যক্তি পি. এন. হাকসার ও RAW প্রধান কাও তাজউদ্দীনের কথা শোনেন। কিন্তু নীরব থাকেন। মুজিব বাহিনীকে তার কমাণ্ডের অধীনে না দিলে জেনারেল ওসমানি পদত্যাগ করবেন, এ হুমকিতেও কোনো কাজ হয়নি।[১১৫] কিন্তু পরবর্তীকালে ছাত্র ও যুব নেতাদের স্বতন্ত্র ধারার অধীন 'মুজিব বাহিনীর' সাথে বাংলাদেশ সরকারের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটলে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিশৃংখলা ও ত্রাস সৃষ্টি থেকে তাদের বিরত করার বিভিন্ন চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর ডি. পি. ধরের পরামর্শে তাজউদ্দীন প্রতিকারের জন্যে আবার দিল্লী সরকারের শরণাপন্ন হন। এবার তিনি নিজে না গিয়ে বাংলাদেশ সরকারের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব মঈদুল হাসানকে ১২ সেপ্টেম্বর দিল্লী পাঠান। মঈদুল হাসান দিল্লী গিয়ে কি করেছিলেন তার বিবরণ এই ঃ 'ডি. পি. ধর পরদিন বিকেল চারটায় নয়া দিল্লীর প্রধান সচিবালয় 'সাউথ ব্লকে' RAW -এর প্রধান রামনাথ কাও-এর সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। সাম্প্রতিক কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনার আলোকে যথাশীঘ্র 'মুজিব বাহিনীকে' বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার পক্ষে আমার বক্তব্য কাও ভাবলেশহীন মৌনতার সাথে শ্রবণ করেন এবং আমার বক্তব্য শেষ হবার পর বিদায় জ্ঞাপনের জন্যে ক্ষণিকের জন্যে সে মৌনতা ছিন্ন করেন। চার সপ্তাহ আগে কাও তাজউদ্দীনের বক্তব্যের জবাবে যে নীরবতা প্রদর্শন করেন, তদপেক্ষা কোনো উন্নত সৌজন্য আমার

---

১১৩. মূলধারা, '৭১, মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা–৮
১১৪. মূলধারা, '৭১, মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা–৭৯
১১৫. মূলধারা, '৭১, মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা–৮০

www.bjilibrary.com

প্রাপ্য ছিলো না। পরদিন সকালে ডি. পি. ধরকে আমি জানাই যে, পূর্ববর্তী অপরাহ্নের সাক্ষাতকারের ফলে পরিস্থিতির কোনো উন্নতির সম্ভাবনা যেহেতু দৃষ্টিগোচর নয়, সেহেতু প্রতিশ্রুত 'সর্বোচ্চ মহলের' হস্তক্ষেপে মুক্তিযুদ্ধের এ দ্বৈত কমাণ্ডের অবসান একান্ত অপরিহার্য। উত্তরে তিনি আমাকে অধ্যাপক পি. এন. ধরের (তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সচিব) সাথে অপরাহ্নে সাক্ষাত করে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অবহিত করার পরামর্শ দেন। যথাসময়ে আমি তা সম্পন্ন করি বটে, কিন্তু ক্রমশ একটি ধারণা আমার মনে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে–'মুজিব বাহিনীর' স্বতন্ত্র কমাণ্ড বজায় রাখার পক্ষে ভারত সরকারের পূর্বেকার সিদ্ধান্ত এমনই জোরাল যে, এর পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজে আমি হয়তো ব্যবহৃত হয়ে চলেছি। সন্ধায় ডি. পি. ধরের সাথে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বৈঠকে প্রসংগটি পুনরায় উত্থাপিত হয়, কিন্তু সিদ্ধান্তের আভাস তার বক্তব্যে ছিলো না।'[১১৬] এ ঘটনার আরো মাস দেড়েক পর অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সাথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর একটা সাক্ষাতকার ঘটে দিল্লীতে। মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর ইউরোপ সফর শুরুর আগে তিনিই তাজউদ্দীনকে দিল্লি ডেকে নেন। এ সুযোগে তাজউদ্দীন মুজিব বাহিনীর প্রশ্নটি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তোলেন। RAW - এর সাথে সম্পর্ক ও সমর্থনের ফলে মুজিব বাহিনী যে বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে চলেছে তার বিবরণ তাজউদ্দীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেন। 'ইন্দিরা এ অবস্থার ত্বরিত প্রতিবিধানের জন্য সভায় উপস্থিত ডি. পি. ধরকে নির্দেশ দেন। ডি. পি. ধর মুজিব বাহিনীকে বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করার জন্য মেজর জেনারেল বি. এন. সরকারকে নিয়োগ করেন। এ উদ্দেশ্যে যথাশীঘ্র কোলকাতায় এক বৈঠকেরও আয়োজন করা হয়। এ বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে তাজউদ্দীন ও জেনারেল ওসমানি, মুজিব বাহিনীর পক্ষে তোফায়েল আহমদ, সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাক (আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও শেখ মণি অনুপস্থিত থাকেন) এবং ভারতের সামরিক বাহিনীর পক্ষে মেজর জেনারেল সরকার ও ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বল গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার এক পর্বে একজন যুব নেতা দাবী করেন, আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বলার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে। এরপর আলোচনা আর এগুতে পারেনি। পরে বি. এন. সরকার কেবল যুব নেতাদের নিয়ে আলোচনার জন্য 'ফোর্ট উইলিয়াম' এ মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন। কিন্তু সেখানে আওয়ামী

১১৬. মূলধারা, '৭১, মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা–১০৪-১০৫

www.bjilibrary.com

লীগের পক্ষে কথা বলার 'একমাত্র অধিকারী' সেই যুব নেতা ছাড়া আর কেউই হাজির হয়নি। কয়েকদিন বাদে যেহেতু যুব নেতাদের সকলে আগরতলায় উপস্থিত থাকবেন, সেহেতু সেখানেই তাদের সাথে বি. এন. সরকারের পরবর্তী বৈঠকের সময় স্থির করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে 'মুজিব বাহিনী'র সকল নেতা একযোগে অনুপস্থিত থাকেন। মেজর জেনারেল বি. এন. সরকারও এ পণ্ডশ্রম বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য জরুরী কাজে মনোনিবেশ করেন।'[১১৭] অর্থাৎ ভারতের খোদ প্রধানমন্ত্রীকে বলেও ছাত্র ও যুব নেতাদের স্বতন্ত্র ধারাকে বাংলাদেশ সরকার তার সাথে আনতে পারলেন না। শক্তির প্রতিযোগিতায় ছাত্র ও যুব নেতাদের ধারাটি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের চেয়ে ভারতের অধিকতর নিকট প্রমাণিত হলো।

চার

শেখ মুজিব ৩রা মার্চ তারিখে ৬ই মার্চ পর্যন্ত হরতাল কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন। তিনি ৪ঠা মার্চ এক বিবৃতি মারফত তাঁর আহ্বানে সর্বাত্মকভাবে সাড়া দেয়ার জন্যে জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে কয়েকটি কনসেশনের কথা ঘোষণা করলেন। যেসব সরকারী ও বেসরকারী অফিসের কর্মচারীদের এখনও বেতন দেয়া হয়নি, সেসব অফিসে ৫ ও ৬ই মার্চ বিকেল আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত কাজ চালানোর নির্দেশ দিলেন। অনুরূপভাবে ব্যাংকসমূহকে এ দুদিন পূর্বোল্লিখিত সময়ে বেতনের চেকের অর্থ শুধু মাত্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরে লেন-দেনের নির্দেশ দিলেন। এছাড়া জনজীবনের জন্যে জরুরী বিভাগকে হরতালের বাইরে রাখার কথা ঘোষণা করলেন। পরদিন ৫ই মার্চ শেখ মুজিব ভারতীয় রেডিওর একটা অপপ্রচারের প্রতিবাদ করলেন। ভারতীয় রেডিওতে বলা হয়েছিলো, পূর্ব পাকিস্তানে 'দমন নীতি' বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্যে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব আমেরিকা বা অন্য কোনো দেশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। ভারতীয় রেডিও আরও বলেছিলো শেখ মুজিব ভুট্টোর সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগির ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রচারকে কল্পনাপ্রসূত ও অনিষ্টকর বলে অভিহিত করলেন। দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে এ দিন বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বিবৃতি প্রকাশ পায়। জনাব আবুল মনসুর আহমদ এক বিবৃতিতে হত্যাকাণ্ড ও অবিচারের প্রতিবাদে সম্মানসূচক পাকিস্তানী তথমাধারী সকলকে তথমা বর্জন করার আহ্বান

---

১১৭. মেজর জেনারেল বি. এন. সরকারের একান্ত সাক্ষাতকারের (১০ই এপ্রিল, '৭৩) বিবরণ। মূলধারা '৭১, মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা–১৫২)

www.bjilibrary.com

জানালেন।[১১৮] পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল খালেক অপর এক বিবৃতিতে নিরপরাধ জনসাধারণকে হত্যা করার তীব্র নিন্দা করে যেসব ব্যক্তি অধিকার আদায়ের মহান সংগ্রামে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তাদের মাগফিরাত কামনা করে এবং অবিলম্বে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানিয়ে জামায়াত কর্মীদেরকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে জনসাধারণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের শাসন কায়েমের সংগ্রাম চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেন।[১১৯]

২রা মার্চ সৈন্য মোতায়েনের পর সৈন্যদের গুলী বর্ষণে ৫ মার্চ পর্যন্ত দেড় শতাধিক মৃত্যুর খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। আহতের সংখ্যা বহু–শত শত। সেনাবাহিনী কারফিউ দিয়ে এবং গুলী বর্ষণ করে বিক্ষোভ ও জনতার রোষ মুকাবিলার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির আরও অবনতিই ঘটছিলো। প্রকৃতপক্ষে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণই ছিলো না কোথাও। শেখ মুজিব ঢাকার সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী করলেন সৈন্যদের সব স্থান থেকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে। তাদের তরফ থেকে প্রশ্ন এলো, আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করবে কে ? শেখ সাহেব জানালেন, 'আমার উপর ছেড়ে দিন। আমি আমার স্বেচ্ছাসেবকদের কাজে লাগাতে পারবো। প্রয়োজন পড়লে আনসারদের ডাকবো এবং পুলিশদের সাহায্য নেব।'[১২০] ঢাকার সামরিক কর্মকর্তারা শেখ মুজিবের এ প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করলো এবং পিণ্ডির নির্দেশ নিয়ে ৫ মার্চ সকল সৈনিককে ব্যারাকে ফিরিয়ে আনা হলো।

সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়ার ফলে শেখ মুজিবের একটা দাবী মানা হলো মাত্র। অবস্থার এতে কোনোই পরিবর্তন ঘটলো না। গোটা দেশই কার্যত বন্ধ। বারুদের মতো উত্তপ্ত গোটা দেশ। সরকারের কিছুমাত্র নিয়ন্ত্রণও কোথাও নেই। সিদ্দিক সালিকের'[১২১] ভাষায় 'মানুষের দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে জেনারেল ইয়াকুব দারুণ সংবেদশীল মনের মানুষ।' ৪ঠা মার্চ জেনারেল ইয়াকুব রাওয়ালপিণ্ডিতে জেনারেল পীরজাদাকে টেলিফোনে বললেন, প্রেসিডেন্ট কালবিলম্ব না করে ঢাকা অবশ্যই যেন আসেন।

---

১১৮. দৈনিক সংগ্রাম, ৬ মার্চ, ১৯৭১

১১৯. দৈনিক সংগ্রাম, ৬ মার্চ, ১৯৭১

১২০. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা-৬১

১২১. পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তখন একজন মেজর এবং নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল গ্রন্থের লেখক

www.bjilibrary.com

একেকটা ঘণ্টা পার হয়ে যাওয়া মানে সম্ভাব্য সমাধানের পথ থেকে দূরে সরে যাওয়া।'[১২২] জেনারেল পীরজাদা অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ করে ঢাকায় টেলিফোন করে জেনারেল ইয়াকুবকে জানালেন, প্রেসিডেন্ট খুব শিগগিরই ঢাকা সফরে যাচ্ছেন। কিন্তু এ মুহূর্তে কোনো নতুন তারিখ দেয়া রীতিমতো অসুবিধাজনক ব্যাপার। প্রেসিডেন্ট 'এক্ষুণি' মুজিবের সাথে কথা বলবেন এবং 'অবস্থা ঘোরালো না করার জন্য' তাঁকে বলবেন।'[১২৩] কিন্তু রাত ৯টা ১০ মিনিটে ঢাকা সেনাসদরে জেনারেলদের একটা বৈঠখকালীন সময়ে জেনারেল ইয়াকুব আবার টেলিফোন পেলেন পিণ্ডি থেকে। খোদ প্রেসিডেন্টের টেলিফোন। জেনারেল ইয়াকুব টেলিফোন ধরলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে বললেন, 'আমি মত বদলেছি, আমি ঢাকা আসছি না।' জেনারেল ইয়াকুব তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া বললেন, না আমি আসতে পারি না, কেননা আমি বুঝে ফেলেছি এ সফর সমস্যা সমাধানের কাছাকাছিও যেতে পারবে না[১২৪] জেনারেলকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে প্রেসিডেন্ট টেলিফোন রেখে দিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া টেলিফোন রেখে দেবার পর কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার বর্ণনা সেখানে উপস্থিত সেনা অফিসার মেজর সিদ্দিক সালিক এভাবে দিয়েছেন ঃ 'তাৎক্ষণিকভাবে তিন জে নারেলের (জেনারেল ইয়াকুব, জেনারেল খাদিম রাজা, জেনারেল ফরমান) মধ্যে নিদারুণভাবে হতাশাব্যঞ্জক প্রতিক্রিয়ার জন্ম হলো। এখন কি করা যেতে পারে ? প্রেসিডেন্ট আশার আলো নির্বাপিত করে দিলেন। এবার জেনারেল ইয়াকুব জেনারেল পীরজাদাকে টেলিফোন করলেন। তাঁকে সাথে সাথে পাওয়া গেল। তিনি বললেন, পীর, যদি প্রেসিডেন্টকে (ঢাকায়) আসতে রাজী করানো না যায়, তাহলে আমার দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দেয়া হোক। কাল সকালেই আমি আমার ইস্তিফাপত্র পাঠিয়ে দেব।' টেলিফোনে কথা শেষ হতেই খাদিম ও ফরমান দুজনেই ইস্তিফা দিতে চাইলেন। তাতে জেনারেল ইয়াকুব বললেন, 'এই সমর্থনের জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। এটা ট্রেড ইউনিয়ন নয়, সেনাবাহিনী। তোমরা কাজ চালিয়ে যাও।' বৈঠক শেষ হবার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, জেনারেল ফরমানকে আজ মধ্যরাতের ফ্লাইটে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দফতরে (রাওয়ালপিণ্ডি) যেতে হবে পীরজাদা ও প্রেসিডেন্টকে পরিস্থিতির গুরুত্ব জ্ঞাত করাবার জন্যে প্লেনে উঠে তিনি আটটি ঘণ্টা সময় পাবেন এ

১২২. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা-৬২
১২৩. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা-৬২
১২৪. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা-৬২

www.bjilibrary.com

সংবেদশীল মিশনের উপর চিন্তা-ভাবনা করার। পরের দিন (৫ মার্চ) জেনারেল ইয়াকুব সিগনালের (টেলিগ্রাম) মাধ্যমে রাওয়ালপিণ্ডিতে ইস্তিফাপত্র পাঠিয়ে দিলেন। ...... জেনারেল ইয়াকুবের ইস্তিফাপত্র রাওয়ালপিণ্ডিতে পৌঁছাবার আগেই প্রেসিডেন্ট পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তিনি একজন সামরিক আইন প্রশাসক (পাঞ্জাব) ও কোর কমাণ্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে রাওয়ালপিণ্ডিতে ডেকে পাঠালেন জেনারেল ইয়াকুবের দায়িত্বভার তার হাতে তুলে দেয়ার জন্যে। জেনারেল ফরমান ও জেনারেল টিক্কা দুই জায়গা থেকে এবং ভিন্ন ধরনের মিশন নিয়ে এ সময়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে পৌঁছলেন। প্রেসিডেন্ট দুজনের সাথে আলাদা আলাদাভাবে সাক্ষাত দিলেন। জেনারেল ফরমান প্রেসিডেন্টের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলেন এবং পরিস্থিতির মোড় পরিবর্তনে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আবেদন জানালেন। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে জেনারেল ইয়াহিয়া বললেন, 'আমার ঘাঁটি সম্পর্কে আমাকে ভাবতে হয় বাচ্চু। পশ্চিম পাকিস্তান সম্পর্কে আমাকে ভাবতে হবে। আমি তো আমার নিজের ঘাঁটিকে ধ্বংস করতে পারি না।'[১২৫]

পর্দার অন্তরালে এসব ঘটনা যখন ঘটে গেল; তারপরই ভুট্টোর সাথে ৫ ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক হলো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার। এ বৈঠকের পরই ঘোষণা এলো প্রেসিডেন্ট ৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। ৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সাড়ে ১২ মিনিটের একটা ভাষণ দিলেন। ভাষণে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বললেন, 'আপনারা দেখবেন যে, নির্বাচন সম্পন্ন করার পর প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরের যতগুলো পদক্ষেপ আমি নিয়েছি, আমাদেরই কিছু নেতা এভাবে কিংবা সেভাবে তা বানচাল করে দিয়েছে। আমি উল্লেখ করতে চাই, নির্বাচন শেষ হবার পর ১৭ই জানুয়ারী এবং তার পরে আমি ঢাকায় দুই বড় দলের নেতাদের সাথে দেখা করেছি এবং নেতারাও পরস্পর দেখা করেছেন। আমি তাঁদেরকে একাধিকবার সামনে এগুবার পথ বের করার জন্যে আমার সাথে আলোচনায় আসার জন্যে আহ্বান জানিয়েছি। কিন্তু দুঃখের সাথেই বলতে হয়, আওয়ামী লীগ প্রধান আমার আমন্ত্রণকে সাড়া দেবার যোগ্য মনে করেননি। এভাবে আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝি দূর করার সুযোগ আমরা নষ্ট করেছি। পশ্চিম পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যক সদস্য ৩রা মার্চের অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকার করার ফলে পরিবেশ শাসনতন্ত্র তৈরির মতো কাজের অনুকূল না থাকায় আমি

১২৫. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা–৬২-৬৩

www.bjilibrary.com

সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, এ অবস্থায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হবে অর্থহীন, এমনকি জাতীয় পরিষদ এর ফলে বাতিলও হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমি অধিবেশন বাতিল করে অবস্থার অবনতি রোধ করতে চেয়েছি। আমি এর দ্বারা চেয়েছি একদিকে জাতীয় পরিষদ রক্ষা করতে, অন্যদিকে অর্থপূর্ণ আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আমার পদক্ষেপকে এ দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। আমাদের পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃত্ব এর বিরুদ্ধে এমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন যার ফলে অনিষ্টকারী শক্তিরা রাস্তায় নামা এবং জীবন ও সম্পদ ধ্বংস করার সুযোগ পেল।[১২৬]

৩রা মার্চের পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করে দেয়াকে সম্পূর্ণভাবে ভুল বোঝা হয়েছে। খোদ পরিষদকে রক্ষার স্বার্থে এ স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কোটি কোটি মানুষের প্রতি তাঁর কর্তব্য এ দেশকে রক্ষা করা। জনগণ আমার থেকে এটা আশা করে এবং আমি তাদেরকে নিরাশ করবো না। আমি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে কোটি কোটি নিরপরাধ পাকিস্তানীর আবাসভূমিকে ধ্বংস করতে দেবো না। শাসনতন্ত্র তৈরির ব্যাপারে নেতাদের একটি ব্যাপক সমঝোতায় নিয়ে আসার জন্য আমি যা চেষ্টা করেছি তা সফল হয়নি। পাকিস্তানের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের স্থায়িত্ব সম্পর্কে যাদের সন্দেহ রয়েছে, সেসব রাজনৈতিক দলের প্রতি আমি বলতে চাই যে, আইন কাঠামো আদেশের বিভিন্ন ধারার চেয়ে কোনো উত্তম নিশ্চয়তার প্রয়োজন নেই।'[১২৭] প্রেসিডেন্টের ভাষণের পরপরই ভুট্টোর প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল। রাওয়ালপিণ্ডির এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, '২৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে তাঁর দল যোগ দেবে।' তিনি আরও বললেন, '৬ দফার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনার জন্য তাঁর দল এখনও প্রস্তুত। রাজনৈতিক দল হিসেবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বসার পূর্বে পিপলস পার্টি শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে ব্যাপক মতৈক্যের চেষ্টা করছে। পশ্চিম পাকিস্তানে জনমত গঠন করে ৬ দফার কাছাকাছি আসতে আমরা চেষ্টা করবো এবং সমস্ত প্রদেশের জন্য গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে পরিষদ যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় আমাদেরকে তার প্রতিও নজর রাখতে হবে।'[১২৮] দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে আইন কাঠামোর (L. F. O) উপর দাঁড়িয়ে রাখতে চাইছেন। অন্যদিকে যদিও

---

১২৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৬৯০-৬৯১

১২৭. দৈনিক সংগ্রাম, ৭ মার্চ, ১৯৭১

১২৮. দৈনিক সংগ্রাম, ৭ মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

ভুট্টো বলছেন, তাঁরা ছয় দফার কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করবেন, কিন্তু তিনি সেই সাথে 'সমস্ত প্রদেশের জন্য গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র রচনা'র কথা বলে রাখছেন। অর্থাৎ ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর পূর্ব অবস্থানের কোনোই মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণের ২ ঘন্টা পর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির একটি জরুরী বৈঠক রুদ্ধ কক্ষে শুরু হলো। রাতে তাদের আরেক দফা বৈঠক হয়, কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া গেলো না। ৬ মার্চ ছিলো ২রা মার্চ ঘোষিত কর্মসূচীর শেষ দিন। এদিনও গোটা দেশে ২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হলো। খুলনায় গুলী বর্ষণের ঘটনা ঘটলো। ১০৪জন হতাহত হওয়ার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো। ঢাকাতেও পুলিশের গুলীতে ৩৭জন হতাহত হলো। ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে গেট ভেংগে ৩২৫জন কয়েদী পালিয়ে গেলো। বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থা। ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের তারিখ বাহ্যিকভাবে অবস্থার কোনোই পরিবর্তন ঘটাল না। উপরন্তু এদিন (৬ মার্চ) জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও গবর্নর হিসেবে ঘোষণা অবস্থার আরও অবনতিই ঘটালো। শ্লোগান উঠলো 'আপোসের বাণী আগুনে জ্বালিয়ে দাও।'[১২৯] জনাব কামরুদ্দিন আহমদ তখনকার অবস্থার চিত্র এঁকেছেন এভাবে ঃ 'শেখ সাহেব তাঁর ৭ মার্চের ভাষণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। অন্যদিকে ছাত্রদের প্রধান কার্যালয় জহুরুল হক হল থেকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ বাহিনী ও আনসারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হচ্ছিল। ছাত্ররা এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো যার পরিপ্রেক্ষিতে শেখ সাহেব তাঁর ৭ মার্চের বক্তৃতায় স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হন।'[১৩০] এ অবস্থার মধ্যেই ৭ মার্চের সূর্যোদয় ঘটলো।

৭ মার্চের সূর্যোদয়ের আগে রাতের কালো আবরণের অন্তরালে আরো কয়েকটা ঘটনা ঘটে। একটির বিবরণ মেলে ঢাকায় পাকিস্তান আর্মির জনসংযোগ অফিসার মেজর সিদ্দিক সালিকের কাছ থেকে। তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া টেলিফোনে মুজিবের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেন এবং তাঁকে রাজী করানোর চেষ্টা করে বলেন, এমন পদক্ষেপ যেন তিনি না নেন, যেখান থেকে ফিরে আসার উপায় থাকবে না। এরপর তিনি মুজিবের উদ্দেশে টেলিপ্রিন্টারে একটি বার্তা প্রেরণ করেন। মধ্যরাতে আমার

---

১২৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৬৯৩

১৩০. স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর, কামরুদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা–১০৯

www.bjilibrary.com

উপস্থিতিতে এ বার্তাটি ঢাকার সামরিক আইন সদর দফতরে পৌঁছে। পাঠাবার আগে আমি তাড়াতাড়ি পড়ে নিলাম। পরবর্তীতে আমার স্মরণের উপর নির্ভর করে আমি সেটা ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করে ফেললাম। বার্তা আমার ডাইরিতে এভাবে লিপিবদ্ধ আছে ঃ 'অনুগ্রহ করে কোনো দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি শিগগিরই ঢাকায় আসছি এবং আপনার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি আপনার আকাঙ্ক্ষা এবং জনগণের প্রতি দেয়া আপনার প্রতিশ্রুতির পুরোপুরি মর্যাদা দেবো। আমার কাছে একটি পরিকল্পনা আছে যা আপনাকে আপনার ছয় দফা থেকেও বেশী খুশি করবে। আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, কোনো দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না।' একজন ব্রিগেডিয়ার নিজে ধানমণ্ডির বাড়ীতে গিয়ে মুজিবের হাতে বার্তাটি পৌঁছে দিয়ে এলেন। .... ওই রাতে জিওসি'র বাড়ীতে রাত দুটায় তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুললো সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার। আওয়ামী লীগের দুজন প্রতিনিধি ছিলো তাঁর সাথে। মুজিবের দূতরা জিওসি কে বললেন, 'শেখ সাহেব চরমপন্থীদের তরফ থেকে চাপের মধ্যে রয়েছেন। তারা তাঁকে একপক্ষীয় স্বাধীনতা ঘোষণার জন্যে চাপ দিচ্ছে। তাদেরকে উপেক্ষা করার মতো শক্তিও তাঁর নেই। তাই তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে, তাঁকে সামরিক বাহিনীর হেফাজতে নিয়ে আসা হোক।' জিওসি জবাবে বললেন, 'আমি নিশ্চিত, কিভাবে চাপ প্রতিহত করতে হয়, মুজিবের মতো একজন জনপ্রিয় নেতা তা ভালোভাবেই জানেন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে দিয়ে কিছুই করানো যাবে না। তাঁকে বলবেন, আমি সেখানেই (রমনা রেসকোর্সে) থাকবো চরমপন্থীদের আক্রোশ থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্যে। কিন্তু এও বলে দেবেন, যদি তিনি পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেন, তাহলে আমি সম্ভাব্য সবকিছুই করবো। বিশ্বাসঘাতকদের হত্যার জন্যে ট্যাংক, কামান, মিশিনগান–সবই। প্রয়োজন যদি হয় ঢাকাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবো। শাসন করার জন্যে কেউ থাকবে না, শাসিত হবার জন্যেও কেউ থাকবে না।'[১৩১] আরেকটা ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন কামরুদ্দিন আহমদ। লিখেছেন তিনি, '৬ মার্চ রাতে মার্শাল-ল' এডমিনিস্ট্রেটর সাহেবজাদা ইয়াকুব ও গবর্নর এডমিরাল আহসান শেখ সাহেবের সাথে সাক্ষাত করে জানিয়ে দিলেন যে, তাদের দুজনকেই পরের দিন পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেতে হবে। এবং দুজনের স্থলে জেনারেল টিক্কা খান মার্শালল' এডমিনিস্ট্রেটর ও গবর্নর দুটো পদেই

---

১৩১. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা–৬৪-৬৫

www.bjilibrary.com

নিযুক্ত হয়েছেন। টিক্কা খান সম্পর্কে জেনারেল ইয়াকুব শেখ মুজিবকে বললেন, টিক্কা খান একজন সাধারণ সৈনিক থেকে পদোন্নতি পেয়ে লেঃ জেনারেল হয়েছেন। এ পুরস্কার তিনি পেয়েছেন বিশেষ করে তার নিষ্ঠুরতার জন্যে এবং সাথে সাথে নামকরা একজন ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে। বেলুচিস্তানে টিক্কা খান কিভাবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলেন, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণও শেখ সাহেবের সামনে তিনি তুলে ধরলেন। তিনি আরও বললেন যে, টিক্কা খানের পক্ষে রেসকোর্সের জনসভায় বোমা বর্ষণ করাও সম্ভব যদি তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।'[১৩২] এ দুটি ঘটনার সময় নির্ঘণ্ট দেয়া নেই। তবে প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে মধ্য রাতে। সুতরাং এ শেষের ঘটনাটি আগে ঘটেছে, এটাই স্বাভাবিক। এ দুই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় ঢাকা ও রাওয়ালপিণ্ডির সামরিক কর্তৃপক্ষ ধরেই নিয়েছিলেন যে, ৭ মার্চ তারিখে শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন। বাইরে থেকে এ উপলব্ধিটাই স্বাভাবিক ছিলো। শ্লোগান, তৎপরতা এবং কথাবার্তায় এমন পরিবেশই সৃষ্টি করা হয়েছিলো। রাত দুটায় জিওসির কাছে মুজিবের বার্তাও তাই প্রমাণ করে।

৭ মার্চ। রেসকোর্সে লাখো বিক্ষুব্ধ জনতার উত্তাল ঢেউ। চারদিকটা রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় কাঁপছে। এ পরিবেশে বেলা ২টা ৩০ মিনিটে শেখ মুজিব তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন ঃ

"আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বুঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম ? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলী বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলছি বাংলাদেশের করুণ ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস—এ রক্তের ইতিহাস মুমূর্ষ মানুষের করুণ আর্তনাদ —এ দেশের করুণ ইতিহাস, এ দেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৩২. স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর, পৃষ্ঠা-১১০

www.bjilibrary.com

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আয়ুইব খাঁ মার্শাল-ল জারি করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৪ সালে ৬ দফা আন্দোলনের সময় আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুইব খাঁর পতনের পরে ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন–আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম ১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিতে; তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসে প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এসেম্বব্লির মধ্যে আলোচনা করবো–এমনকি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশী হলেও একজনের মতেও যদি তা ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সাথে আমরা আলোচনা করলাম–আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো–সবাই আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বর যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যে যাবে তাদের মেরে ফেলে দেয়া হবে, যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত জোর করে বন্ধ করে দেয়া হবে। আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে। আর হঠাৎ ১ তারিখ এসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, যাবো না। ৩৫জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এলেন। তারপর হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয়া হলো, দোষ দেয়া হলো বাংলার মানুষের, দোষ দেয়া হলো আমাকে। দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।

আমি বললাম, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিলো। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, সংগ্রাম চালিয়ে

www.bjilibrary.com

যাবার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। আমি বললাম, আমরা জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই আমার দেশের গরীব-দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে–তার বুকের উপর হচ্ছে গুলী। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের উপর গুলী করা হয়েছে। কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন, আমি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকবো।

আমি বলেছি, কিসের এসেম্বলি বসবে। কার সাথে কথা বলবো। আপনারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সাথে কথা বলবো? পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমার উপর, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন। দায়ী আমরা !

২৫ তারিখে এসেম্বলি ডেকেছে ! রক্তের দাগ শুকায়নি। ১০ তারিখে বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর পাড়া দিয়ে এসেম্বলি খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল-ল' Withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভেতর ঢুকতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে, তাদের তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে আমরা বসতে পারি না।

আমরা প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সে জন্যে যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ী, রেল চলবে-শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন না দেয়া হয়, এরপর যদি ১টি গুলী চলে, এরপর যদি আমার

www.bjilibrary.com

লোককে হত্যা করা হয়-তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেকের ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, পানিতে মারবো। সৈন্যরা, তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাক, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলী করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য টাকা পৌঁছে দেবেন। আর ৭ দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এ দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন ওয়াপদা ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হলো-কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখুন, শত্রু পেছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই, বাঙালী-অবাঙালী-তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শুনে তাহলে কোনো বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারবে ! পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাঙলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।

এ দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে-বাঙালীরা বুঝে-সুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন। এবং আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। যখন রক্ত দিয়েছি আরও দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে তুলবো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'[১৩৩]

---

১৩৩. শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণের টেপরেকর্ড থেকে লিপিবদ্ধ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭০০-৭০২

www.bjilibrary.com

ক্ষোভ, উত্তেজনা ও আবেগে উত্তাল রেসকোর্সের জনসমুদ্রকে শেখ মুজিবের এ ভাষণ উত্তেজনায় আরও উদ্দীপ্ত করেনি, তাদের শান্ত করতে চেয়েছে। বিদ্রোহের আগুন তখন চারদিকে। কিন্তু শেখ মুজিব তাঁর বক্তৃতা শুরু করেছেন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বেদনার ভাষা দিয়ে। অর্ধেকেরও বেশী তিনি বলেছেন তাঁর বেদনার কথা। আর বক্তৃতার শেষাংশে ছিলো চাপ প্রয়োগের কর্মসূচী এবং হুশিয়ারি উচ্চারণ ও যা দুর্বিনীত এক পক্ষের কাছে জনগণের দাবী আদায়ের জন্যে ছিলো অপরিহার্য। তিনি সেদিন আবেগের কাছে নয়, বুদ্ধিবৃত্তির কাছে আবেদন রেখেছিলেন যা সমস্যা সমাধানের সহায়ক। জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের জন্যে তিনি চারটি[১৩৪] শর্ত দিয়েছিলেন যার কোনোটিই নতুন ছিলো না। এ দাবীগুলো তিনি আগেও করেছিলেন, অন্যান্য নেতৃবৃন্দও করেছিলেন। সুতরাং শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ কোনো নতুন সংকট সৃষ্টি করেনি, সংকট সমাধানের পথ আরও সুনির্দিষ্ট করেছে, উন্মুক্ত করেছে।

৭ মার্চ তারিখেই আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত অহিংসঅসহযোগের সপ্তাহব্যাপী নিম্নলিখিত কর্মসূচী ঘোষণা করেনঃ

(১) কর না দেয়ার আন্দোলন চলবে।

(২) সেক্রেটারিয়েট, সরকারী ও আধা সরকারী অফিস, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশের অন্যান্য আদালত হরতাল পালন করবে। এ ব্যাপারে কি কি শিথিল করা হবে, তা সময়ে সময়ে জানান হবে।

(৩) রেলওয়ে ও বন্দরসমূহ কাজ চালিয়ে যাবে। তবে জনগণের উপর অত্যাচারের উদ্দেশ্যে রেলওয়ে বন্দরকে সৈন্য সমাবেশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাইলে রেল ও বন্দর কর্মচারীরা তাতে সহযোগিতা করবে না।

(৪) বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রকে আমাদের বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করতে হবে এবং তারা জনতার আন্দোলনের সংবাদ চেপে যেতে পারবে না।

(৫) কেবলমাত্র স্থানীয় ও আন্তঃজেলা ট্রাংক-টেলিফোন যোগাযোগ চলবে।

(৬) সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

---

১৩৪. চারটি শর্ত ঃ (১) মার্শালল' তুলে নিতে হবে, (২) জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, (৩) সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে এবং (৪) হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

www.bjilibrary.com

(৭) স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোনো উপায়ে দেশের পশ্চিম অঞ্চলে টাকা পাঠাতে পারবে না।

(৮) প্রতিদিন সমস্ত ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে।

(৯) অন্যান্য ক্ষেত্রে হরতাল প্রত্যাহার হলো। তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে যে কোনো মুহূর্তে পূর্ণ অথবা আংশিক হরতাল ঘোষণা করা যেতে পারে।

(১০) স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রত্যেক ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা এবং জেলায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হবে।

এ কর্মসূচী ঘোষণা করে তিনি বলেন, রেলওয়ে, রিকশা ও সড়ক পরিবহন ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে কাজ চলবে। বেতন সংক্রান্ত টাকা, চেক ইত্যাদির জন্যে ব্যাংকসমূহ দু ঘণ্টা খোলা থাকবে। কল-কারখানার মালিকরা কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন দেবে। রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে আমাদের নিউজ না দিতে পারলে বাঙালীরা সেখানে কাজ করবে না।[১৩৫]

৭ মার্চ ঢাকার সামরিক সরকার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি মারফত ৬ মার্চ পর্যন্ত ঘটনা ও হরতালের একটা বিবরণ দিলেন। ১লা মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত ১৭২জন নিহত ও ৩৫৮জন আহত হবার খবর দিয়ে বললো, এ আহত নিহতের ভেতর নিজেদের মধ্যে দাংগাকালে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী, ফিরোজবাগ কলোনী ও ওয়ারলেস কলোনীতে মারা গেছে ৭৮জন এবং আহত হয়েছে ২০৫জন। সেনাবাহিনীর গুলীতে নিহত হয় ৫জন এবং আহত হয় ১জন। অন্যদিকে ইপিআর-এর বুলেট বিদ্ধ হয়ে মারা গেছে দুজন। খুলনায় ৩রা মার্চ ও ৪ঠা মার্চে স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মধ্যে দাংগা দমনকালে পুলিশের গুলীতে মারা গেছে ৪১জন। স্থানীয় গোলযোগ প্রশমনে পুলিশের বুলেট বিদ্ধ হয়ে মারা গেছে ৩জন এবং জখম হয়েছে ১১জন। একটি ট্রেন লাইনচ্যুত করাকালে ৪ঠা মার্চ খুলনায় পুলিশের গুলীতে মারা গেছে চারজন এবং আহত হয়েছে ১জন। ৩৪১জন আসামী ও বিচারাধীন অভিযুক্ত ব্যক্তি ৬ মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলখানা ভেংগে পালাবার চেষ্টা করেছিলো। ফলে পুলিশকে গুলী করতে হয়। এতে প্রাণ হারায় ৭জন এবং আহত হয় ৩০জন। একদল হিংসাত্মক জনতা ৩রা ও ৪ঠা মার্চ যশোর, খুলনা ও রাজশাহীর টেলিফোন কেন্দ্রে আক্রমণ চালায়। এ সময় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা যশোর থেকে খুলনা যাচ্ছিল। পথের মধ্যে জনতা কর্তৃক তারা আক্রান্ত হয়। ফলে তাদেরকে গুলী ছুঁড়তে হয়।

---

১৩৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৭০৩-৭০৪, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা–৪৭৪-৪৭৫

www.bjilibrary.com

এতে ৩ ব্যক্তি মারা যায় এবং কয়েকজন আহত হয়। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা তাদের দায়িত্ব পালনকালে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। মারা গেছে একজন অফিসার ও আহত হয়েছে একজন। ২রা ও ৩রা মার্চ রাতে নওয়াবপুর-তাঁতীবাজার দুর্ঘটনায় ইপিআর-এর গুলীতে মারা গেছে ৬জন এবং আহত হয় ৫৩জন। আত্মরক্ষার জন্যে একজন ইপিআর সদস্য গুলী ছোঁড়ে। তাতে নিহত হয়েছে চারজন এবং আহত হয়েছে তিনজন। সারা প্রদেশে সেনাবাহিনীর গুলীতে মৃতের সংখ্যা হচ্ছে ২৩জন এবং আহতের সংখ্যা ২৬জন। ২রা মার্চ ৩রা মার্চ যখন সদরঘাটে সেনাবাহিনীর উপর জনতা আক্রমণ করে, তখন নিহত ৬জন এবং ৩রা মার্চ স্থানীয় টেলিভিশন কেন্দ্রে জনতা চড়াও হলে নিহত ১জন এ সংখ্যার মধ্যে শামিল রয়েছে।[১৩৬]

মানুষ সরকারী এ বক্তব্য বিশ্বাস করেনি। বিশ্বাস যে করেনি একথাও ঐ বিবরণের সাথে পাওয়া গেছে। বলা হয়েছে, "বাঙ্গালীরা হতাহতের এ সংখ্যা বিশ্বাস করলো না। তারা ভাবলো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আসল ঘটনা খাটো করে দেখানো হয়েছে। বরং তারা খবরের কাগজের উচ্চকণ্ঠ চিৎকৃত হেডলাইনগুলোকেই বিশ্বাস করলো। খবরের কাগজগুলো হেডলাইন করলো, 'কয়েকশত বুলেটবিদ্ধ ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে', 'সেনাবাহিনীর গুলীতে হাজার হাজার লোক নিহত', 'নিরপরাধ নারী-শিশুরাই আক্রমণের শিকার' ইত্যাদি।'[১৩৭] তখন এ বাস্তব অবস্থার বিবরণ দেয়ার সাথে সাথে সংবাদপত্র ও সরকারী প্রেস বিজ্ঞপ্তির একটা ব্যর্থতা সম্পর্কেও একটা বড় ক্ষোভের প্রকাশ এখানে দেখতে পাওয়া যায়। ঐ ক্ষোভে বলা হয়েছে, "প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও সংবাদপত্র যা রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হলো, তাহলো অবাঙ্গালীদের যাতনা। আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসবাদীদের হাতে যারা সর্বক্ষণ যাতনার শিকার হচ্ছিল। কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব দেয়া হয় যে, আওয়ামী লীগের এ ডিফ্যাক্টো শাসনামলে তাদের নৃশংসতার বিবরণ প্রকাশ করা হোক। কিন্তু পিণ্ডি কর্তৃপক্ষ এ প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করেন। তারা এ ব্যাপারে দুটো কারণ দর্শান। প্রথমত কর্তৃপক্ষ বলেন, এ প্রস্তাবের পক্ষে গেলে দ্বি জাতিতত্ত্বকে (মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করেছে) অস্বীকার করা হয়। দ্বিতীয়ত এটা পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে তুলতে পারে। সেখানে এক বিরাট সংখ্যক বাঙ্গালী শান্তিতে বসবাস করছে।[১৩৮]

১৩৬. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা–৬৮
১৩৭. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা–৬৯
১৩৮. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা–৬৯

www.bjilibrary.com

৬ মার্চ তারিখে ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকলেন। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, যে যে কারণে ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন মুলতবি করা হয়েছিলো, সেসব কারণ কিন্তু ৬ মার্চ তারিখে দূর হয়নি। বরং দু পারের দুই নেতা মুজিব ও ভুট্টোর ফারাক আরও বহু যোজন বেড়ে গিয়েছিলো, অবিশ্বাসের ভিত আরও মযবুত হয়েছিলো। উপরন্তু শেখ মুজিব আগের চেয়ে আরও কঠোরতর অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এ পরিস্থিতিতেই ইয়াহিয়া স্থগিত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আবার ডাকলেন। অর্থাৎ ইয়াহিয়া খান সেই পানিই খেলেন, কিন্তু আরও ঘোলা করে খেলেন, সেই পথেই তিনি ফিরে আসলেন, কিন্তু আরও অনেক ক্ষতি করে এলেন। পূর্ব পাকিস্তানের একজন রাজনীতিক এ বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি পূর্ব-পাক জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। তিনি ৭ মার্চ তারিখে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বললেন, "অধিবেশন স্থগিতের কারণসমূহ দূরীভূত হয়েছে কি ? যদি না হয়ে থাকে, তাহলে পরিষদের অধিবেশন পুনরায় ডাকা হলো কিভাবে ? সেসব কারণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি অধিবেশন ডাকা যেতে পারে, তাহলে আগে তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিলো কেন ? কেন নির্বাচনের পর উদ্বোধনী অধিবেশন বিলম্বিত হলো ? নব ঘোষিত তারিখ এতো পিছিয়ে দেয়ার কারণ কি ? প্রেসিডেন্ট জনাব ভুট্টোর কোনো দোষই খুঁজে পাননি। অথচ ভুট্টো সাহেব অধিবেশন স্থগিত করা না হলে খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত তুমুল আন্দোলন শুরু করার হুমকি দেন এবং বার বার ৩রা মার্চের অধিবেশনে যোগ দেবেন না বলে ঘোষণা করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষাক্ত করে তোলেন। আমি কি জনাব ভুট্টোকে প্রশ্ন করতে পারি যে, তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পূর্বাহ্নিক সমঝোতা ছাড়া ২৫শে মার্চের অধিবেশনে যোগদান করার ব্যাপার কিভাবে রাজী হলেন ? কোনো চুক্তি ব্যতিরেকেই যদি তিনি এখন অধিবেশনে যোগ দিতে প্রস্তুত হয়ে থাকেন, তবে আগে তিনি অচলাবস্থা সৃষ্টি করলেন কেন ?"[১৩৯] প্রশ্নগুলোর জবাব কেউ কখনও দেননি।

শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণের কোনো সরকারী প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া গেলো না। তবে ঢাকা সামরিক প্রধানের উক্তি নাকি এ রকম ছিলো যে, "বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই সবচেয়ে উত্তম ভাষণ।"[১৪০] ভুট্টোও কিছু প্রকাশ করলেন না। ৮ মার্চ সাংবাদিকদের এক

---

১৩৯. দৈনিক সংগ্রাম, ৮ মার্চ, ১৯৭১

১৪০. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা–৬৬

www.bjilibrary.com

প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, শেখ মুজিবের বক্তৃতা বিবেচনা করে দেখার পর তিনি মত প্রকাশ করবেন।[১৪১] তবে পশ্চিম পাকিস্তানের নসরুল্লাহ খান, মিয়া নিজামুদ্দীন এবং পূর্ব পাকিস্তানের খাজা খয়ের উদ্দীন, আতাউর রহমান খান, খান এ সবুর এবং নূরুল আমীন এক বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের কাছে আবেদন রাখলেন। 'দেশকে রক্ষা করুন' শিরোনামে তাদের বিবৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হলো।[১৪২] এ দিন এ বিষয়ে একটি ছাত্র সংগঠনের[১৪৩] বিবৃতিও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ইসলামী ছাত্র সংঘের ঐ বিবৃতিতে বলা হয়, '৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন মুলতবি সংক্রান্ত ঘোষণার পর থেকে দেশে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে যে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, বর্তমানের সামরিক সরকার তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে দেশ এক মারাত্মক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। সামরিক সরকার যদি আন্তরিকভাবেই দেশের কোটি কোটি মানুষের কল্যাণ কামনা করে থাকেন, তাহলে তাদের উচিত এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে সামরিক শাসন তুলে নেয়া এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। এছাড়া সংকট উত্তরণের আর কোনো বিকল্প নেই।'[১৪৪]

৮ মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে হরতাল কর্মসূচীর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা ও শিথিলতা ঘোষণা করলেন ঃ

(১) সকল ব্যাংক বেলা ৯টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ব্যাংকিং কাজের জন্যে খোলা থাকবে এবং বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রশাসনিক কাজের জন্যে খোলা থাকবে। শুধুমাত্র জমা, বাংলাদেশের মধ্যে আন্তঃব্যাংক ক্লিয়ারেন্স এবং নিম্নলিখিত কারণে লেনদেনের জন্যে ব্যাংক খোলা থাকবে।

(ক) বেতন এবং গত সপ্তাহের বেতন দান।

(খ) ১ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যক্তিগত টাকা তোলা।

(গ) মিল ফ্যাক্টরী চালাবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় শিল্প কাঁচামাল যেমন পাট ও আখ কেনার জন্যে টাকা তোলা।

---

১৪১. দৈনিক সংগ্রাম, ৯ মার্চ, ১৯৭১

১৪২. দৈনিক সংগ্রাম, ৮ মার্চ, ১৯৭১

১৪৩. আওয়ামী লীগপন্থী ও বামপন্থী সকল ছাত্র সংগঠন ৩রা মার্চ স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের স্বাধীনতা ঘোষণার অনুকূলে স্বাধীনতার পক্ষে এবং মুজিবের আপোস প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কাজ করছিলো।

১৪৪. দৈনিক সংগ্রাম, ৯ মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

২. স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোনোভাবে বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাচার করা চলবে না।

৩. উপরোক্ত ব্যাংকিং কাজ চালানোর জন্যে শুধুমাত্র স্টেট ব্যাংক খোলা থাকবে। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

৪. ইপি ওয়াপদা বিদ্যুত সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগ শুধুমাত্র খোলা রাখবে।

৫. পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন সংস্থা শুধুমাত্র সার সরবরাহ ও পাওয়ার পাম্পের জন্য ডিজেল সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে চালু থাকবে।

৬. ইটখোলার জন্যে কয়লা সরবরাহ চালু থাকবে এবং পাটবীজ ও বীজ ধান সরবরাহ কার্যকরী থাকবে।

৭. খাদ্যশস্য সরবরাহ চলাচল অব্যাহত থাকবে।

৮. উপরোল্লিখিত যে কোনো উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র চালান পাস করার জন্যে ট্রেজারী ও এ. জি অফিস খোলা থাকবে।

৯. ঘূর্নিদুর্গত এলাকাসমূহে রিলিফ ও পুনর্বাসন কাজ অব্যাহত থাকবে।

১০. পোস্ট ও টেলিগ্রাম অফিস শুধুমাত্র বাংলাদেশের ভেতরে চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মনি অর্ডার প্রেরণের উদ্দেশ্যে চালু থাকবে। তবে প্রেস টেলিগ্রাম বাইরেও প্রেরণ করা যাবে। পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক খোলা থাকবে।

১১. পূর্ব পাকিস্তান সড়ক পরিবহন সংস্থা বাংলাদেশের সর্বত্র কাজ চালিয়ে যাবে।

১২. পানি ও গ্যাস সরবরাহ চালু থাকবে।

১৩. স্বাস্থ্য রক্ষা ও স্যানিটেশন সার্ভিস কার্যকরী থাকবে।

১৪. পুলিশ শান্তি-শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন করে যাবে। প্রয়োজন সাপেক্ষে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবীরা তাদেরকে সহায়তা করবে।

১৫. যাদেরকে হরতাল থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সেগুলো ছাড়া বাকি সব আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান হরতাল পালন করতে থাকবে।

১৬. গত সপ্তাহে যেগুলোকে হরতালের আওতামুক্ত করা হয়েছিলো, সেগুলো বলবৎ থাকবে।[১৪৫]

৯ মার্চের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করাতে ঢাকা হাইকোর্টের

১৪৫. দৈনিক সংগ্রাম, ৯ মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

প্রধান বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকীর অস্বীকৃতি। এ তারিখেই জেনারেল টিক্কা খান 'খ' অঞ্চল অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের মার্শাল-ল' এডমিনিষ্ট্রেটর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ তারিখ থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর হিসেবেও তার দায়িত্ব গ্রহণের কথা। কিন্তু সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়, ঢাকা হাইকোর্টে হরতালের দরুন কোনো বিচারপতি পূর্ব পাকিস্তানের নবনিযুক্ত সামরিক গবর্নরের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে সম্মত হচ্ছেন না।[১৪৬] মার্চের ৯ তারিখে পল্টন ময়দানে মাওলানা ভাসানীর জনসভা অনুষ্ঠিত হলো। এ জনসভায় আতাউর রহমান খানও বক্তৃতা করলেন। ন্যাপ প্রধান মাওলানা ভাসানী তাঁর বক্তৃতায় বললেন, "সাত কোটি বাঙ্গালীর মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। পূর্ব বাংলাকে একটি পৃথক রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমেই দেশের দু অঞ্চলের তিক্ততার অবসান হতে পারে। সংহতি এখন অতীতের স্মৃতি এবং কোনো শক্তিই এখন বাংলার পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে বাঁচার অধিকারকে নস্যাত করতে পারবে না। দুই পাকিস্তান হলে সৌহার্দ বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসায় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উন্নতি হবে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সাথে কেউ আপোস করতে পারে না। আপোসের দিন শেষ হয়ে গেছে। ইয়াহিয়া ঢাকায় এলে মুজিব তাঁর সাথে বাঙ্গালীর দাবী নিয়ে আপোস করতে যেতে পারে না। শেখ মুজিব বঙ্গবুন্ধ বা যে বন্ধুই হোক না কেন আপোস করতে গেলে পিঠের চামড়া খুলে ফেলবো। ...... আমি ৩১টি সমিতির সভাপতি ছিলাম, তার একটি সমিতির সেক্রেটারী ছিলো শেখ মুজিব। শেখ আমার ছেলের মতো। আমি তাকে হাতে খড়ি দিয়ে রাজনীতি শিখিয়েছি। তাকে আপনারা অবিশ্বাস করবেন না। .... জনাব ভুট্টোর পরিষদ বর্জনের হুমকি নজীরবিহীন ঘটনা। আযাদী পূর্বকালে ভারতীয় পার্লামেন্টে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পার্লামেন্টে যোগ দেবে না এরূপ কথা বলেনি। আইন পাসের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল পরিষদে বাধাদান করেছে, যুক্তিতর্ক, ন্যায়বিচার ও ইনসাফের দোহাই দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে বুঝাবার চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত ওয়াক আউট করেছে। ভুট্টোর উচিত ছিলো সেই গণতন্ত্রের পথ অনুসরণ করা।"[১৪৭] জনাব আতাউর রহমান খান তাঁর বক্তৃতায় কালবিলম্ব না করে জাতীয় সরকার ঘোষণা করার জন্যে শেখ মুজিবের কাছে দাবী জানান। তিনি বলেন, 'ভানুমতির খেলা শুরু হয়েছে।

---

১৪৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ মার্চ, ১৯৭১

১৪৭. দৈনিক পাকিস্তান ও দৈনিক সংগ্রাম, ১০ মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

চারদিকে ষড়যন্ত্রের জাল ফেলা হয়েছে। এ ষড়যন্ত্রের জাল ভেদ করতে হবে। কাজেই আপনি পরিষদের কথা ভুলে যান এবং জাতীয় সরকার ঘোষণা করুন।'[১৪৮] মাওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান প্রমুখের এ চাপ নির্বাচনের আগে থেকে শুরু হয়েছিলো। কিন্তু আওয়ামী লীগের ছাত্র ও যুব অংশের সাথে এদের কথাবার্তার লক্ষ্যণীয় পার্থক্য বর্তমান। ৯ মার্চ আরেকটা বিবৃতি প্রকাশ পায় তা অধ্যাপক গোলাম আযমের। তিনি তাঁর আগের দাবীর পুনরাবৃত্তি করে বলেন, "অধিবেশনের পুনঃ আহ্বান স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা মোটেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষে অনুকূল নয়। যদি ২৩ বছর যাবত শাসনতন্ত্র ছাড়াই দেশকে পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে থাকে, তবে আমাদেরকে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করা উচিত। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অজুহাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করার কোনো যুক্তি নেই। .... বর্তমানে শেখ মুজিবুর রহমানই কার্যত দেশের প্রশাসক এবং সরকারী কর্মচারী সহ সকলেই একমাত্র তাঁর নির্দেশই পালন করছে। আমি অতিসত্বর সামরিক আইন প্রত্যাহার ও গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্যে আমার পূর্ব দাবীর পুনরুল্লেখ করছি।'[১৪৯] জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এসব বক্তৃতা-বিবৃতির পাশাপাশি জাতীয় পত্র-পত্রিকাও এদিন তাদের মত প্রকাশ করে। আওয়ামীলীগপন্থী ইংরেজী দৈনিক 'দি পিপল' লিখলো ঃ 'In view of the Latest offer of Shaikh Mujib, however, a solution of the unfortunate crisis may be possible, if this is considered with an unbiased mind.[১৫০] অর্থাৎ শেখ মুজিবের সর্বশেষ প্রস্তাবের আলোকে উদ্ভূত দুর্ভাগ্যজনক সংকটের সমাধান সম্ভব যদি তা পক্ষপাতহীন মন নিয়ে বিবেচনা করা হয়। দৈনিক পাকিস্তান (আজকের দৈনিক বাংলা) বললো, "লঘিষ্ঠ দলের নেতা ভুট্টো সাহেবের জেদাজেদিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার ফলে পরিস্থিতি কতদূর গড়াইয়াছে, সে সম্পর্কে সরকার নিশ্চয়ই অবহিত। সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতেই প্রকাশ, সারা পূর্ব বাংলায় সপ্তাহব্যাপী গোলযোগে ১৭২ ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছেন, আহত হইয়াছেন ৩৫৮জন। যথাসময়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইলে এতগুলি অমূল্য প্রাণ বিনষ্ট হইত না। কাজেই আমরা

---

১৪৮. দৈনিক পাকিস্তান, ১০ মার্চ, ১৯৭১

১৪৯. দৈনিক সংগ্রাম, ১০ মার্চ, ১৯৭১

১৫০. 'The People'; ১০ মার্চ, ১৯৭১, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৭২৭

www.bjilibrary.com

আশা করি, সরকার স্পষ্ট এবং পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নিয়া জনপ্রতিনিধিদের নিকট অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করিবেন।"[১৫১] দৈনিক সংগ্রাম লিখলো ঃ "দেশের এই চরম অনিশ্চয়তা ও সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষই দাবী করছে, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত। শেখ সাহেবকে জাতীয় নেতা হিসেবে মেনে নিতে আর কোনো গড়িমসিই হওয়া উচিত নয়। যদি তা না হয় এবং এ অনিশ্চয়তার দ্রুত অবসান না ঘটে, তবে তা আর এক অনিশ্চয়তা আর এক সংকটই ডেকে আনবে।"[১৫২]

দশই মার্চ শেখ মুজিব পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিলেন। বিবৃতিটি ছিলো সংকটের সমাধানের দিকে না গিয়ে সামরিক সরকার কর্তৃক পূর্বপাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং পূর্ব পাকিস্তানস্থ জাতিসংঘ দফতর থেকে লোক সরিয়ে নেয়া বিষয়ে। তিনি বললেন, 'জনগণের ইচ্ছাই বাংলাদেশের প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। সেক্রেটারিয়েট, সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, কোর্ট, রেলওয়ে, বন্দরসহ সরকারের প্রতিটি শাখাই বাংলাদেশের জনগণের নামে আমাদের জারিকৃত নির্দেশাবলীই মেনে চলছে। যারা মনে করছে শক্তির বলে আমাদের উপর তাদের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেবে, তাদের স্বরূপ বিশ্বের সামনে উদঘাটিত হয়ে গেছে। বিশ্ব জনমত ও পশ্চিম পাকিস্তানের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেও তারা নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের উপর শক্তির নৃশংস প্রয়োগের যৌক্তিকতা বুঝাতে ব্যর্থ হয়েছে। তা সত্ত্বেও হঠকারী গণবিরোধী শক্তি তাদের বেপরোয়া কর্মপদ্ধতিতেই জিদ ধরে রয়েছেন। সমরসজ্জা অব্যাহত রয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রতিদিনই অস্ত্র শস্ত্র ও সৈন্য আনা হচ্ছে। ...... আজ জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট এখানে অবস্থানরত জাতিসংঘ কর্মচারীদের অপসারণের অনুমতি দিয়ে বাংলাদেশে সামরিক শক্তি জানমালের প্রতি যে হুমকির সৃষ্টি করেছে তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে তাঁর অনুভব করা উচিত যে, শুধু জাতিসংঘের কর্মচারীদের অপসারণ করেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। .... বাংলাদেশের মানুষ মুক্তি অর্জন ও স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য শেষ অবধি সংগ্রাম এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।'[১৫৩] এ ১১ মার্চ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান

---

১৫১. দৈনিক পাকিস্তান, ১০ মার্চ, ১৯৭১, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭২৮

১৫২. দৈনিক সংগ্রাম, ১০ মার্চ, ১৯৭১

১৫৩. দৈনিক সংগ্রাম, ১১ মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব তাজউদ্দীন ব্যাংক ও অর্থনৈকি প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখার জন্য অনেকগুলো নির্দেশ জারি করেন। লোকজনদের ব্যাংক থেকে প্রতি সপ্তাহে ব্যক্তিগতভাবে ১ হাজার এবং প্রতিষ্ঠানগতভাবে ১০ হাজার টাকা তোলার অধিকার দেয়া হয়।[১৫৪] মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন এই তারিখে 'পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর, পৃথক রাষ্ট্র গঠন কর' শ্লোগানসর্বস্ব একটা প্রচারপত্র বিলি করে। প্রচার পত্রটিতে স্বাধীন পূর্ব বাংলা গঠনের আহ্বান জানিয়ে পরিশেষে বলা হয়, 'বর্তমান গণ সংগ্রামের পটভূমিতে ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক আহূত জাতীয় পরিষদে অংশগ্রহণের প্রশ্ন বিবেচনার পূর্বশর্ত হিসেবে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বর্তমানে ৪টি দাবী উত্থাপন করিতেছেন। এই দাবী হইল, সামরিক শাসন প্রত্যাহার কর, শাসন ক্ষমতা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে অর্পণ কর, সেনাবাহিনী ব্যারাকে লও, গণহত্যার তদন্ত চাই। বর্তমান গণঅভ্যুত্থানকে অগ্রসর করিয়া লওয়ার স্বার্থেই ২৫ মার্চের মধ্যে এই সকল দাবী পূরণের জন্যে গণসংগ্রাম অব্যাহত রাখুন, সরকারের প্রতি অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখুন, ইয়াহিয়া সরকারকে দাবী মানিতে বাধ্য করুন।'[১৫৫] পূর্ব পাকিস্তানের অনেকগুলো ছোট ছোট সংস্থা সংগঠনের বিবৃতি এই দিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো। তারা সকলেই শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবী করলো। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'প্রেসিডেন্টের একমাত্র উপায় শেখ মুজিবের দাবী পূরণ করা।'[১৫৬]

১১ মার্চ পিপলস পার্টি প্রধান ভুট্টো করাচী থেকে শেখ মুজিবের কাছে একটি দীর্ঘ টেলিগ্রাম পাঠালেন। টেলিগ্রামে ভুট্টো বললেন, "দেশের ঘটনাবলী সম্প্রতি যে দিকে মোড় নিয়েছে সেজন্যে আমি দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করছি। দেশের এ সংকটে যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের জন্যে আমি ব্যথিত। তাদের শোকে বিহ্বল পরিবার বর্গের প্রতি আমি সমবেদনা জানাচ্ছি। আমরা পাকিস্তানের জন্যে একটি নয়া সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সে সমাজ এমন হবে যেখানে মানুষের উপর মানুষের শোষণ এবং অঞ্চলের উপর অঞ্চলের শোষণ থাকবে না। শুধুমাত্র শাসনতন্ত্রের মাধ্যমেই আসুন সকল পাকিস্তানীই এজন্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাই।

১৫৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৩০-৭৩১
১৫৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৩৩-৭৩৪
১৫৬. দৈনিক সংগ্রাম, ১১ মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

আমরা সকলেই বিরাট সংকটের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। দেশের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আমাদের উভয়েরই বিরাট দায়িত্ব রয়েছে এবং যে সংকট আমাদের সামনে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা নিরসনের জন্যে মানুষ হিসেবে যতটুকু সম্ভব সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। .... বর্তমানে যে দুর্ভাগ্যজনক সংকটের উদ্ভব ঘটেছে, তাতে আমার এ উপলব্ধি জন্মেছে যে, আমরা এমন একটি স্তরে এসে দাঁড়িয়েছি, যখন পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য পাকিস্তানের দুই অংশকে অনতিবিলম্বে একটি সাধারণ সমঝোতায় অবশ্যই পৌঁছাতে হবে। দেশকে রক্ষা করতেই হবে এবং যে কোনো মূল্যেই রক্ষা করতে হবে। .... আমি শীঘ্রই ঢাকা গিয়ে আপনার সাথে দেখা করতে প্রস্তুত। দেশ বর্তমানে যে সংকটের সম্মুখীন হয়েছে, তা নিরসনের জন্যে একটি সাধারণ সমাধান বের করতে আমি প্রস্তুত আছি যাতে করে জাতীয় পরিষদ শাসনতন্ত্র রচনার জন্য কাজ চালিয়ে যেতে পারে। আমরা এসব সমস্যা নিরসনে ব্যর্থ হয়েছি জনগণ যেন এমন কথা বলতে না পারে এবং ভবিষ্যতেও ইতিহাস যেনো এমন কথা লিখতে না পারে।"[১৫৭] কিন্তু সংবাদ সংস্থা পিপিআই-এর খবরে বলা হলো, ১১ মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্তও শেখ মুজিব ভুট্টোর কোনো টেলিগ্রাম পাননি।

১২ মার্চ ঢাকার দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা বৃটেনের 'লণ্ডন টাইমস'-এ প্রকাশিত পিপলস পার্টি প্রদত্ত একটি বিজ্ঞাপনের ফটোকপি ছাপে। ফটো কপির সাথে প্রকাশিত রিপোর্টে দৈনিক সংগ্রাম লিখে, 'সমগ্র দেশ এক চরম অনিশ্চয়তায় নিক্ষিপ্ত হলেও ভুট্টো সাহেবদের ষড়যন্ত্রের শেষ হয়নি। বাংলাদেশে, শুধু বাংলাদেশে কেন, সমগ্র দেশের অবিসংবাদিত ও বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতায় নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরে অহেতুক ঘৃণা বিদ্বেষ প্রচার করেই এরা ক্ষান্ত হয়নি, বরং এরা বিদেশেও এ কুৎসা প্রচারণার জাল বিস্তার করেছে। এজন্যে অত্যন্ত ব্যয়বহুল মাধ্যম বেছে নিয়েছে। লণ্ডনের বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী সংবাদপত্র 'টাইমস'-এর চতুর্থ পৃষ্ঠায় পাকিস্তান পিপলস পার্টির একটি ডবল কলাম বিজ্ঞাপনে শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে যে কুৎসা প্রচার করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গর্হিত। উক্ত বিজ্ঞাপনে বলা হয় ঃ 'আওয়ামী লীগের এমন অনেক যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন যারা পাকিস্তান পিপলস পার্টির সাথে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের অধিকাংশের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি

---

১৫৭. দৈনিক সংগ্রাম, ১২ মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

সম্মানজনক শাসনতান্ত্রিক সমঝোতার পক্ষপাতী। আওয়ামী লীগের উচিত নয় তাদের পথ রোধ করা এবং বৈপ্লবিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার সাধিত হতে দেয়া উচিত যা একমাত্র ঐক্যবদ্ধ জনগণই অর্জন করতে পারে।'[১৫৮] লণ্ডন টাইমস-এ প্রকাশিত পিপলস পার্টির এ ব্যয়বহুল বিজ্ঞাপনটি দেখে স্বভাবতই প্রশ্ন জেগেছে, বিদেশী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয়ার মতো বিদেশী মুদ্রা পিপলস পার্টি পাচ্ছে কোথা থেকে ? এ অর্থ কি তাহলে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে কোনো অদৃশ্য হস্ত পিপলস পার্টিকে যুগিয়ে যাচ্ছে ?"[১৫৯]

আওয়ামী লীগ নেতা কামারুজ্জামানেরও একটা বিবৃতি ১২ মার্চ তারিখে প্রকাশিত হয়। ঐ বিবৃতিতে তিনি আন্দোলনের বিবরণ ও ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন যে, 'বাংলাদেশকে শোষণমুক্ত করাই সংগ্রামের লক্ষ্য।'[১৬০]

জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, কিন্তু কোনোও পরিবর্তন আনতে পারলেন না। বোধহয় কিছু করার তাকিদেই তিনি ১৩ মার্চ এক সামরিক আদেশ বলে সামরিক বিভাগে কর্মরত বেসামরিক কর্মচারীদের ১৫ মার্চ যথারীতি কাজে যোগ দিতে নির্দেশ দেন। নির্দেশে এও বলা হয় যে, এর অন্যথা হলে অর্থাৎ কাজে যোগ না দিলে কেবল চাকুরী হতেই বরখাস্ত করা হবে না, উপরন্তু সামরিক আদালতের বিচারে সর্বোচ্চ দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হবে।[১৬১] কিন্তু সরকারী এ ঘোষণা মাটি পেল না, বরং আরও প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করলো। শেখ মুজিবুর রহমান ১৪ মার্চ আন্দোলনের কর্মসূচীর ৩৫টি নতুন বিধি ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, 'এ বড় দুঃখজনক যে, এমন পর্যায়েও কিছু অবিবেচক মানুষ সামরিক আইন বলে নির্দেশ জারি করে বেসামরিক কর্মচারীদের একাংশকে ভীতি

---

১৫৮. বিরাট বিজ্ঞাপনের অনূদিত অংশের মূল ইংরেজী টেক্সটি এই ঃ There are many capable person in Awami leageue who desire an honourable constitutional settement with the pakistan People's Party acceptable to the majority of the people on both the East and west Pakistan. Awami league leader should not stand in their way and let through the radical social and economic refarms-which only a united people can achieve. দৈনিক সংগ্রাম, ১২ মার্চ, ১৯৭১

১৫৯. দৈনিক সংগ্রাম, ১২ মার্চ, ১৯৭১

১৬০. দৈনিক সংগ্রাম, ১২ মার্চ, ১৯৭১

১৬১. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-৪৭৭

www.bjilibrary.com

প্রদর্শনের চেষ্টা করছে। কিন্তু আজ এদেশের মানুষ সামরিক আইনের কাছে মাথা নত না করার দৃঢ়তায় একাট্টা। আমি তাই, সর্বশেষ নির্দেশ যাদের প্রতি জারি করা হয়েছে, তাদেরকে হুমকির কাছে মাথানত না করার আবেদন জানাই। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাদের ও তাদের পরিবারের পেছনে রয়েছে। তাদের ত্রাসিত করার উদ্দেশ্যে এই যে চেষ্টা তা বাংলাদেশের মানুষকে রক্তচক্ষু দেখাবার অন্যান্য সাম্প্রতিক চেষ্টার মতো নস্যাত হতে বাধ্য।'[১৬২] তাই হলো। ১৫ মার্চ থেকে পরবর্তী দিবসগুলো বেসামরিক প্রশাসনতন্ত্র শেখ মুজিবের নির্দেশিত বিধি মুতাবেক দেশের প্রশাসন কার্য পরিচালনা করতে থাকে।[১৬৩] পূর্ব পাক জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের একটি বিবৃতি ১৩ তারিখে প্রকাশিত হলো। এ বিবৃতিতে তিনি বললেন, "সামরিক সরকারের একথা বুঝা উচিত যে, বুলেট ও বেয়নেট দ্বারা দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষা করা যায় না। সামরিক সরকার দুষ্কৃতকারীদের কবল থেকে নিরীহ জনগণের জানমালের হেফাজত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে এবং জাগ্রত জনতার সাড়া প্রদানের ফলে প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা মোটামুটি বহাল হয়েছে এবং এটা অকাট্যরূপে প্রমাণিত করছে যে, জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরই সমস্যা-সমাধানের একামাত্র পন্থা।" অধ্যাপক আযম প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'ইতিমধ্যেই যে দুঃখজনক রক্তপাত হয়ে গেল, স্থায়ীভাবে এর অবসান করুন। শক্তি প্রয়োগ ও রক্তপাতের পথ পরিহার করার একমাত্র উপায়ই হলো অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও ক্ষমতা হস্তান্তর।'[১৬৪] ১৩ মার্চ তারিখেই লাহোরে পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর, যাদের জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্ব আছে, একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে শেখ মুজিবের জাতীয় পরিষদে যোগদানের চার দফা শর্ত মেনে নেন এবং তাঁরা দাবী জানান যে, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠকের আগেই কেন্দ্র এবং প্রদেশগুলোতে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হোক। এ মিটিং-এ হাজির ছিলেন জামায়াতে ইসলামী পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা অধ্যাপক গফুর আহমদ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা মুফতি মাহমুদ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির মিয়া মমতাজ

১৬২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিল পত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৭৩৮
১৬৩. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা–৪৭৭
১৬৪. দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

দৌলতানা ও সরদার শওকত হায়াত খান, জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান-এর পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা মাওলানা শাহ্ আহমদ নূরানী, কনভেনশন মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির জামাল মুহাম্মাদ কারেজা এবং মাওলানা জাফর আহমদ আনসারী ও সরদার মওলা বক্স সামরু সহ জাতীয় পরিষদের স্বতন্ত্র সদস্যগণ। ন্যাপের ওয়ালী খান বৈঠকে হাজির থাকতে পারেননি ; কিন্তু সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল। পিপলস পার্টির বাইরে একমাত্র কাউয়ুম মুসলিম লীগই এ সিদ্ধান্তের সাথে ছিলো না। ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যে একটি প্রতিনিধি দল প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত বৈঠকে হলো। বৈঠক শেখ মুজিবের সাথে দেখা করারও সিদ্ধান্ত নিলো। বলা হলো, ভুট্টোর সাথেও প্রতিনিধি দল দেখা করতে পারে।[১৬৫]

১১ মার্চ ভুট্টো শেখ মুজিবের কাছে টেলিগ্রাম পাঠান। তাতে তিনি শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার কথা বলেন, সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনার কথা বলেন এবং তাঁর ঢাকা আসার আগ্রহের কথা জানান। কিন্তু ১৪ মার্চ তারিখেই তিনি করাচীর এক জনসভায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরামর্শ দিলেন।[১৬৬] পরদিন করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর এ বক্তব্য আরও পরিষ্কার করতে গিয়ে বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানকে প্রতিনিধিত্বকারী পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পিপলস পার্টিকে উপেক্ষা করে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন বর্তমান সংকটের সমাধান হতে পারে না। তাঁর দল চায়, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যদি ক্ষমতা হস্তান্তর হয়, তাহলে সে ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানে সেখানকার

---

১৬৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৭৩৬ ঃ বৈঠকের পর সংবাদপত্রের জন্যে যে বিবৃতি দেয়া হয়, তার একাংশে বলা হয় ঃ "So that we can effectively convey the soliedrity of the people of West Pakistan with their brothers and fellow citizens in East Pakistan, as well as express our deepest concern abpout the urgency of immediately resolving the present crisis and discuss our views with respect the ways and means of doig so, we request the president of Pakistan to grrant and immediate interview to a delegation of the parties and MNA'S represented in this meeting, For the same purpose we propose that a similar delegation should, procedd to Dacca and meet Shaikh Mujibar Rahman.

we call upon the people of west Pakistan to express, by all democrtic means their commitment to the integral soliderity of Pakistan and their consecrated sense of comradeship and identity with their blood brothers in faith and destiny, namely the people of East Pakistan.

১৬৬. দৈনিক পাকিস্তান (আজকের দৈনিক বাংলা) ১৫ মার্চ, ১৯৭১

৭—

www.bjilibrary.com

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে হতে হবে। আমাদের মত এই যে, গণতান্ত্রিক বিধি মতে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মিলিতভাবেই শুধু দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ যদি পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলোকে কেন্দ্রে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে নেয়, তাহলে তাঁর প্রতিক্রিয়া কি হবে। উত্তরে ভুট্টো বলেন, তাঁর দল পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং তাঁর দলকে বাইরে রাখার অর্থ হলো পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু মানুষের মতামতকে উপেক্ষা করা। এ সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো আরও ঘোষণা করলেন, পাকিস্তানের দু অংশের ভৌগলিক দূরত্বের কারণে 'সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন তত্ত্ব' এখানে চলতে পারে না। আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে অবশ্যই পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ইচ্ছার কথা বিবেচনা করতে হবে।'[১৬৭]

ভুট্টো এখানে তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান ভিত্তিক সংখ্যা গরিষ্ঠতার তত্ত্বকে বাতিল করলেন যা একক একটি দেশের জন্যে অপরিহার্য। কার্যত ভুট্টো এখানে দেশকে দুই ভাগে ভাগ করে দুই প্রধানমন্ত্রী ও দুই পার্লামেন্টের কথাই বললেন। ভুটো যে কথা পরিষ্কারভাবে বলতে চাইলেন তাহলো, শেখ মুজিবের দল আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে কি হবে সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছে তাই তাদের হাতে ক্ষমতা দেয়া যাবে না। জনাব ভুট্টোর এ বক্তব্য, এ মানসিকতা শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। পশ্চিম পাকিস্তানের বাহওয়ালপুর থেকে নির্বাচিত এম. এন. এ মিয়া নিজামুদ্দিন হায়দার ভুট্টোর 'দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল' ঘোষণাকে পাকিস্তানের জন্য দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভাবন বলে অভিহিত করেন। তিনি বললেন, দায়িত্বহীন ভুট্টো দুই শাসনতন্ত্র দুই সরকার এবং দুই দেশ চায়।' রাওয়ালপিণ্ডি কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট খাজা মাহমুদ মান্টু বললেন, ভুট্টো জাতীয় সংহতির বিনিময়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চান।' রাওয়ালপিণ্ডি কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট আলী আসগর শাহ অনুরূপ উক্তি করে বললেন, 'ভুট্টো ক্ষমতায় যাওয়া ছাড়া অন্য কিছু চিন্তাই করতে পারছেন না।' করাচীর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা সেখানে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে

১৬৭. The dawn, 16th March, 1971 এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৪৭-৭৪৮

www.bjilibrary.com

ভুট্টোর 'দুই পাকিস্তান তত্ত্বকে' দূরভিসন্ধিমূলক বলে অভিহিত করলেন। ভুট্টোর পিপলস পার্টির এম. পি. ও এম. এন. এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য দলের সব এম. পি. ও এম. এন. এ'রা ভুট্টোর বক্তব্যকে শক্রতা ও প্ররোচনামূলক বলে অভিহিত করেন। জামায়াতে ইসলামী পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা অধ্যাপক গফুর আহমদ বললেন, ভুট্টো শুধুমাত্র তাঁর ক্ষমতায় যাওয়ার স্বার্থে দেশকে দুই ভাগে ভাগ করতে চান।' পাঞ্জাব জোনের কাউন্সিল মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী খাজা মুহাম্মদ সফদার ভুট্টোকে দেশের চলমান রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি এবং দেশকে ধ্বংসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করাবার দায়ে অভিযুক্ত করলেন। রাওয়ালপিণ্ডি বিভাগের জামায়াত প্রধান মাওলানা ফতেহ মুহাম্মদ খান ভুট্টোর কথাবার্তাকে স্ববিরোধীর ঝুলি বলে আখ্যায়িত করেন। ইয়ার মার্শাল আসগর খান বলেন, পাকিস্তানের দুই অংশে দুই মেজরিটি পার্টির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ভুট্টোর দাবী অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তিনি বললেন, রাজ নৈতিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান বলে কোনো জিনিস নেই। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ কয়েকটি প্রদেশের সমাহার। আসগর খান মন্তব্য করেন, শেখ মুজিবই প্রকৃতপক্ষে দেশকে এক রাখার চেষ্টা করছেন। পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান ভুট্টোর প্রস্তাবকে গণতান্ত্রিক আচরণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেন। পূর্ব পাক জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বললেন, 'ভুট্টো তাঁর দূরভিসন্ধি চরিতার্থের জন্যে নির্বাচনের পর থেকেই দেশকে ভাগ করার ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন। দেশকে এ সংকট থেকে মুক্ত করার জন্যে প্রেসিডেন্টের উচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।' নেজামে ইসলাম ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম-এর জেনারেল সেক্রেটারী মাওলানা সিদ্দিক আহমদ বলেন, 'ভুট্টোর ভয়ংকর ভূমিকা দেশে আজ একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে। দেশকে দ্বিখণ্ডিত করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ভুট্টোর বিচার হওয়া উচিত।' নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ মাহমুদ বললেন, পাঞ্জাবের মানুষকে ঠিক করতে হবে তারা এক পাকিস্তান, না দুই পাকিস্তান চায়, যখন তাদের নেতা দুই পাকিস্তানের শ্লোগান তুলেছে। পাঞ্জাবের লোকরাই তাকে নেতা বানিয়েছে, সুতরাং তাদের দায়িত্ব নেতৃত্ব তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া। ভুট্টো এবং কাইয়ুম খানই আজ জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা।' আওয়ামী লীগের সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট করাচীতে বললেন, ভুট্টোর কথাগুলো সত্য-মিথ্যার এক বিরাট

www.bjilibrary.com

স্তূপ।' পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব সাইয়েদ খলিল আহমাদ তিরমিজি এবং করাচী সিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি জনগণকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, ভুট্টো দেশকে দুই ভাগে ভাগ করতে চান।[১৬৮]

ভুট্টোর পিপলস পার্টি এবং কাইয়ুম খানের মুসলিম লীগ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের সব রাজনৈতিক নেতা এবং নির্বাচিত এম. পি ও এম. এন. এ রা এক বাক্যে ভুট্টোর বিরোধিতা করলেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বললেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে এ বিষয়টি বুঝিয়ে তাদেরকে সোচ্চার করার ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যর্থ হলেন। বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভুট্টোর অবস্থানটা কিছু দুর্বল হলেও পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর এ পাঞ্জাব ও সিন্ধুই ছিলো ইয়াহিয়ার ভাষায় 'ক্ষমতার দুর্গ'। সুতরাং ভুট্টোর বিরুদ্ধে উত্থিত প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়া কোনো ফল দিতে সেখানে ব্যর্থ হলো। যেন ইয়াহিয়ার কান পর্যন্তও তা পৌঁছাল না।

১৪ মার্চ ঢাকায় আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটল। ঢাকার দৈনিক সংবাদপত্রগুলো তাদের প্রথম পাতায় একযোগে একই সম্পাদকীয় প্রকাশ করলো। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব যখন জাতীয় পরিষদে যোগদানের জন্যে চারটি শর্ত আরোপ করেছে, ভুট্টো যখন পাকিস্তানের দুই অংশে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বলছে, ইয়াহিয়া যখন তাঁর 'আইন কাঠামো'র কংকাল নিয়ে বসে আছেন এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ও শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ভবিষ্যত যখন অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন জাতীয় সংবাদপত্রগুলো একযোগে একটা অভিমত প্রকাশ করা নিসন্দেহে একটা ঐতিহাসিক মূল্য বহন করে। 'আর সময় নেই' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে পত্রিকাগুলো বললো ঃ "আমরা ঢাকার সংবাদপত্রসমূহ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন এসেছে এবং এ মুহূর্তে এক বাক্যে এক সুরে কয়েকটি কথা বলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তেইশ বছরের ইতিহাসে জাতি আজ চরমতম সংকটে নিপতিত। দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক জীবন পদ্ধতি কায়েমের আশায় সমগ্র দেশ জীবনের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচনে শরীক হওয়ার পর দেশের আজ এ অবস্থা।

---

১৬৮. ভুট্টোর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত উদ্ধৃতিগুলো জনাব মওদুদ আহমদের 'Bangladesh cnstitutional Quest For Autonomy Page-235-237 এবং 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৪৯-৭৫২ এবং ৭৫৩ গ্রন্থদ্বয় থেকে গৃহীত।

www.bjilibrary.com

জনগণই দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ; দেশের প্রশাসনিক কাঠামো কি হবে, কি ধরনের সরকারই বা কায়েম হবে, তা নির্ধারণের ক্ষমতার অধিকারী কেবল তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই। গণতন্ত্রে যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে দেশের আইন কানুন প্রণয়ন বা রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে জনগণের প্রতিনিধিদের এ অধিকার কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এটি একটি মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিপাদ্যও বটে। ক্ষমতায় আজ যারা সমাসীন আর ক্ষমতাসীনদের সাথে কানাকানি করার সুযোগ যাদের আছে, তাদের ব্যর্থতাই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির এ অবনতির কারণ। বহিরাক্রমণ থেকে দেশের সীমান্ত রক্ষাই হলো সামরিক বাহিনীর কাজ। রাজনৈতিক বিতর্কে হস্তক্ষেপ বা পক্ষ সমর্থন করা তাদের কোনো দায়িত্বের আওতায় আসে না।

জনগণের সংগ্রাম যাতে অহিংস পথেই পরিচালিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের হস্ত শক্তিশালী করাই আজ প্রয়োজন। দেশের দু অংশের মধ্যে ভবিষ্যত সম্পর্ক কি হবে, তা নির্ধারণের দায়িত্ব দেশবাসী জনসাধারণ ও তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের। আমরা মনে করি, আজ সময় এসেছে যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে রাজনৈতিক জীবনের এ বাস্তব সত্যগুলো স্বীকার করে নিতে হবে। আমাদের বিচারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উচিত দেশের বুক থেকে সামরিক আইন তুলে নিয়ে অবিলম্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়া যার ফলশ্রুতিতে জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়।[১৬৯]

জাতীয় সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে জাতির অভিমত প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন মতের পত্রিকাগুলোর সম্মিলিত এ অভিমতকে তাই জাতীয় ঐকমত্য বলে অভিহিত করা যায়। দৈনিক পত্রিকাগুলো একক এ সম্পাদকীয় সম্পর্কে সরকারের কোনো প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। তবে সাংবাদিকরা শেখ সাহেবের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গিয়ে তিনি বলেন, 'দয়া করে অপেক্ষা করুন ও দেখতে থাকুন। আমি একটি সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি। যতক্ষণ পর্যন্ত না জনগণের অধিকার আদায় করতে পারি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাস করতে না পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলার জনগণ মুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে।'[১৭০]

১৬৯. দৈনিক সংগ্রাম, ১৪ মার্চ, ১৯৭১
১৭০. দৈনিক সংগ্রাম, ১৫ মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

এ সময় পর্দার অন্তরালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঢাকা আগমনের প্রস্তুতি চলছিল। ঢাকার পথে তিনি ১২ মার্চ করাচী এসে পৌছেছিলেন। তিনি আসছেন একথা সম্ভবত শেখ মুজিবকে জানানোও হয়েছিলো। ১৪ মার্চ তিনি সাংবাদিকদের জানালেন, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলে তিনি তাঁর সাথে আলোচনা করতে প্রস্তুত রয়েছেন।'[১৭১]

পাঁচ

প্রেসিডেন্ট ১৫ মার্চ ঢাকা এলেন। ১৬ মার্চ বেলা ১১টায় প্রেসিডেন্ট ভবনে মুজিব-ইয়াহিয়ার মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠক চললো আড়াই ঘণ্টা। মুজিব প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রবেশ করেন বেলা ১১টায়, বেরিয়ে এলেন দেড়টায়। দেশী-বিদেশী সাংবাদিকরা তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে ছিলো প্রেসিডেন্ট ভবনের গেটে। শেখ মুজিবের গাড়ী গেটে আসতেই সাংবাদিকরা তাঁর গাড়ী ঘিরে ধরলেন। মুজিব বেরিয়ে এলেন গাড়ী থেকে স্মিত হাস্যে। প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা সম্পর্কে একজন সাংবাদিকের এক প্রশ্নে জবাবে তিনি বললেন, 'দেশের রাজনৈতিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁর আলোচনা হয়েছে।' আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন, আলোচনা এখনো শেষ হয়নি। মেহেরবানী করে এর বেশী কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। এটা দু এক মিনিটের ব্যাপার নয়। এজন্য পর্যাপ্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে।[১৭২]

প্রথম দিনের আড়াই ঘণ্টার এ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের মধ্যে কোনো সহকারী ছাড়াই একান্তে অনুষ্ঠিত হয়।[১৭৩] সম্ভবত আলোচনার সুপরিবেশ সৃষ্টির জন্যে সেনাবাহিনীকেও ব্যারাকে ফিরিয়ে আনা হয়। এছাড়া সামরিক বাহিনী তলব সম্পর্কে তদন্তের জন্যে যে শর্ত আরোপ করা হয় শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে, তাও পূরণের জন্যে ১৭ মার্চ ঢাকার সামরিক আইন প্রশাসক একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। আর ১৭ মার্চ বিবিসি তার এক সংবাদ বুলেটিনে প্রচার করলো, ক্ষমতা হস্তান্তরের শাসনতান্ত্রিক ও আইনগত দিক সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্যে বিচারপতি কর্নেলিয়াস ঢাকা

---

১৭১. দৈনিক সংগ্রাম, ১৫ মার্চ, ১৯৭১

১৭২. দৈনিক সংগ্রাম, ১৭ মার্চ, ১৯৭১

১৭৩. The People ১৭ মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

এসেছেন।[১৭৪] এ দিনই সকালে মাওলানা ভাসানী চট্টগ্রামে বললেন, শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এ ধরনের ঘোষণা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে কোনোরূপ মতানৈক্য থাকতে পারে না। .... প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিবের মধ্যে আপোসের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।[১৭৫]

১৭ মার্চ বেলা ১০টা ৫ মিনিট থেকে ১১টা ৭ মিনিট পর্যন্ত ইয়াহিয়া-শেখ মুজিব দ্বিতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ দিনও বৈঠক উভয়ের মধ্যে একাই অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে বেরিয়ে এসে শেখ মুজিব অপেক্ষমান সাংবাদিকদের বলেন, 'আলোচনা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং আমাদের মধ্যে আরও আলোচনা হতে পারে। তবে সময় নির্ধারিত হয়নি।' আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে দেশী-বিদেশী সাংবাদিক অনেক প্রশ্ন করেন। উত্তরে শেখ মুজিব বিমর্ষ চিত্তে বলেন, 'আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, আমার কিছু বলার নেই।' পরে বাড়ীতে পৌঁছে সাংবাদিকদের তিনি ঘরোয়াভাবে সাক্ষাত দান করেন। সেখানে আলোচনা ভেংগে গেছে কিনা এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'না, আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।'[১৭৬] ১৬ মার্চ বিকেলে শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনের সামনে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, 'জনগণ সত্য ও ইনসাফের জন্যে সংগ্রাম করছে এবং তাদের দাবীর প্রশ্নে কোনো আপোস হতে পারে না।'[১৭৭]

এ দাবীর জনপ্রিয়তা পশ্চিম পাকিস্তানেও বাড়ছিলো। পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ কিছু সংস্থা-সংগঠন কর্তৃক শেখ মুজিবের ৪ দফা শর্তের প্রতি সমর্থন দানের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ওয়ালী খান এদিন প্রেসিডেন্টের সাথে ৭৫ মিনিট ধরে আলোচনা করেন। ১৭ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের একজন রাজনীতিক পূর্ব পাক জামায়াতে ইসলামীর প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম এক বিবৃতিতে বললেন, 'আমি পরিস্থিতি অনুধাবন করা এবং যে দলের প্রতি জনগণ পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছে, সে দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাজ সমাপ্ত করার জন্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। কোনো শাসনতান্ত্রিক সমস্যাই ক্ষমতা হস্তান্তরকে বিলম্বিত করতে পারবে না। জনগণের সরকারের চেয়ে কেউই জাতির উত্তম সেবা করতে পারে না। ....

---

১৭৪. দৈনিক সংগ্রাম, ১৮ মার্চ, ১৯৭১
১৭৫. দৈনিক পূর্বদেশ, ১৮ মার্চ, ১৯৭১
১৭৬. দৈনিক পূর্বদেশ, ১৮ মার্চ, ১৯৭১
১৭৭. দৈনিক সংগ্রাম, ১৮ মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

জনাব ভুট্টোর অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রয়াসের প্রতি প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।'[১৭৮]

১৮ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের মধ্যে কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। এদিন শেখ মুজিবের একটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তিনি ঐ বিবৃতিতে সামরিক বাহিনী তলব করা সংক্রান্ত বিষয় তদন্তের জন্যে সামরিক সরকার কর্তৃক গঠিত কমিশন প্রত্যাখ্যান করে এ কমিশনকে কোনো প্রকার সহযোগিতা না করার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বিবৃতিতে বললেন, তথাকথিত কমিশন নিয়োগের যে ঘোষণা করা হয়েছে, তা বাংলাদেশের তরফ থেকে উত্থাপিত দাবীকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। সামরিক আইন আদেশের মাধ্যমে এর গঠন এবং সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে এর রিপোর্ট পেশের বিধানও অত্যন্ত আপত্তিকর। তাছাড়া কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়াবলীতেও সর্বাপেক্ষা মৌলিক প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।'[১৭৯] এই সাথে শেখ মুজিব কি পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক গুলী বর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল তা সরেজমিনে তদন্ত করে রিপোর্ট করার জন্যে খন্দকার মুশতাক আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং মিঃ আবিদুর রেজা খানকে চট্টগ্রামে পাঠালেন।'[১৮০] ১৮ মার্চ করাচীতে মিঃ ভুট্টো উচ্চপর্যায়ের দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার পর সাংবাদিকদের জানালেন, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে আলোচনার জন্যে ঢাকা সফরের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা তিনি রক্ষা করতে পারছেন না। তিনি কতিপয় বিষয়ের ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত ঢাকা থেকে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায় আগামীকাল তিনি যদি ঢাকা যান, তবে তাতে কোনো লাভ হবে বলে তিনি মনে করেন না।'[১৮১]

১৯ মার্চ সকাল দশটায় ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের মধ্যে তৃতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকটি প্রেসিডেন্ট ভবনে রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। দেড় ঘণ্টা স্থায়ী বৈঠকে ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের সাথে এদিনও কোনো সহকারী ছিলো না। আলোচনার পর বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে শেখ মুজিব বলেন, 'প্রেসিডেন্টের সাথে তিনি রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।' আলোচনার সাফল্য সম্পর্কে একজন বিদেশী

---

১৭৮. দৈনিক সংগ্রাম, ১৮ মার্চ, ১৯৭১
১৭৯. দৈনিক সংগ্রাম, ১৯ মার্চ, ১৯৭১
১৮০. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৭৬৪
১৮১. দৈনিক সংগ্রাম, ১৯ মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন, 'এটা খুব সাধারণ ব্যাপার নয়, এর জন্যে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন।' প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনায় কোনো লিখিত দলিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা প্রশ্ন করা হলে শেখ সাহেব বলেন, এ 'ধরনের কিছুই হয়নি তবে তাঁর উপদেষ্টাগণ আজ (২০ মার্চ) বিকেলে আলোচনার পর ফর্মুলা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং তাঁরা কিভাবে অগ্রসর হবেন তাও ঠিক করা হবে।' এ বৈঠকে দলীয় উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মুশতাক আহমদ, জনাব মনসুর আলী এবং ডঃ কামাল হোসেন শেখ সাহেবের সাথে থাকবেন বলে তিনি জানান।'[১৮২] ইতিমধ্যে উনিশে মার্চ সন্ধ্যাতেই শেখ মুজিবের তিনজন উপদেষ্টার সাথে প্রেসিডেন্ট ভবনে ইয়াহিয়ার তিনজন উপদেষ্টার দু ঘণ্টা ব্যাপী এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে শেখ সাহেবের পক্ষে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এবং ডঃ কামাল হোসেন, আর প্রেসিডেন্টের পক্ষে ছিলেন সাবেক আইনমন্ত্রী, এ. আর. কর্নেলিয়াস, প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার জেনারেল পীরজাদা এবং সামরিক বাহিনীর জজ এডভোকেট জেনারেল কর্নেল হাসান।[১৮৩] এদিন সন্ধ্যায় ভয়েস অব আমেরিকা তার সংবাদ ভাষ্যে জানালো, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের মধ্যে আলোচনা চলছে। ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার আগেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে উভয়ে আলোচনা করেছেন।'[১৮৪] সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে উনিশে মার্চ শেখ সাহেব আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন। তিনি জানালেন, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে কোনো রাজনৈতিক নেতা তাঁর সাথে আলাপ করতে এলে তিনি তাঁদের সবসময় স্বাগত জানাবেন। .... আমি আমার দরজা কখনো বন্ধ করিনি, আমার ঘরের দরজা সদা উন্মুক্ত।[১৮৫] শেখ মুজিবুর রহমান মিঃ ভুট্টোর দিকে ইংগিত করেই একথা বলেছেন যাতে মিঃ ভুট্টো ঢাকা আসতে রাজী হন।

২০ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের মধ্যে প্রথমবারের মতো তাঁদের উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। এদিন বৈঠক ২ ঘণ্টা ১০ মিনিটের মতো চলে। শেখ মুজিবের সাথে তাঁর উপদেষ্টাদের

---

১৮২. দৈনিক সংগ্রাম, ২০ মার্চ, ১৯৭১

১৮৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৬৫

১৮৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৬৫

১৮৫. দৈনিক সংগ্রাম, ২০ মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

মধ্যে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, খন্দকার মুশতাক আহমদ, জনাব মনসুর আলী, জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান ও ডক্টর কামাল হোসেন। আর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে ছিলেন বিচারপতি এ. আর কর্নেলিয়াস, লেঃ জেনারেল পীরজাদা এবং জজ এটর্নি জেনারেল কর্নেল হাসান। আলোচনা শেষে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বাসায় ফিরে শেখ মুজিব সাংবাদিকদের বলেন, আলোচনার কিছু অগ্রগতি হয়েছে। রাজনৈতিক সংকট সমাধানের পথে তারা এগুচ্ছেন। তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন নেতাদের সাথে পৃথকভাবে আলাপ-আলোচনা করবেন। প্রয়োজনবোধে আমরাও যৌথভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সাথে আলোচনা করতে পারি।[১৮৬] এদিন বিবিসি'র সংবাদ ভাষ্যে মন্তব্য করা হলো, পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সংকট দূরীভূত হচ্ছে।'[১৮৭] সাংবাদিকদের কাছে শেখ মুজিব এদিন জানালেন, তাঁর উপদেষ্টারা প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে পুনরায় পরিস্থিতি ও সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করবেন। উপদেষ্টা পর্যায়ে পরবর্তী বৈঠক কখন অনুষ্ঠিত হবে এ প্রশ্নের জবাবে তাজউদ্দীন বললেন যে, কয়েকটি খুঁটিনাটি বিষয় জানার অপেক্ষায় তাঁরা রয়েছেন।[১৮৮]

২০ মার্চ করাচীতে তাড়াহুড়া করে আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ ভুট্টো বললেন, 'গতকাল গভীর রাতে অবিলম্বে ঢাকা যাওয়ার জন্যে তিনি প্রেসিডেন্টের নিকট থেকে অপর একটি আমন্ত্রণ পেয়েছেন এবং এ আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে আগামীকাল ঢাকা রওয়ানা হবার মনস্থ করেছেন।' এদিন পাকিস্তান রেডিও'র খবরে বলা হয়, জনাব ভুট্টো ২০ সদস্যের একটি উপদেষ্টা দল নিয়ে ঢাকা যাচ্ছেন।[১৮৯] শেখ মুজিবুর রহমান এদিন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিকর উত্তেজনা সৃষ্টির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন এবং সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানালেন।[১৯০]

মিঃ ভুট্টো ২১ মার্চ বিকেলে ঢাকা এলেন। ঢাকা আসার পরপরই তিনি প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্টের সাথে এক আলোচনায় মিলিত হলেন। দুই ঘণ্টা ব্যাপী বৈঠকে কি আলোচনা হয়েছে সংবাদপত্রে তার কিছুই প্রকাশিত হয়নি। সাংবাদিকরা ভুট্টোর সাক্ষাত পায়নি। এ তারিখে প্রেসিডেন্ট

১৮৬. দৈনিক পাকিস্তান, ২১ মার্চ, ১৯৭১
১৮৭. দৈনিক সংগ্রাম, ২১ মার্চ, ১৯৭১
১৮৮. দৈনিক পাকিস্তান, ২১ মার্চ, ১৯৭১
১৮৯. দৈনিক সংগ্রাম, ২১ মার্চ, ১৯৭১
১৯০. দৈনিক সংগ্রাম, ২১ মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

ইয়াহিয়ার সাথে শেখ মুজিবেরও একটা অনির্ধারিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠক ৭০ মিনিট চলে। এ বৈঠকের বিবরণও ঠিক আগের মতোই কিছুই জানা গেল না। তবে শেখ মুজিব সাংবাদিকদের জানালেন, 'আজকের বৈঠক আশ্চর্যজনক বা আকস্মিক এমন কিছুই নয়। প্রেসিডেন্ট ও আমি যতক্ষণ এখানে আছি, ততক্ষণ প্রয়োজনের স্বার্থে যে কোনো সময় যে কোনো ব্যাখ্যার প্রশ্নে আমরা আলোচনায় মিলিত হতে পারি।' উভয়ের মধ্যে আলোচনাকৃত ব্যাখ্যাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাওয়া হলে শেখ মুজিব নীরব থাকেন। পরে বললেন, ইতিপূর্বের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় প্রশ্নের ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আমরা নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি।[১৯১] এদিন দৈনিক আজাদ তার এক রাজনৈতিক রিপোর্টে লিখলো, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের চার দফা শর্তের ব্যাপারে একটা গ্রহণযোগ্য ফর্মূলা প্রণয়নের পরই মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে পারে এবং এ ফর্মূলা প্রণয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন 'পাঞ্জাব প্রেসার গ্রুপ'-এর উপর নির্ভরশীল বলিয়া ওয়াকিফহাল মহল সূত্রে আভাস পাওয়া গিয়াছে। .... বঙ্গবন্ধুর প্রথম শর্ত অর্থাৎ সামরিক শাসন প্রত্যাহারের প্রশ্ন একটি মহল যে বিরূপ চাপ অব্যাহত রাখিয়াছে, তাহাতে কার্যতঃ মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনায় জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে।'[১৯২]

২২ মার্চ বেলা ১১টার দিকে প্রেসিডেন্ট ভবনে মুজিব, ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠক চলাকালেই প্রেসিডেন্টের জনসংযোগ অফিসার বাইরে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের এসে জানালেন, 'প্রেসিডেন্ট ২৫ মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করেছেন। দেশের উভয় অংশের নেতাদের সাথে পরামর্শ করে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমঝোতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সুবিধার জন্যে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'[১৯৩]

বৈঠক ৭৫ মিনিট পর্যন্ত চলে। বৈঠক শেষে বাসভবনে ফিরে শেখ মুজিব সাংবাদিকদের জানালেন, এর আগে প্রেসিডেন্টের সাথে তিনি যেসব আলোচনা করেছেন, তা প্রেসিডেন্ট জনাব ভুট্টোকে অবহিত করেছেন।

---

১৯১. দৈনিক আজাদ, ২২ মার্চ, ১৯৭১

১৯২. দৈনিক আজাদ, ২২ মার্চ, ১৯৭১

১৯৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৭৭৫

www.bjilibrary.com

আলোচনা সম্পর্কে কিছু বলতে শেখ মুজিব অস্বীকার করেন। আলোচনায় অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চেয়ে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলে তিনি জানালেন, 'যদি কোনো অগ্রগতি না হতো, তাহলে আমি কেন আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি?' ২৫ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা সম্পর্কে শেখ সাহেবের প্রতিক্রিয়া একজন সাংবাদিক জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'একথা আমাদের জানা আছে যে, আমি বলছিলাম আমাদের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা অধিবেশনে যোগদান করবো না। .... আমাদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতেই অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে।' শেখ মুজিব সাংবাদিকদের জানালেন, তিনি পুনরায় আজ (২৩ মার্চ) প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করবেন এবং তাঁদের উভয় পক্ষের উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠকও অনুষ্ঠিত হবে।[১৯৪] ২২ মার্চ সন্ধ্যায় ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে পিপলস পার্টির প্রধান মিঃ জুলফিকার আলী ভুট্টো বললেন, 'দেশের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক রাজনৈতিক সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবুর রহমান ব্যাপক সমঝোতা এবং মতৈক্যে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছেন। সমঝোতার শর্তগুলো তাঁর দল পরীক্ষা করে দেখছে। .... ব্যাপক সমঝোতা এবং সমঝোতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট তাঁকে ইতিপূর্বে অবহিত করেন।'[১৯৫]

কিন্তু সমঝোতার বিষয়, শর্তাবলী, প্রকৃতি ইত্যাদি কোনো বিষয়েই কোনো পক্ষ থেকে কিছু জানা যাচ্ছিল না। সরকার তার মুখ একেবারেই বন্ধ রেখেছিলেন, আর শেখ মুজিবও কিছু বলতে রাজী হচ্ছিলেন না। তবে ২৩ মার্চ ঢাকার ইংরেজী দৈনিক 'The People'-এর আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পাকিস্তানী আইনবিদ জনাব এ. কে. ব্রোহী এক বিবৃতিতে বললেন,

"I have been asked to answer the question viz, whether there are any legal impediments in the way of lifting Martial law and transferring power to the people despite the fact that at present the constitution to be framed by the elected representatives of the people in not in existence. The answer to this question purly from juristic ponit of view is that there are no legal inprediments whatever. President yahya who represents the sovereign power in terms of which existing

১৯৪. দৈনিক সংগ্রাম, ২০ মার্চ, ১৯৭১, দৈনিক পূর্বদেশ, ২৩ মার্চ, ১৯৭১ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৭৫-৭৭৬

১৯৫. দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

constitutional dispensation is providing for the adminestration of public affairs in the country is qualified to declarc that he shall no longer exercise that will.

There is for us that historic precedent available in the Indian Independence Act. It will be recalled that before the Independence Act. British power was responsible for providing constitutional arrangemants for the adminestration of public affairs in the country. On the eve of the Independence the departing British power enacted the Indian Indepence Act were contained the provisions in terms of which future governance of the country was to be carried on by the two governor general and the Dominion legeslatures.

Provision were also made for the continuance of existing laws till such time as new constitution in the two dominious was enacted. If we look at that Act and substitute British power for Martial Law power we would have comlpete analogy for understanding the situation which has arisen in the country, If a political decision to transfer power is taken, then Martial law can be brought to an end by cnacting a sort of a self-efficacious decrce to be signed by president Yahya where by power can be trasferred to the elected representations of the people 196

ব্রোহীর এ বক্তব্য থেকে বুঝা গেল, সমঝোতার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় নিয়ে সংকট চলছে, তার মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের পন্থা-পদ্ধিতও একটি। সম্ভবত এ ক্ষেত্রেও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ব্রোহীর কাছ থেকে প্রকাশ্য বক্তব্য আসা বা নেয়ার কারণ বোধহয় এটাই।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত তাঁর বাণীতে বললেন, 'নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যাতে একটি সহজ ও কার্যকরী ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের উপযোগী সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্বিঘ্নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে পারেন সেজন্য বর্তমানে সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট অবশ্যই দূর হয়ে যাবে।'[১৯৭]

---

১৯৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৭৭
১৯৭. দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

তেইশে মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। এদিন সরকারী ও বেসরকারী ভবনগুলোতে পাকিস্তানের পতাকা উড়ার কথা, নানা অনুষ্ঠান হবার কথা। কিন্তু তার কিছুই হয়নি। একমাত্র সামরিক সদর দফতর ও প্রেসিডেন্ট ভবন ছাড়া আর কোথাও পাকিস্তানের পতাকা উড়েনি। তার বদলে উঠেছে নতুন পতাকা–বাংলাদেশের পতাকা। ইংরেজী দৈনিক 'দি পিপল' লিখলো, A New flag is born today-a flag with a golden map of Bangladesh implanted on a red circle placed in the midle of deep green rectangle base. This is the flag for Independent' Bangladesh.[১৯৮] এ পতাকা 'স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ' সরবরাহ করে এবং ২৩ মার্চ তা দেশব্যাপী উত্তোলনের জন্য তারা আহ্বান জানায়।[১৯৯] শেখ মুজিবের ভবন শীর্ষেও সেদিন কালো পতাকার সাথে উড়ছিলো বাংলাদেশের পাতাকা। ভোরে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় শ্রমিক পরিষদের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে (ছাত্রদের দ্বারা) শেখ মুজিবের বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হলো। পতাকা উত্তোলনের সময় গাওয়া হলো, 'জয় বাংলা জয় বাংলা মাতৃভূমি বাংলার জয়।' সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ পতাকা নামায়।[২০০] তেইশ তারিখে সকাল থেকেই শেখ সাহেবের বাড়ীর সামনে আসতে লাগলো শত শত মিছিল। তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যেই শেখ মুজি ব সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন। সকালে তিনি বাড়ীর সামনে জয় বাংলা বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং তাদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেন। বিকেলে আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার এক জংগী মিছিল কুচকাওয়াজ করে তাঁর বাসভবনে এলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যেও কথা বলেন। শেখ মুজিব তাঁর এ দিনের বক্তৃতাসমূহে দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কথা পুনরায় ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, আমরা শান্তিপূর্ণ শৃঙ্খলার সাথে আন্দোলন চালিয়ে যাবো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, নীতির প্রশ্নে আপোস হবে এবং দাবীকে দাবিয়ে রাখতে চাইলে আমরা চুপ করে থাকবো।[২০১] উল্লেখ্য, ২৩ মার্চকে শেখ মুজিবুর রহমান 'লাহোর প্রস্তাব দিবস' আর স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ একে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছিলো। প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে স্বাধীন বাংলা ছাত্র

---

১৯৮. The People, 23rd March, 1971
১৯৯. দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ মার্চ, ১৯৭১
২০০. দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ মার্চ, ১৯৭১
২০১. দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

সংগ্রাম পরিষদ ও শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে ছাত্র শ্রমিক সভা অনুষ্ঠিত হলো। সভায় ছাত্র-শ্রমিক নেতৃবৃন্দ 'স্বাধীনতা' রক্ষার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় গৃহীত অন্য এক প্রস্তাবে সকল পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্য বর্জনের আহ্বান জানানো হলো এবং এজন্যে ২৪ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্য বর্জন সপ্তাহ পালনের আহ্বান জানানো হয়। আরেকটি প্রস্তাবে আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য, ভারত, সিংহল, বার্মা, ইরান প্রভৃতি দেশের প্রতি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিকট কোনো প্রকার অস্ত্র সাহায্য, বিক্রয় অথবা সেনাবাহিনীর জন্যে স্থল পথ, জল পথ ও আকাশ পথ ব্যবহারের অনুমিত না দেয়ার জন্যে আবেদন জানানো হলো।[২০১ক]

শেখ মুজিবের সাথে কোনো বৈঠক এদিন জেনারেল ইয়াহিয়ার হলো না তাঁদের উপদেষ্টাদের মধ্যেও নয়। তবে এদিন মিঃ ভুট্টোর সাথে প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার জেঃ পীরজাদার একটি বৈঠক প্রেসিডেন্ট ভবনে ৭৫ মিনিট ব্যাপী চলে। বৈঠক থেকে ফেরার পর মিঃ ভুট্টো সাংবাদিকদের বললেন, প্রেসিডেন্টের সাথে সেদিন তাঁর বৈঠকের কোনো সম্ভাবনা নেই। তিনি আরো জানালেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের ফর্মুলা সম্পর্কে তাঁর দলীয় নেতাদের সাথে আলোচনায় তিনি সারাদিন কাটিয়েছেন। গত সোমবার সারা রাতও এ ফর্মূলা নিয়েই আলোচনা করেছেন। এক প্রশ্নের জবাবে ভুট্টো জানালেন, যতদিন ঢাকায় তাঁর থাকা প্রয়োজন, ততদিন তিনি থাকবেন।'[২০২] ভুট্টোর পিপলস পার্টি ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য দলের নেতারা এদিন শেখ মুজিব এবং প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাত করেন এবং সংকট নিরসনে তাঁদের ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেন। উল্লেখ্য, পশ্চিম পাকিস্তানের এসব নেতা আগেই শেখ মুজিবের চার দফা দাবীর প্রতি সমর্থন দান করেন। তেইশে মার্চ করাচীতে জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্বকারী পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট ছোট দলগুলোর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র মুখপাত্র বলে উক্ত দলটি যে দাবী করছে সর্বসম্মতিক্রমে তা প্রত্যাখ্যান করা হলো। বলা হলো, সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরই বর্তমান রাজনৈতিক উত্তরণের একমাত্র উপায়। সভায় প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

২০১ক. দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ মার্চ, ১৯৭১
২০২. দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

জনাব এম এম আহমদকে অবিলম্বে বরখাস্ত করার দাবী জানানো হলো। বলা হলো এম এম আহমদই বর্তমান অচলাবস্থার জন্য দায়ী।[২০৩]

২৪ মার্চ তারিখেও শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে কোনো বৈঠক হবার খবর সংবাদপত্র এলো না। তবে তাঁদের উপদেষ্টাদের মধ্যে বৈঠক হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমান যেসব বিষয়ে নীতিগতভাবে মতৈক্যে পৌঁছেছেন, সে সম্পর্কেই আওয়ামী লীগের তিনজন নেতা এদিন প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। আওয়ামী লীগের সে তিনজন নেতা ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এবং ডঃ কামাল হোসেন। বৈঠক শেষে বেরিয়ে এসে তাজউদ্দীন সাংবাদিকদের জানালেন, উপরোক্ত বৈঠকে তাঁরা তাঁদের সকল মতামত ব্যক্ত করেছেন। সে জন্যে তাঁদের দিক থেকে আর কোনো বৈঠকের প্রয়োজন নেই। তিনি বললেন, তাঁরা আওয়ামী লীগের বক্তব্য ও 'সম্পূর্ণ পরিকল্পনা'র ব্যাখ্যা দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। জনাব তাজউদ্দীন সাংবাদিকদের কাছে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আরও বললেন, সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে আর কালবিলম্ব করলে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে।[২০৪] এদিন ২৪ মার্চ শেখ মুজিবের বাসভবনে পুরুষ-মহিলা-শিশুদের কমপক্ষে ৪০টির মতো মিছিল আসে। বাসভবনের সামনে এক সমাবেশে শেখ মুজিব বললেন, আমাদের দাবী ন্যায়সংগত এবং স্পষ্ট এবং সেগুলো গ্রহণ করতে হবেই। জনগণ জেগে উঠেছে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ। পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাদের দাবী দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ..... আমরা শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই, কিন্তু কেউ যদি তা না চায়, তাহলে তুমি আমাদের দমিয়ে দিতে পারবে না। আমি আশা করি, কেউ সে চেষ্টা করবেন না। লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে-বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।'[২০৫]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে এদিন মিঃ ভুট্টোর একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো। আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট হাউজ থেকে হোটেলে ফিরে মিঃ ভুট্টো সাংবাদিকদের বললেন, আলোচনায় অগ্রগতি হচ্ছে। আলোচনা চলছে, আমরা সামনে এগুতে পারছি। তিনি জানালেন, প্রেসিডেন্ট, আওয়ামী লীগ এবং তাঁর উপদেষ্টাদের যুক্ত বৈঠক ব্যাপারটিকে আরও

---

২০৩. দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ মার্চ, ১৯৭১

২০৪. দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ মার্চ, ১৯৭১

২০৫. বাংলাদশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৭৮২

www.bjilibrary.com

ত্বরান্বিত করতে পারতো, কিন্তু তা এ মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না। তিনি আরও বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের ব্যাপারে আমি আন্তরিক এবং আমি স্বীকার করি, পূর্ব পাকিস্তান বঞ্চনার শিকার হয়েছে। তিনি জানালেন, আলোচনায় প্রয়োজনীয় নয়, তাঁর টীমের এমন কিছু লোক আজ ঢাকা থেকে চলে যাচ্ছে। যতদিন প্রয়োজন তিনি ঢাকা থাকবেন।' এর আগে আলোচনার জন্যে প্রেসিডেন্ট ভবনে যাবার সময় মিঃ ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেছিলেন, শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যার উপর ঐকমত্য ও সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন, সে বিষয়ে আমি আমাদের উপদেষ্টাদের সাথে গত সারারাত ধরে আলোচনা করেছি। আমি চাই সংকটের শেষ হোক।'[২০৬] জনাব তাজউদ্দীন এদিন তাঁর এক বিবৃতিতে রাজনৈতিক সমাধান বানচালের চক্রান্ত সফল হতে না দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। অন্যদিকে লাহোর থেকে একজন পিপিপি নেতা পিপলস পার্টির সাথে পরামর্শ না করে কেন্দ্রে সরকার গঠনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।[২০৭]

পিপিআই-এর ২৪ মার্চের এক খবরে জানা গেল ২৫ তারিখে মিঃ ভুট্টোর উপদেষ্টারা প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে বসছেন। মিঃ ভুট্টোও তার হোটেলে সাংবাদিকদের কাছে একথা বলেছিলেন। কিন্তু বৈঠক হয়েছিলো কিনা সে খবর আর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। তবে মিঃ তাজ উদ্দীন সহ আওয়ামী লীগের তিনজন নেতা ২৪ তারিখে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে বসার পর আর কোনো বৈঠক তাঁদের মধ্যে হয়নি। শেখ মুজিব ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে ফর্মুলার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন, তার সাথে মিঃ ভুট্টোকে একমত করানই ছিলো এ পর্যায়ের আলোচনার মুখ্য বিষয়। সম্ভবত এ কারণেই মিঃ তাজউদ্দীন ২৪ তারিখে তাঁদের আর বৈঠকে বসার প্রয়োজন নেই বলে উল্লেখ করেছিলেন। বুঝা যায়, শেখ মুজিব ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে ফর্মূলার ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন, তা মিঃ ভুট্টোকে অবহিত করা এবং সম্মতি নেয়ার জন্য তাকে ঢাকা ডেকে আনা হয়। এবং মিঃ ভুট্টো ঢাকা এসে এ বিষয় নিয়েই তাঁর পার্টি এবং প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠক করেছেন। কিন্তু সমঝোতার বিষয়টা কি ছিলো, ত্রিপক্ষীয় এবং দ্বিপক্ষীয় আলোচনার ফল কি দাঁড়াল, তার কিছুই সংবাদপত্র এবং জাতি কেউই জানতে পারল না। পর্দার অন্তরালের

---

২০৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৮১

২০৭. দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ মার্চ, ১৯৭১

৮—

www.bjilibrary.com

এ বিষয়গুলো জানার জন্য আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও ওয়কিফহালদের পরবর্তীকালের বিবরণীর উপরই আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। পঁচিশে মার্চের কালরাতের আগে শেখ মুজিবের আর মাত্র দুটো বিবৃতির সন্ধান এ সময় আমরা পাই। একটি ছিল পাট ব্যবসায় শুরু করা এবং আমদানি-রফতানি সম্পর্কিত তার নির্দেশ, অপরটি সৈয়দপুর, রংপুর ও জয়দেবপুরে জনতার উপর সেনাবাহিনীর নির্বিচার গুলী বর্ষণের প্রতিবাদে ২৭ মার্চ গোটা দেশ ব্যাপী হরতাল আহ্বানের ঘোষণা সংক্রান্ত।[২০৮]

১৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা আসার পর ২৫ মার্চের কালরাত পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, শেখ মুজিব এবং ভুট্টোর মধ্যে কি নিয়ে কি ধরনের আলোচনা হয়েছিল, তাতে কার কি ভূমিকা ছিল, তা পরবর্তীকালে অনেকের কাছ থেকেই জানা গেছে। সেসব আলোচনা সামনে আসলে সে ঐতিহাসিক সময়ের একটা চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমে সেই সময়ের ঘটনার একজন ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক জনাব মওদূদ আহমদ যে বিবরণ দিয়েছেন সেটা দেখা যাক। 'Bangladesh Constitutional Quest for Autonomy' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ঃ

“রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর কতিপয় জেনারেলকে সাথে নিয়ে ১৫ মার্চ ঢাকা এলেন। ১৬ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে কথাবার্তা চললো। পরে এর সাথে ভুট্টো এসেও যুক্ত হলেন। ইয়াহিয়া আগের মতোই মুজিবের প্রতি আপোসমূলক আচরণ প্রদর্শন করলেন। এ পর্যন্ত যা ঘটেছে তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং রাজনৈতিক সমাধানের তাঁর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার কথা জানালেন। এবার আলোচনার বিষয়বস্তু ১লা মার্চের আগের আলোচনা থেকে আলাদা হলো। এবারের আলোচনা পূর্ণ একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দিকে না গিয়ে জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রকৃতি কেমন হবে তার উপরই কেন্দ্রভূত থাকলো। এটা ছিল জন-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সুযোগ সৃষ্টির জন্যে একটা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা ঠিক করার প্রশ্ন। শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ও ফেডারেল সরকারের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের প্রশ্নও এর সাথে জড়িত ছিলো। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে মুজিব ও ইয়াহিয়া নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছেন ঃ

২০৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৮৭

www.bjilibrary.com

(১) সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং একটি প্রেসিডেন্সিয়াল প্রোক্লামেশনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।

(২) প্রাদেশিক ক্ষমতা সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের হাতে অর্পণ।

(৩) ইয়াহিয়ার হাতে প্রেসিডেন্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব থাকবে।

(৪) পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্যদের প্রথম প্রস্তুতিমূলক বৈঠক এবং তারপর শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত প্রণয়নের জন্যে জাতীয় পরিষদে যুক্ত অধিবেশন।

চতুর্থ প্রস্তাবটি শেখ মুজিব নিজেই দিয়েছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তা অনুমোদন করেছিলেন। তাজউদ্দীন তাঁর ১৭ এপ্রিল, '৭১ তারিখের বিবৃতিতে উল্লেখ করেছিলেন যে, ভুট্টোকে এ্যাকোমোডেট করা এ সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকে এবং ফেডারেল গভর্নমেন্টকে তাদের অবস্থান নিরূপণে সুযোগ দেয়ার জন্যে ইয়াহিয়া নিজেই এর প্রস্তাব করেছিলেন। কারণ ৬ দফা পুরোপুরি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর জন্যে প্রযোজ্য ছিলো না। পিপলস পার্টি প্রস্তাব করেছিলো, জাতীয় পরিষদ প্রথমে একক বডি হিসেবে অধিবেশনে মিলিত হবে, তারপর দুটি কমিটি গঠন করবে। মুজিব এ প্রস্তাব ভুট্টোকে এ্যাকোমোডেট করার জন্যে গ্রহণ করেছিলেন।

মুজিবের এ-ই লক্ষ্য ছিলো। কিন্তু আন্দোলনের প্রকৃতি দেখে তিনি তাঁর কৌশল পরিবর্তন করেছিলেন। মুজিব আগে যা জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে চেয়েছিলেন, এখন তিনি তা পেতে চাইলেন ইয়াহিয়ার দ্বারা ঘোষিত একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে। যেহেতু শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে জাতীয় পরিষদ বসতে পারছিলো না এবং যেহেতু ভুট্টো এবং সেনাবাহিনী আওয়ামী লীগ কর্তৃক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের বিরোধী ছিলো, তাই মুজিবের এ দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন। তিনি এখন প্রথমেই প্রদেশগুলো বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের হাতে ৬ দফার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের এখতিয়ার সহ ক্ষমতা হস্তান্তর চাইলেন। এর দ্বারা তিনি জনগণকে শান্ত করতে পারবেন এবং একবার পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই জাতীয় পরিষদে তিনি পাকিস্তানের জন্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারবেন।

১৬ মার্চ মুজিব যখন ইয়াহিয়ার কাছে তাঁর চার দফা দাবী পেশ করলেন, তখন ইয়াহিয়া মুজিবকে কেন্দ্রে ভুট্টোর সাথে কোয়ালিশন

www.bjilibrary.com

সরকার গঠন করতে বললেন। প্রস্তাবটি খুব মন্দ ছিলো না এবং মুজিব নীতিগতভাবে কেন্দ্রে এ ধরনের সরকার গঠনের বিরোধিতা করলেন না। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন, গণতান্ত্রিক বিধি অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তাঁকে মন্ত্রী পসন্দ করার ক্ষেত্রে চাপ দেয়া যাবে না। মুজিবের প্রতিক্রিয়া দেখার পর ইয়াহিয়া বোধগম্য কারণেই এ পথে আর অগ্রসর হননি।

মুজিবের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ছিলো প্রদেশগুলো বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে বিধিগত ও প্রশাসনিক ক্ষমতা নিরূপণ করা। তিনি সেই ১৯৬৯ সালের মার্চে প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন যখন ইয়াহিয়া এবং আইয়ুব তাঁকে এর অফার দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা ও মর্যাদা নির্দিষ্ট না করে তাঁর কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় যাওয়া অর্থহীন এবং বাঙ্গালীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শামিল হবে। সুতরাং তিনি প্রথমেই প্রদেশগুলোতে ক্ষমতা হস্তান্তর পসন্দ করলেন এবং প্রস্তাব করলেন যে, অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে ইয়াহিয়াই প্রেসিডেন্ট থাকবেন। তখন ইয়াহিয়াও বুঝলেন যে, ১৯৬২ সালের মতো শাসনতন্ত্রের অধীনে মুজিব ও ভুট্টোকে এক কেবিনেটে পাওয়া সম্ভব নয়, তখন প্রদেশগুলোর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে মুজিবের সাথে তিনি একমত হলেন।

মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যকার ১৭ ও ১৮ মার্চের আলোচনা ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের তৃতীয় সিডিউল ঘিরেই কেন্দ্রীভুত ছিলো। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের আইনগত ক্ষমতা নির্ধারণ নিয়েই তাঁদের আলোচনা চলছিল। ইয়াহিয়ার উপদেষ্টারা মত প্রকাশ করছিলেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের অধীনেই প্রদেশগুলো পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। আওয়ামী লীগ এ প্রস্তাব সরাসরি বাতিল করে দিলো। ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা আরও বলেন, সামরিক বিধির অধীনে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু আওয়ামী লীগের দাবীর প্রথমটিই ছিলো সামরিক আইন প্রত্যাহার, তাই এ প্রস্তাবের আওয়ামী লীগ বিরোধিতা করলো। ১৯ মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া আবার বৈঠক হলো। বৈঠকে ইয়াহিয়া স্বীকার করলেন, প্রেসিডেন্সিয়াল অধ্যাদেশের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজী আছেন। তাঁরা আরও একমত হলেন, ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের যথেষ্ট আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকা দরকার। ১৯ মার্চের বৈঠকের পর মুজিব খুবই আশান্বিত হলেন এবং তিনি আমাকে বললেন যে, ইয়াহিয়া ৬ দফা এমনকি এরও বেশী কনফেডারেশন পর্যন্ত মানতে

www.bjilibrary.com

রাজী আছেন। আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্যার অবশেষে সমাধান হতে যাচ্ছে। ' সংবাদপত্র এবং অন্যান্য মাধ্যমও আশাবাদ প্রকাশ করলো এবং জনগণও পুনরায় আশান্বিত হয়ে উঠলো। ঐদিন সন্ধ্যায় আমি শেখ মুজিবকে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ করে সেনাবাহিনীর এ বোধোদয় হলো কেমন করে ? মুজিব উত্তরে বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের জনমতের মুকাবিলায় তাদের আর কোনো বিকল্প ছিলো না। তারা জানে, এ না হলে তারা পূর্ব পাকিস্তান হারাবে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকবে না।'

ইয়াহিয়া ও মুজিবের মধ্যকার সমঝোতা অনুসারে ইয়াহিয়ার উপদেষ্টারা একটা খসড়া প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণা তৈরি করলেন। মার্শাল-ল' রেগুলেশনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে বিরোধিতা আওয়ামী লীগ করছিলো তা এর দ্বারা পূরণের ব্যবস্থা করা হলো। এ খসড়া ঘোষণা তৈরির লক্ষ্য ছিল জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যাসমূহ আলোচনার ভিত্তি তৈরি করা। খসড়া ঘোষণাটি কমবেশী ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রকে বিবেচনায় রেখেই প্রণীত হয়েছিলো। এতে প্রেসিডেন্ট এবং কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের মতোই রইলো। অবশ্য খসড়া দলিলটির ৭নং আইটেমে পূর্ব পাকিস্তানের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হলো ঃ 'কেন্দ্রীয় আইনসভা পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সম্মত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া থার্ড সিডিউল অনুসারে আইন প্রণয়নের নিরংকুশ ক্ষমতা ভোগ করবে।'

শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এ খসড়া ঘোষণাপত্রে খুবই হতাশ হলেন। অন্তত আইন প্রণয়নের দিক দিয়ে তাঁদেরকে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের পর্যায়ে পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। তাঁরা একে সামরিক জান্তার কালক্ষেপণকারী কৌশল বলে মনে করলেন। মুজিব খুবই ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁদের প্রকৃত মতলবটা জানতে চাইলেন। তিনি এবং তাজউদ্দীন পরদিন (২১ মার্চ) সকালে ইয়াহিয়ার সাথে এক অনির্ধারিত সাক্ষাতকারে মিলিত হলেন এবং জানতে চাইলেন তিনি (ইয়াহিয়া) সত্যিই কোনো রাজনৈতিক সমাধান চান কিনা। বাইরের বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থার কথা, যেখানে মানুষ স্বাধীনতার দাবী তুলেছে, তারা ইয়াহিয়াকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, তাঁরা অনির্দিষ্টকাল এ আলোচনা চালিয়ে যেতে পারবেন না। ইয়াহিয়া তাড়াতাড়ি মুজিবকে শান্ত করলেন এবং বললেন, তিনি মুজিবের শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলার সাথে একমত। ইয়াহিয়া মুজিবকে জানালেন যে, ঘোষণা চূড়ান্ত করার আগে আমাদের ঐকমত্যের

www.bjilibrary.com

ব্যাপারটা ভুট্টোকে অবহিত করার জন্যে তাঁকে আমি ঢাকা আসতে বলেছি।

ঐকমত্য অনুসারে ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা (legislative powers) সুনির্দিষ্ট করে একটি প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণা আওয়ামী লীগ তৈরি করে দাখিল করলো। ঘোষণার প্রস্তাবনায় বলা হলো। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনেই এটা প্রণীত। আওয়ামী লীগ প্রস্তাবিত এ খসড়ায় প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারটা ১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কাছে পেশকৃত Constitution Amendment Bill-এর অনুরূপ ছিলো। এ খসড়া ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের 'স্টেস্ট অব বাংলাদেশ' নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছিল। এটা নতুন কোনো বিষয় ছিলো না। ১৯৬৯ সালের শাসনতন্ত্র সংশোধন বিলের ২(৫) ধারায় প্রদেশগুলোকে শাসনতান্ত্রিকভাবে এ ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো যে, যে নামে সে পরিচিত তা গ্রহণ করতে পারে।

আওয়ামী লীগের খসড়া ঘোষণায় রাষ্ট্রের নাম 'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান' অক্ষুণ্ন রাখা হলো এবং বলা হলো ঘোষণায় (Proclamation) গৃহীত সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন সাপেক্ষে পাকিস্তান ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে পরিচালিত হবে। ইয়াহিয়া পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন সে সুযোগ ঘোষণাটিতে রাখা হলো। ঘোষণার বিধান সাপেক্ষে প্রেসিডেন্ট প্রশাসনিক হেড হিসেবে সাবেক শাসনতন্ত্রের সব ক্ষমতা ভোগ করবেন। তিনি প্রয়োজন অনুসারে উপদেষ্টা, ইত্যাদি ধরনের স্টাফ নিয়োগ করতে পারবেন। তবে তিনি জাতীয় পরিষদ কিংবা স্টেস্ট এসেম্বলী বাতিল বা স্থগিত করতে পারবেন না। কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর মধ্যে বিষয় বণ্টনের মতো মৌল বিষয়ে বলা হলো, ফেডারেল আইন পরিষদ পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) ব্যাপারে ১২টি বিষয়ে আইন প্রণয়ন একক ক্ষমতা ভোগ করবে। বিষয়গুলো হলো ঃ

(ক) Defense of Pakistan.

(খ) Foreign Affairs, excluding Foreign Trade and Aid.

(গ) Citizenship, naturalization and aliens, including admission of persons into and departure of persons from Pakistan.

www.bjilibrary.com

(ঘ) Currency, coinage, legal tender and the state Bank of Pakistan subject to paragraph 16 of the proclamation.

(ঙ) Public Debt of the Centre.

(চ) Standards and weight and measures.

(ছ) Property of the Centre, Wherever situated and the revenue from such property.

(জ) Coordination of international and inter-wing Communication.

(ঝ) Elections to the office of the President, to the natonal Assembly and to the Provincial Assemblies, the Chief Election Commissioner and Election Commissioners, remuneration of the Speaker, Deputy Speaker, and other members of the National Assembly, powers, privilages and immnuities of the National Assembly.

(ঞ) Supreme Court of Pakistan.

The Service and Execution outside a province or a State of Prosesses and judgements,

(ট) Offences against laws with respect to any of the matters enumerated above.

১৯৭১ সালে আগস্টে প্রকাশিত শ্বেতপত্রে পাকিস্তান সরকার অভিযোগ করলো যে, মুজিবের খসড়া ঘোষণাটি পাকিস্তানকে কনফেডারেশনে পরিণত করতে চাচ্ছিল। কারণ এতে ছিলো দুই শাসনতান্ত্রিক কনভেনশনের কথা–একটি পূর্ব পাকিস্তান, অপরটি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। যা ছিল একই সাথে 'লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক' এবং আওয়ামী লীগের ছয় দফার বিরোধী। এ কারণেই সামরিক জান্তার কাছে তা ছিলো অগ্রহণযোগ্য।' যদিও ঐ পরামর্শটা এসেছিলো ভুট্টোকে স্থান করে দেয়ার চিন্তা থেকে, তবু বিরাজমান অবস্থার আলোকে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা চলতে পারতো। কেউ একে 'ফেডারেশন' বলুক কিংবা 'কনফেডারেশন' মুজিব এর দ্বারা চেয়েছিলেন রাজনৈতিক সমাধানের একটা পথ খুঁজতে। একটি কনফেডারেশনের রূপ যদি হয় 'স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশসমূহের একটি ইউনিয়ন', তাহলে আওয়ামী লীগ প্রস্তাবিত খসড়া ঘোষণায় রাষ্ট্রের যে

www.bjilibrary.com

রূপ তুলে ধরা হয়েছিলো তাকে সত্যিকার অর্থে কনফেডারেশন বলা যাবে না। যদিও সময়টা এমনই উত্তপ্ত ছিলো যে, পূর্ব পাকিস্তানের তরফ থেকে কনফেডারেশন, যার কথা জান্তা বলেছে, এর দাবী ওঠা অসম্ভব কিছু ছিলো না, তবু আওয়ামী লীগ কেন্দ্রের হাতে সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষমতা রেখে এক সার্বভৌম পাকিস্তানের প্রস্তাব তার খসড়া ঘোষণায় রেখেছিলো। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিলের এক বিবৃতিতে তাজউদ্দীন বলছিলেন, আওয়ামী লীগ প্রস্তাবিত খসড়া ঘোষণায় এম. এম. আমহদ তিনটি সংশোধনী এনেছিলেন যা আওয়ামী লীগ ভাষার সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে গ্রহণ করেছিলো। এ ঐকমত্যের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ আশা করছিলো যে, খসড়া ঘোষণাটির ভিত্তিতে তাদেরকে অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

ইয়াহিয়া মুজিবের ঐকমত্য যা বলেছে তাহলো সামরিক শাসন তুলে নেয়া হবে, জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তান পর্যাপ্ত স্বায়ত্বশাসন ভোগ করবে। ভুট্টো ঢাকা এলেন মার্চের ২১ তারিখে। সেই দিনই প্রেসিডেন্টের সাথে তিনি দেখা করলেন। প্রেসিডেন্ট তাঁকে মুজিব-ইয়াহিয়া ঐকমত্যের বিষয়টা পূর্ণভাবে অবহিত করলেন। পরদিন একটি যৌথ বৈঠক ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে–ইয়াহিয়ার এ আশ্বাসের ভিত্তিতে মুজিব একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে উপস্থিত হলেন যেখানে ইয়াহিয়া, মুজিব ও ভুট্টোই শুধু ছিলেন। এ বৈঠকে ভুট্টো কেন্দ্রে দুই মেজরিটি পার্টির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তিনি বললেন, কোনো শাসনতন্ত্রই জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের মেজরিটি অর্থাৎ পিপলস পার্টির অনুমোদন ছাড়া গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ভুট্টো দাবী করলেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তর এবং শাসনতন্ত্র তৈরী উভয় ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিট হিসেবে ধরতে হবে। ভুট্টোর এ দাবীগুলোর কোনোটিই মুজিবের জন্যে গ্রহণযোগ্য ছিল না। মুজিব কেন্দ্রে সরকার গঠনের আশা ত্যাগই করে বসেছিলেন। কিন্তু ভুট্টোকে একটা স্থান করে দেয়ার জন্যই তিনি অবশেষে এ আপোস ব্যবস্থায় রাজী হলেন যে, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে জাতীয় পরিষদ পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত হবে যাতে করে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর ভুট্টোর কর্তৃত্ব থাকে।

ভুট্টো খুশী হলেন যে, মুজিব অন্তত জাতীয় পরিষদকে দুই ভাগে ভাগ করতে রাজী হয়েছেন। এটা পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা হিসেবে ভুট্টোর প্রতি স্বীকৃতিই শুধু নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যদের সমর্থন নিয়ে ৬ দফা

www.bjilibrary.com

ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অবস্থান থেকেও মুজিবকে এটা সরিয়ে আনলো। জাতীয় পরিষদ এক হিসেবে বসবে না দুই, না কমিটিসমূহের আকারে বসবে, মুজিবের জন্যে এটা কোনো ব্যাপারই ছিলো না। তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠ। জাতীয় পরিষদ যখনই একক অধিবেশনে বসবে তিনি গোটা দেশের জন্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকারী। কিন্তু ভুট্টোকে এ স্বীকৃতি দেয়ার বিনিময়ে মুজিব যেটা চেয়েছিলেন তাহলো, পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং পূর্ব পাকিস্তানের পর্যাপ্ত স্বায়ত্তশাসনের শাসনতান্ত্রিক নিশ্চয়তা। এ ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের পর ভুট্টো একে 'ফলপ্রসু ও সন্তোষজনক' বলে অভিহিত করলেন এবং জনগণকে এ ধারণা দেয়া হলো যে, সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। এ বৈঠকে ২৫ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৩ ও ২৪ মার্চ যখন ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপদেষ্টাদের মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রস্তাবিত খসড়া ঘোষণা. অনুসারে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিস্তারিত আলোচনা চলছিলো, তখন ভুট্টো অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানকে বাড়তি কোনো অধিকার দেয়ার বিরোধিতা অব্যাহত রাখেন এবং ফেডারেল তালিকা থেকে 'ফরেন এইড ও ফরেন ট্রেড' বাদ রাখার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি উত্থাপন করেন। তিনি আরও মত প্রকাশ করলেন, সামরিক শাসনের উপস্থিতি ছাড়া প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর আইন বিরুদ্ধ হবে। এরূপ ঘোষণার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হলে কেন্দ্রীয় সরকার বলতে কিছু থাকবে না।

জেনারেল পীরজাদা এবং অন্যান্য সহ প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মিঃ এম. এম. আহমদ বৈঠকগুলোতে হাজির ছিলেন এবং খসড়া ঘোষণার বিস্তারিত আলোচনা করেন। ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপদেষ্টাদের মধ্যে শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২৪ মার্চ বিকেলে। সেই পুরাতন বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ প্রশ্নেই এ বৈঠক মুলতবি হয়ে যায়। শেখ মুজিবের উপদেষ্টারা যখন প্রেসিডেন্ট হাউজ থেকে ফিরলেন তাঁদের খুব মলিন মনে হলো এবং তাজউদ্দীন আমাকে বললেন, "তারা তাদের সিদ্ধান্ত আমাদের আগামীকাল (২৫ মার্চ) জানাবে।" যা হোক, গোটা বিষয়টাকেই অর্থহীন প্রয়াস মনে হলো।

২৪ মার্চ বিকেল পর্যন্ত, সরকারীভাবে আলোচনা চলছিলই, পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটলো। ভুট্টো বাদে পিপলস পার্টির সব নেতাসহ পশ্চিম

www.bjilibrary.com

পাকিস্তানের সকল নেতাই ঢাকা ত্যাগ করলেন। কোনো একটা পরিকল্পনা যেন কার্যকর হতে যাচ্ছে এবং এ নেতৃবৃন্দ যেন সেনাবাহিনীর সে পরিকল্পনা জানতে পেরেছেন, তাঁদের ঢাকা ত্যাগকে তারই লক্ষণ বলে মনে হলো।

২৫ মার্চ বেলা ৯টায় ভুট্টো ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করলেন এবং ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপদেষ্টারা যে শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছিলেন তার প্রতি চূড়ান্তভাবে তাঁর 'না' টা জানিয়ে দিলেন। যদিও প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনার পর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় তিনি দাবী করলেন, 'আমরা কোনো সমস্যা সৃষ্টি করছি না, তবু ভুট্টো বললেন, পূর্ব পাকিস্তান্ যে স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছে তা স্বায়ত্তশাসনের সংজ্ঞার বিচারে সত্যিই স্বায়ত্তশাসন নয়।'

ঐদিন (২৫ মার্চ) সকালেই ১০টার দিকে আমি ক্ষমতাসীন জেনারেলদের শেভ্রলেট কারের একটি কনভয়কে প্রেসিডেন্ট ভবনে ঢুকতে দেখলাম। জেনারেল হামিদ, ওমার, মিঠা, পীরজাদা এবং টিক্কা ইয়াহিয়ার সাথে একটি ভাগ্য নির্ধারণী বৈঠকে বসলেন যা চললো মাত্র ৩০ মিনিট। ফল হলো এই, ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপদেষ্টাদের শাসনতান্ত্রিক আলোচনার যে রেজাল্ট আওয়ামী লীগকে জানানোর কথা ছিলো, তা আর কোনো দিনই জানানো হলো না। ২৫ মার্চ বিকেলে মুজিব ক্যান্টনমেন্ট সোর্সে জানতে পারলেন যে, রাজনৈতিক সমাধানের কোনো সম্ভাবনা নেই এবং সেনাবাহিনী তার অভিযানের জন্যে তৈরি হচ্ছে। বিকেলে ঐ একই উৎস থেকে মুজিবকে বলা হলো, ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেছেন। সেনাবাহিনীর আসন্ন অভিযানের রকম প্রকৃতি শেখ মুজিব অনুমান করতে পারলেন না। তিনি তাঁর চারদিকের সহকর্মীদের তৎক্ষণাৎ ঢাকা শহর থেকে সরে যাবার নির্দেশ দিলেন এবং তোফায়েল, রাজ্জাক প্রমুখ যুব নেতাদের বুড়িগঙ্গার ওপারে গ্রামাঞ্চলে সরে যেতে বললেন।

রাত সাড়ে দশটার দিকে একটা সেনা ইউনিট রেডিও ও টিভি ষ্টেশনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলো এবং সাড়ে এগারটা থেকে ব্যাপক আকারে গোলাগুলী শুরু হলো। মুজিব বাড়ীতে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাজউদ্দীন ও আমি কয়েকজন বন্ধু সমেত হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আটকা পড়েছিলাম। বাঙ্গালীদের প্রতি সহানুভূতিশীল সব বিদেশী সংবাদদাতারাও সেখানে অবস্থান করছিলেন। তাঁরাও আটকা পড়লেন। ভুট্টো ১১০০নং স্যুটে অবস্থান করছিলেন। রাত সাড়ে ১২টার

www.bjilibrary.com

দিকে সেনাবাহিনীর ৫৮ থেকে ৬০টি গাড়ীর একটা বহর প্রেসিডেন্ট হাউজ থেকে বেরিয়ে আমাদের হোটেল অতিক্রম করে বাঁ দিকে ঘুরে শাহবাগের দিকে চলে গেল। সাথে সাথেই আমি হোটেল থেকে মুজিবের কাছে টেলিফোন করলাম। ফোনটা ধরলেন হাজী মোরশেদ। আমি তাকে জানাতে বললাম যে, আমার আশংকা আর্মি মুজিবের বাড়ী আক্রমণ করতে পারে। তাঁকে নিরাপদ স্থানে সরে পড়া দরকার। বারটা পঞ্চাশ মিনিটে মুজিবের বাড়ীতে পুনরায় টেলিফোন করলাম। এ সময়ও টেলিফোনের অপর পারে হাজী মোরশেদকে পেলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মুজিব নিরাপদ জায়গায় সরেছেন কিনা। হাজী মোরশেদ কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'আমরা তাঁর পা ধরেছি এবং বার বার তাঁকে অনুরোধ করেছি বাড়ী থেকে সরে যাবার জন্যে। কিন্তু তিনি রাজী নন। তিনি দেখতে চান তাঁরা তাকে কি করে।' রাত ১টা ১০ মিনিটের সময় যখন আমি পুনরায় মুজিবের বাড়ীতে টেলিফোন করার চেষ্টা করলাম। টেলিফোনের লাইন কাটা। মুজিব রাত ১টা থেকে দেড়টার মধ্যে গ্রেফতার হন।"[২০৯]

মার্চের ১৫ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত পর্দার অন্তরালে যা ঘটেছিলো, যার বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি, তার যে বিবরণ জনাব মওদুদের কাছ থেকে পাওয়া গেলো, তা থেকে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার। এক, জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিলো, দুই, প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণার মাধ্যমে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই একমত হয়েছিলো, তিন, আওয়ামী লীগ তৈরি প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণার খসড়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ভুট্টো এর সাথে একমত হননি, চার, ২৫ মার্চ সামরিক অভিযানের পূর্ব পর্যন্তও শেখ মুজিব আলোচনার ইতিবাচক ফল আশা করেছেন, পাঁচ, মুজিব-ইয়াহিয়ার সম্মত ফর্মূলা গ্রহণ না করে পাপ করলো ভুট্টো, কিন্তু সামরিক হামলার শিকার হলো শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ। শেখ মুজিবের অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা জনাব রেহমান সোবহানও জনাব মওদুদের কথারই প্রতিধ্বনি করছেন। তিনি বলছেন ঃ

"ইয়াহিয়া প্রকৃতপক্ষে মুজিবের সব দাবী শুরুতেই মেনে নিয়েছিলেন। এই মেনে নেয়াটা ভুট্টোকে বিক্ষুব্ধ করেছিলো, যার ফলে তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে পৃথকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবী করলেন। এর দ্বারা

২০৯. Bangladesh : Constitutional Quest for Autonomy, Page 237-249 (Maudud Ahmad)

www.bjilibrary.com

তিনি দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভব ঘটালেন এবং গোটা পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলার শেখ মুজিবের অধিকার তিনি কেড়ে নিতে চাইলেন। পাঠান ও বেলুচরা ভুট্টোর এ মতের তীব্র বিরোধিতা করলো এবং বললো, যেহেতু এক ইউনিট হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই ভুট্টো বললে শুধু পাঞ্জাব ও সিন্ধুর পক্ষেই কথা বলতে পারেন।

এই পরস্পর বিরোধী দাবীর মুখে মুজিব কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকারের সম্ভাবনার সম্মুখীন হলেন। কিন্তু কোয়ালিশন গ্রহণ করলেও তিনি ১৬৭জন সদস্য ৮৭জন সদস্যের কাছে সংখ্যা সাম্য মানতে পারেন না। সংকট উত্তরণের জন্যে একটা সমঝোতা এভাবে হলো যে, প্রদেশগুলোর ক্ষমতা সংখ্যাগুরু দলের হাতে হস্তান্তর হবে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ইয়াহিয়াই কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকবেন। কিছু পরামর্শ এমন এলো যে, দলগুলো কেন্দ্রে উপদেষ্টা পাঠাবে।....উল্লেখ্য যে, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের আন্তঃপ্রাদেশিক বিষয়গুলো কেন্দ্রের হাতে থাকবে। এটা সহ অন্যান্য সব প্রস্তাবই অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ের জন্যে। ভিন্ন ভিন্ন বৈঠকে নিজের কাজ সমাধা করার পর দুই অংশ, জাতীয় পরিষদের পূর্ব ও পশ্চিম একত্রে মিলিত হয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে যুক্ত অধিবেশনে বসবে।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, আলোচনা ভেংগে পড়েনি। প্রকৃতপক্ষে মৌল সব বিষয়েই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। .... প্রকৃতপক্ষে ২৩ মার্চের বৈঠকটাই ছিলো শেষ বৈঠক এবং একটি চূড়ান্ত বৈঠকের আহ্বান কোনোই জবাব পায়নি। গোটা সময়ে ইয়াহিয়ার তরফ থেকে কোনোই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি এবং বলেননি যে, ফায়সালার জন্যে তাঁর শর্তটা কি। সব আলোচনাই চলছিলো প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণায় আওয়ামী লীগের তৈরি খসড়া নিয়ে। এভাবে আওয়ামী লীগের কথা সবই প্রকাশ পেল, কিন্তু ইয়াহিয়া এবং তাঁর জান্তার মনোভাবটা বিশ্ববাসীর অজানাই থেকে যাচ্ছিল।

ভুট্টো তাঁর টিম নিয়ে ঢাকা এসেছিলেন এবং আলাদাভাবে প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা চালাচ্ছিলেন। আওয়ামী লীগ মনে করছিল তাদের আলোচনার ফল ইতিবাচক সিদ্ধান্তকরীই হবে। যেহেতু প্রেসিডেন্টের কাছে ভুট্টোর ব্রিফিং পুরোপুরিই ছিলো, সুতরাং এ ভয় জাগেনি যে, ভুট্টো মুজিব-ইয়াহিয়া ঐকমত্যের বিরোধিতা করেন।

২৫ মার্চের রাত ১১টায় সেনা অভিযান শুরু হলো। এর কিছু আগে ইয়াহিয়া করাচী চলে গেলেন। যুদ্ধ এসে গ্রাস করলো আলোচনাকে।

www.bjilibrary.com

ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত একটি সমাধান, যা সেদিন পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারতো, সেনাপতিদের হাতের মুঠোর মধ্যে ছিলো, কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করলো।”[২১০]

পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলো যে, তিনি কনফেডারেশনের প্রস্তাব দিয়ে প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানকেই ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। শেখ মুজিব নাকি এ লক্ষ্যেই জাতীয় পরিষদকে দুই ভাগ করে দুই শাসনতান্ত্রিক কনভেনশনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পাকিস্তান সামরিক সরকারের এ অভিযোগ যে মিথ্যা, তা উপরের আলোচনায় দেখা গেছে। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদও একথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। মুজিব নগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নীতি নির্ধারণী ভাষণে তিনি এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে সবার কাছে তুলে ধরেন। তিনি বলেন ঃ

“প্রতারণার কৌশল হিসেবেই ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সাথে আলোচনায় আপোসমূলক মনোভাব প্রদর্শন করলেন। ১৬ মার্চ থেকে যে আলোচনা শুরু হলো তাতে ইতিমধ্যে যা ঘটে গেছে তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে তাঁর আন্তরিক মনোভাব ব্যক্ত করলেন। বৈঠকে শেখ মুজিবের চার দফা শর্ত সম্পর্কে সামরিক সরকারের সুস্পষ্ট মনোভাব জানতে চাওয়া হয়েছিলো। তিনি জানালেন যে, বড় ধরনের কোনো আপত্তি তাদের নেই। এবং তিনি বললেন, উভয় পক্ষের উপদেষ্টারা নীচের চারটি পয়েন্টের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারে। উভয় পক্ষের ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত সেই চারটি পয়েন্ট হলো ঃ

(ক) সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং প্রেসিডেন্টের ঘোষণার (Presidential Proclamation) মাধ্যমে বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।

(খ) প্রদেশগুলোর ক্ষমতা প্রদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের হাতে হস্তান্তর।

(গ) ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করবেন।

---

২১০. South Asian Review, volume 4, Number 4, July, 1971 (Negotiating for Bangladesh : A participant's view-Rehman Sobhan)

www.bjilibrary.com

(ঘ) শাসনতন্ত্র চূড়ান্তকরণের আগে জাতীয় পরিষদের একক বৈঠকের আগে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যরা শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নের জন্যে পৃথক ভাবে বৈঠকে মিলিত হবে।

ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো যে কথাটা বলছেন, সত্য তার বিপরীত। ভুট্টোর দাবী পূরণের জন্যে জাতীয় পরিষদের পৃথক বৈঠকের প্রস্তাব ইয়াহিয়াই করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি দেখান যে, ৬ দফা পূর্ব পাকিস্তানের সাথে কেন্দ্রের সম্পর্ক নির্ধারণের একটা পরিকল্পনা, পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি করবে। এ কারণেই পশ্চিম পাকিস্তান ও কেন্দ্রের মধ্যে এক ইউনিট বাতিল হওয়া এবং ৬ দফার আলোকে একটা নতুন সম্পর্ক নির্মাণের সুযোগ পশ্চিম পাকিস্তানের এম. পি.দের দিতে হবে।

শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে একবার এ নীতিগত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাকি ছিলো অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে কেন্দ্রের ক্ষমতা নির্ধারণের বিষয়টাই শুধু। আরও একটা বিষয়েও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। সেটা হলো, ক্ষমতার বণ্টনটা ছয় দফার ভিত্তিতে হবে। আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, আলোচনার কোনো পর্যায়েই আলোচনা ভেংগে পড়েনি কিংবা ইয়াহিয়া বা তার টিমের তরফ থেকেও এমন ইংগিত কখনও আসেনি যে, আলোচনা অচলাবস্থায় পৌঁছেছে যা অতিক্রম করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই যে নীতিগতভাবে একমত হয়েছিলো, তা ভুট্টোর ২৫ মার্চের সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য থেকেও পরিষ্কার।

২৪ মার্চ ইয়াহিয়া ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টাদের মধ্যকার শেষ বৈঠকের পর আওয়ামী লীগ খসড়া ঘোষণা চূড়ান্ত করার জন্যে জেনারেল পীরজাদার তরফ থেকে একটা ফাইনাল বৈঠকে যোগ দেবার আহ্বানের অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু সে আহ্বান আর এলো না। তার বদলে ইয়াহিয়ার প্রধান আলোচক জনাব এম. এম. আহমদ আওয়ামী লীগকে কিছু না জানিয়েই হঠাৎ করাচীর পথে পাড়ি জমালেন।

২৫ মার্চ রাত ১১টার মধ্যে সেনাবাহিনীর লোকেরা নগরীর বিভিন্ন স্থানে তাদের অবস্থান নিতে শুরু করলো। সমসাময়িক ইতিহাসের এক নজিরবিহীন বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ঢাকার শান্তিপূর্ণ ও নিশ্চিত জনগণের উপর গণহত্যার এক সুপরিকল্পিত কর্মসূচী চাপানো হলো।

www.bjilibrary.com

ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগকে কিছুই জানালেন না, তাঁর কোনো চূড়ান্ত প্রস্তাবও আওয়ামী লীগের কাছে পেশ করলেন না।"[২১১]

ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনার শেষ মুহূর্তগুলোর আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে মুজিবের আলোচনা টিমের অন্যতম সদস্য, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ডঃ কামাল হোসেন এক দীর্ঘ সাক্ষাতকারের একটি অংশে তিনি বলেন ঃ

"২৩ মার্চ ছিলো অস্বাভাবিক একটি দিন। এ দিনটি পাকিস্তান দিবস হিসেবে পালিত হয়ে এসেছে। কিন্তু আজকের দিনটি এমন ছিল যখন হাজার হাজার বাংলাদেশী পতাকা বিক্রি হচ্ছে। মনে পড়ে, সকাল ৬টার সময় আমার অফিস থেকে খসড়া ঘোষণার সংশোধিত কপি সহ শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে যাবার পথে নওয়াবপুর রেল-ক্রসিং থেকে একটা বাংলাদেশী পতাকা কিনলাম। ৭টার দিকে আমি শেখ মুজিবের বাসায় পৌঁছলাম। বহু মিছিল এলো এবং তার বাড়ীতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হলো।

সকাল সাড়ে ১১টার দিকে আওয়ামী লীগ টিম একটি গাড়ীতে প্রেসিডেন্ট হাউজে প্রবেশ করলো। গাড়ীতে ছিলো বাংলাদেশের পতাকা। গাড়ীর এ পতাকা প্রেসিডেন্ট হাউজে মোতায়েন সৈনিকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো।

আলোচনা শুরু হলে এম. এম. আহমদ বললেন, তাঁর মতে ছয় দফা কর্মসূচী ক্ষুদ্র কয়েকটা বাস্তবমুখী পরিবর্তনসহ বাস্তবায়িত করা যাবে। জেনারেল পীরজাদা প্রস্তাব করলেন, এম. এম. আহমদ এ লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের অর্থ বিশেষজ্ঞদের সাথে বৈঠকে বসতে পারেন এবং তিনি নূরুল ইসলামের নাম করলেন। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ বিশেষজ্ঞ জনাব নূরুল ইসলাম, আনিসুর রহমান, রেহমান সোবহান এবং অন্যরা জনাব নূরুল ইসলামের বাসভবনে নিয়মিত বৈঠক করেই আসছিলেন এবং আওয়ামী লীগের সংশোধিত খসড়া ঘোষণার মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক ধারাগুলো তাদেরই সমর্থনে তৈরি। আওয়ামী লীগ টিম ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাগণ উত্থাপিত অর্থ বিশেষজ্ঞদের পৃথক মিটিং এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁদের মতে এটা ছিলো সময় ক্ষেপণকারী একটা কৌশল।

---

২১১. Press statement issued by Mr. Tajuddin Ahmad, Prime Minister of Bangladesh, on 17th April, 1971-বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯-৩১

www.bjilibrary.com

২৩ মার্চ বিকেলের বৈঠকে এম. এম. আহমদ খসড়া ঘোষণার কিছু সংশোধন ও সংযোজন সম্বলিত কয়েকটি চিরকুট হাজির করেন।

আওয়ামী লীগ টিমকে তাদের অর্থ বিশেষজ্ঞদের সাথে বসার জন্যে ছাড়া হলো। আওয়ামী লীগ অর্থ বিশেষজ্ঞদের বৈঠক অব্যাহতভাবে চলছিলো প্রফেসর নূরুল ইসলাম সাহেবের বাসভবনে। এম. এম. আহমদ উত্থাপিত সংশোধনীগুলো বৈঠকে আলোচনা করা হলো এবং বৈদেশিক মুদ্রার সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে এক এক করে নীতিমালা তৈরি হলো সরকারী পক্ষের কাছে পেশ করার জন্যে।

এ অর্থনৈতিক নীতিমালা বিষয়ে আলোচনার জন্যে আওয়ামী লীগ টিম ২৩ তারিখ বিকেলে আবার আলোচনায় ফিরে গেলো। সেখানে তারা শুনলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সারাদিন প্রেসিডেন্ট হাউজ থেকে অনুপস্থিত আছেন। নানা ঘটনা থেকে প্রমাণ হলো, ২৩ মার্চ গোটা দিনই জেনারেলরা মিটিং এ কাটিয়েছেন। ..... পরিস্থিতির এ অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, মুদ্রা ও অর্থনীতি বিষয়ে এম. এম. আহমদ আওয়ামী লীগ টিমের সাথে যে আলোচনা চালাচ্ছেন তা সময় ক্ষেপণ করে সামরিক সমাধানের পথ প্রশস্ত করার জন্যেই। ২৪ মার্চ সকাল পর্যন্ত খসড়া ঘোষণার অর্থনৈতিক ধারাগুলো এক এক করে ক্লজ বাই ক্লজ পাঠ ও পর্যালোচনা সমাপ্ত হলো। অতপর আওয়ামী লীগ টিম যখন ২৪ মার্চ বিকেলের আলোচনা বৈঠকে যোগদানের জন্যে প্রেসিডেন্ট হাউজে যাত্রা করছিলেন, তখন শেখ মুজিব ইংগিত দিলেন যে, রাষ্ট্রের নাম আমাদের 'কনফেডারেশন অব পাকিস্তান' প্রস্তাব করা উচিত। তিনি বললেন, তাঁদের আমাদের বুঝানো উচিত জনগণের যে সেন্টিমেন্ট তার কারণেই এটা প্রয়োজন। এ প্রস্তাব অংশত স্বাধীনতার জনপ্রিয় দাবীর প্রতিফলন যা বিশেষ করে গণআন্দোলনের অগ্রবাহিনী মিলিট্যান্ট যুবকরা চাইছিলো। এ প্রস্তাব যখন সরকারী পক্ষের কাছে পেশ করা হলো, তারা এর তীব্র বিরোধিতা করলো এই বলে যে, আমাদের অবস্থানের এটা মৌলিক পরিবর্তন। আমরা যুক্তি দিলাম যে, সব বিষয় ও নীতিমালা যখন ঠিক থাকছে নিছক নামের একটা পরিবর্তনে মৌলিক পরিবর্তন হয় না। মনে হলো বিচারপতি কর্নেলিয়াস আমাদের যুক্তি বুঝলেন। কিন্তু তিনি আমাদের প্রস্তাবের পাল্টা বললেন, 'কনফেডারেশন'-এর বদলে 'ইউনিয়ন' শব্দ গ্রহণ করা যেতে পারে। এরপর আওয়ামী লীগ টিম মত প্রকাশ করলো যে, মতপার্থক্যটা একটা শব্দ নিয়ে, এ মতপার্থক্যটা যদি আমরা

www.bjilibrary.com

দূর করতে না পারি, তাহলে বিষয়টার সমাধান শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার বৈঠকে হবে, যখন খসড়া ঘোষণার চূড়ান্তকরণ করা হবে।

এটা মনে হয়েছিলো, ২৪ মার্চের বিকেলের বৈঠক তাঁদের শেষ বৈঠক হবে, যেখানে আলোচনা উপসংহারে পৌঁছবে। কারণ আলোচনা চালিয়ে যাবার মতো পয়েন্ট আর কমই আছে।

২৪ মার্চ বিকেলের আলোচনা বৈঠকে খসড়া ঘোষণার সব ক্লজ ও সিডিউল এক সাথে পড়া সম্পূর্ণ হলো। আমি তখন জরুরী বিষয় হিসেবে পীরজাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, খসড়া কখন চূড়ান্ত করা হবে? আওয়ামী লীগ পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হলো, আমি ও কর্নেলিয়াসকে আজ রাতেই খসড়া ঘোষণা চূড়ান্ত করার জন্যে বসা দরকার যাতে পরের দিন সকালেই এটা ইয়াহিয়া ও মুজিবের কাছে পেশ করা যায়। কর্নেলিয়াস এ প্রস্তাবের সাথে একমত হলেন। কিন্তু জেনারেল পীরজাদা বললেন, 'না, আজ আমাদের আরও কাজ আছে, আপনারা আগামী কাল সকালে বসতে পারেন।' আমি আবার পরামর্শ দিলাম, কাল ক'টায় বৈঠক হবে তা ঠিক করা হোক।' কিন্তু জেনারেল পীরজাদা পুনরায় বাধা দিয়ে বললেন, 'এটা টেলিফোনেই ঠিক করা যাবে এবং তার সাথে এ ব্যাপারে ফোনে যোগাযোগ করা হবে।' তারপর পীরজাদা আমার দিকে ফিরে বললেন, 'কখন ঘোষণাটা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া উচিত বলে মনে করেন?' উত্তরে আমি বললাম, 'আগমী পরশুর আগেই এটা হয়ে যাওয়া উচিত।' এ সময় তাজউদ্দীন বললেন, 'আওয়ামী লীগ টিম মনে করে তারা প্রত্যেকটি বিষয়ই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, আর আলোচনার কোনো বিষয়ই অবশিষ্ট নেই। যা এখন বাকি তাহলো, খসড়া ঘোষণা শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার কাছে অনুমোদনের জন্যে পেশ করা। অনুমোদন হয়ে গেলেই প্রেসিডেন্টের ঘোষণা জারি হতে পারে।' তাজউদ্দীন-এর একথাটিকেই পরে এভাবে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ আলোচনা ভেংগে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এর মধ্যে সত্যের কোনো নাম-গন্ধ নেই। যখন বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে, তখন তো বাকি ছিলো শুধু শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার কাছে অনুমোদনের জন্যে পেশ করণার্থে খসড়া ঘোষণার চূড়ান্তকরণ করার কাজটিই।

দুর্ভাগ্যজনক ২৫ মার্চের গোটা দিন আমি পীরজাদার টেলিফোনের অপেক্ষা করেছি। কিন্তু সে টেলিফোনটি কখনই এলো না। অবশেষে ২৫ মার্চের রাত ১০টা ৩০ মিনিটের দিকে আমি উঠে বাড়ী ফেরার জন্যে শেখ

৯—

www.bjilibrary.com

মুজিবের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম, তখন শেখ মুজিব টেলিফোনটি পেলাম কিনা জিজ্ঞেস করলেন। পাইনি তা আমি তাঁকে জানালাম।"[২১২]

দেখা যাচ্ছে, ২৫ মার্চে এসে ইয়াহিয়ার আলোচক দল ও শেখ মুজিবের আলোচক দলের মধ্যে দৃশ্যত পার্থক্যটা ছিলো মাত্র পাকিস্তানের নাম নিয়ে। আওয়ামী লীগ টিম প্রস্তাব করেছিলো পাকিস্তানের নাম হবে 'কনফেডারেশন অব পাকিস্তান।' প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার টিম থেকে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়েছিলো। এ মতপার্থক্যটা ছিলো খুবই ছোট। সন্দেহ নেই, শেখ মুজিব মিলিট্যান্ট ছাত্র-যুবক যারা স্বাধীনতার দাবী তুলেছিলো তাদের শান্ত করার জন্যেই এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কোনোক্রমেই ছোট্ট এ বিরোধটা অনতিক্রম্য ছিলো না। আওয়ামী লীগ একথা বলেও ছিলো যে, বিষয়টার সমাধান উপদেষ্টা লেবেলে না হলে ইয়াহিয়া-মুজিবের শীর্ষ বৈঠকের জন্যে রেখে দেয়া যেতে পারে। যা হোক, সব বিবরণ থেকেই একথা পরিষ্কার যে, শেখ মুজিব দুই কূল রক্ষা হতে পারে এমন একটা রাজনৈতিক সমাধান আশা করছিলেন এবং এ কারণেই আমরা দেখি তিনি ২৫ মার্চ রাত সাড়ে দশটাতেও ডঃ কামাল হোসেনকে জেনারেল পীরজাদার টেলিফোন এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করছেন। কিন্তু তিনি টেলিফোনটা পেলেন না কেন ? কেন জেনারেল পীরজাদা আওয়ামী লীগ টিমের কাছে মিথ্যা কথা বললেন ? ইয়াহিয়া কেন অপেক্ষমাণ শেখ মুজিবকে কোনো কথা জানালেন না ? কেন ইয়াহিয়া জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত রাজনৈতিক সমাধানের ফর্মূলায় উভয় পক্ষ একমত হওয়ার পর তার বাস্তবায়ন না করে এবং শেখ মুজিবের কাছে চূড়ান্ত কোনো বিকল্প প্রস্তাব না দিয়ে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন ? এ প্রশ্নগুলোর জবাবের কিছুটা পাওয়া গেছে সেই সময়ে ঢাকায় কর্মরত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসার জনাব সিদ্দিক সালিকের কাছ থেকে। তিনি তাঁর 'উইটনেস টু সারেণ্ডার' (যার বাংলা অনুবাদ 'নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল') গ্রন্থে সেদিন পর্দার অন্তরালে যা ঘটেছিলো তার একটা ঘনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"প্রেসিডেন্ট বেলা ৩টায় (১৫ মার্চ) পৌছুলেন। পি এ এফ-এর স্কোয়াডন লিডার কাজী অবতরণ সেতুটি টেনে নিয়ে গেলেন। প্রেসিডেন্ট বিমান থেকে নামলেন। তাঁর ফোলা চেহারা ও সুস্বাস্থ্য সতেজদীপ্ত জীবনীশক্তির পরিচয় বহন করছিলো। তিনি রীতি অনুযায়ী কথা বলছিলেন না। তবে তাঁর কথার ধরনে আস্থা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যে

২১২. The Daily News, March, 26, 1987.

www.bjilibrary.com

বিমান চালকরা তাঁকে শ্রীলংকা ঘুরিয়ে উড়িয়ে নিয়ে এসেছিলো, তাদের প্রসংগ তুলে বলেন, 'ওরা দারুণ সাহসী ছেলে। চমৎকার কাজ দেখিয়েছে।' তারপর তিনি সবার সাথে হাত মেলালেন এমনকি আমার সাথেও। মনে হলো তাঁর বিবেক কিংবা মনের উপর কোনো বোঝা নেই। রুটিন অনুযায়ী সেনা ইউনিট পরিদর্শন কালে তাঁকে যেমন ফাঁকা মনে হয় তেমনি মনে হলো। প্রতিটি মিনিটে, প্রতিটি ঘণ্টায় এবং দিনের পর দিন ধরে আমরা যে বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে জীবন যাপন করেছি, সে সম্পর্কে তাঁর ভেতর কোনো প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন পরিলক্ষিত হলো না।"

ইতিমধ্যে চার তারকা প্লেট লাগানো একটি গাড়ী ভি আই পি-দের সামনে এসে দাঁড়ালো। জেনারেল টিক্কা খান হেলিকপ্টারের দিকে তাকিয়ে প্রেসিডেন্টকে বললেন, আপনি কি কারে যেতে চান ?

'তোমার কি সন্দেহ আছে তাতে ?' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'না তা নয়। আমি বলছিলাম, হেলিকপ্টারও তৈরি।' 'না আমি সড়ক পথেই যাব', প্রেসিডেন্ট বললেন। প্রেসিডেন্টের গাড়ীতে টিক্কা খানও উঠলেন। অন্যরাও তাঁদের গাড়ীকে অনুসরণ করলো। ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটা কোম্পানী পাহারা দিয়ে এগিয়ে চললো। বেতারে প্রেসিডেন্টের যাত্রার অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট হতে থাকলো .... 'তিনি নিরাপদে ফার্মগেট অতিক্রম করলেন .... তিনি এখন ভি আই পি ভবনের দিকে এগুচ্ছেন মোটর গাড়ীর বহর এবার প্রেসিডেন্ট হাউজে যাবার সর্বশেষ মোড় অতিক্রম করছে .... প্রেসিডেন্ট নিরাপদে তাঁর নিবাসে পৌঁছে গেছেন।' সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। একটা মস্তবড় বাধা শান্তিপূর্ণভাবে অতিক্রম করা গেল। একই দিন সন্ধায় জেনারেল ইয়াহিয়া খান স্থানীয় সিনিয়র সামরিক অফিসারদের ডেকে পাঠালেন পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্যে। জেনারেল-টিক্কা খান, খাদিম, ফরমান এবং এয়ার কমোডর মাসুদও উপস্থিত ছিলেন ঐ বৈঠকে। সেনাবাহিনীর নিজস্ব ধারায় ব্রিফিং শুরু হলো। আলোচনা এগিয়ে চললো নির্ধারিত রীতিতে। যেমন, মিশনের ব্যাখ্যা, সমস্যার গুরুত্ব (আইন-শৃঙ্খলার নিরিখে), সেনাশক্তির প্রাপ্যতা এবং বিভিন্ন এলাকায় তাদের বাটোয়ারা, ইত্যাদি বিষয়ক। সর্বশেষে আস্থাসূচক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে ব্রিফিং শেষ হলো।

ব্রিফিং এ রাজনৈতিক জটিলতা ও গভীরতার বিষয়টি প্রেসিডেন্টের সামনে তুলে ধরা হলো না। কোনো সুপারিশও করা হলো না। এ বিষয়টি কেন বাদ পড়লো, তা জানতে চেয়েছিলাম একজন সিনিয়র অফিসারের

www.bjilibrary.com

কাছে। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট এ নিয়ে কিছুই জানতে চাননি। এ ব্যাপারে তাঁর উপদেশকরা রয়েছেন। তাঁদের বিশ্লেষণের উপরই নির্ভর করছেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজনের মতামতের জন্য তিনি থোড়াই কেয়ার করেন।

ব্রিফিং শেষে প্রেসিডেন্ট বলেন, ভাবনার কিছু নেই। মুজিবের ব্যবস্থা কালকেই করছি আমি। তাঁকে আমার মনের ইচ্ছা একটুখানি জানিয়ে দেব। শীতল চেহারা দেখাব এবং তাঁকে দ্বিপ্রাহরিক ভোজেও আমন্ত্রণ জানাবো না। এরপর পরের দিন আমি তাঁর সাথে দেখা করবো এবং এতে তাঁর মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সেটা দেখবো। যদি সে ভালো ব্যবহার না করে, তাহলে এর জবাব কি দিতে হবে–তা আমি জানি।

প্রেসিডেন্টের কথা শেষ হতেই নীরবতা নেমে এলো। একটি অস্বস্তিজনক মুহূর্ত। এ সময় দীর্ঘকায় ঋজু দেহের পেশীবহুল এক ব্যক্তি ঘাড় উঁচু করে দাঁড়ালেন এবং কিছু বলার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। মাথা নেড়ে তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো। তিনি মুখ খুললেন, "স্যার অবস্থা খুবই নাজুক। মুখ্যত এটা একটি রাজনৈতিক ব্যাপার এবং রাজনৈতিক ভাবেই এর সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। নইলে হাজার হাজার নিরপরাধ নারী, পুরুষ এবং শিশু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। .... ইয়াহিয়া গভীর মনোযোগের সাথে শুনছিলেন এবং অন্যরা শুনছিলেন দুরু দুরু বক্ষে। প্রেসিডেন্ট মাথা নাড়লেন। যেন চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন, এমনি স্বরে বললেন, 'মিঠঠি, আমি সেটা জানি আমি জানি।' মেঠঠি (মেজর জেনারেল মিঠা খান) বসে পড়লেন। কয়েকদিন পর তাঁর দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেয়া হলো। পরবর্তীতে তিনি শুধু নিজ মনোবলের উপরই টিকে ছিলেন। সভা ভেংগে গেলো। এটাই ছিলো ঢাকাতে ইয়াহিয়া খানের সর্বশেষ সামরিক সম্মেলন। এরপর তিনি তাঁর রাজনৈতিক কার্যক্রমের দিকে মুখ ফেরালেন।

পরের দিন প্রেসিডেন্ট হাউজে মুজিবের সাথে তিনি দেখা করলেন। দুজনের কোনো সাহায্যকারী ছিলো না। মনে করা হলো, ভাঙ্গা সম্পর্ক জোড়া লাগানোর জন্যে এটা একটা ঘরোয়া পদক্ষেপ। মুজিব যে তাঁর হাতার ভাঁজে কিছু রেখেছেন, এ আবিষ্কার করতে তাঁর বেশী সময় লাগলো না। কেননা, নির্বাচন পূর্বকালে তিনি প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবাবলীতে যেভাবে খোলা মন নিয়ে সাড়া দিয়েছিলেন, এবার সে রকম হলেন না। প্রেসিডেন্ট নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লেন। ....

www.bjilibrary.com

মূলত মাসের প্রথম পনের দিনেই সমঝোতামূলক সমাধানের সাধারণ ভিত্তি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। এ সময়টিতে মুজিব শক্ত হাতে প্রদেশটি শাসন করলেন। বেসামরিক প্রশাসন ও জনগণের উপর তাঁর নিরংকুশ আধিপত্য ছিলো। তাঁর এ ক্ষমতার পিছনে সমর্থন যুগিয়েছিলো গত নির্বাচনে জনগণের দেয়া শক্তিশালী ম্যাণ্ডেট। কেন তাহলে মুজিব স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ভাগাভাগি করবেন ? তিনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত একজন অতিথির জন্যে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিতে পারেন–যদি ঐ অতিথি তাঁর খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদনে পাল্টা সাড়া দেন।

অন্যদিকে জেনারেল ইয়াহিয়া তখনো এ বিশ্বাসে অনড় যে, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কেননা, তিনি একাধারে প্রেসিডেন্ট, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার ইন-চীফ। কেন তিনি একজন আঞ্চলিক নেতাকে স্থান করে দেবেন যতক্ষণ তিনি তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সুবিধা লাভ না করছেন ? মৌলিক বিরোধ ছিলো এখানেই। দুজনেই ভিন্নমুখী অবস্থান থেকে কথা বলছিলেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্পর্কে ভাবছিলেন যে, তাঁকেই সুবিধাদানের জন্যে বলা হচ্ছে।

১৭ মার্চ ইয়াহিয়া ও মুজিব পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে আলোচনায় বসলেন। সে এক কঠিন বৈঠক। আপোস রফার ক্ষেত্রে দু পক্ষই লক্ষণীয় কোনো মতামত তুলে ধরলেন না।

বৈঠক শেষ হবার পর মুজিব প্রেসিডেন্ট হাউজ থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর গাড়ীতে কালো পতাকা উড়ছিলো। অপেক্ষমান সাংবাদিকরা তাঁকে গেটে থামাল। আমিও উপস্থিত ছিলাম সেখানে। কিন্তু আমার ইউনিফর্মের প্রতি মুজিব লক্ষ্য করলেন না। মনে হলো, তিনি ভারাক্রান্ত এবং উদ্বিগ্ন। আমি তাঁর বাঁ কাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। চেহারা মলিন ও বিমর্ষ। তাঁর দেহে কম্পন ছিলো। উত্তেজনায় কাঁপছিলো ঠোঁট।

ক্যান্টনমেন্টে এসে জানতে পারলাম জিওসি জেনারেল খানের কাছে গেছেন দিনের ফলাফল জানতে। জেনারেল টিক্কা খান তাঁকে বলেন, 'খাদিম (জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম রাজা), তুমি যতটুকু জান, আমিও ততটুকই জানি।' 'কিন্তু স্যার', খাদিম রাজা বললেন, 'কোনো রকম অসতর্কতা যাতে আপনাকে গ্রাস করতে না পারে সে জন্যে অকুস্থলের ব্যক্তি হিসেবে ঘটনার গতিধারার সাথে সংযোগ রাখার অধিকারী ব্যক্তি

www.bjilibrary.com

তো একমাত্র আপনিই।' এর কিছুক্ষণ পর জেনারেল টিক্কা খানের স্টাফ কার প্রেসিডেন্ট হাউজে প্রবেশ করলো। ইয়াহিয়া খান আলোচনার বিবরণী দানকালে বললেন, 'হারামজাদাটা ভালো ব্যবহার করলো না। তুমি তৈরি হয়ে যাও।' রাত দশটায় টিক্কা খান জিওসিকে টেলিফোন করলেন। বললেন, 'খাদিম তুমি এগিয়ে যেতে পারো।' এর অর্থ এভাবে ধরে নেয়া হলো, সামরিক কার্যক্রম শুরু করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কাগজপত্র তৈরি করা যেতে পারে। কেননা সেনাবাহিনী সবসময় তৈরি থাকে। কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি রাজনৈতিক আলোচনা ধারার উপর নির্ভরশীল। ঢাকার সেনা কর্তৃপক্ষ সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে প্রেসিডেন্টের উপর চাপ সৃষ্টি করেনি। এরা তখনো রাজনৈতিক সমাধানের আশায় ছিলো। সে প্রচেষ্টা প্রেসিডেন্ট হাউজে নেয়া হয়। জোরের সাথে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রস্তুতি কখনো নিশ্চিত করে ইচ্ছাকে ব্যক্ত করে না। .... কয়েকজন বিদেশী লেখক বলেছেন, ঢাকা আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করা হয় সামরিক শক্তি সংগঠন ও পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত করার জন্যে। আসলে এ হচ্ছে সবচেয়ে বাজে, বিদ্বেষপরায়ণ এবং ভিত্তিহীন সংবাদ সূত্রের যুক্তি। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যে, মুজিবের ডি-ফ্যাক্টো শাসনকালে কোনো অতিরিক্ত সৈন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় আসেনি কিংবা পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরেও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়নি। উপরন্তু, সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারটি দশ দিনের বেশী (১৫ মার্চে ইয়াহিয়ার আগমন থেকে ২৫ মার্চের হামলা পর্যন্ত) লাগেনি। মূলত দশ ঘণ্টার বেশী সময় লাগেনি। ....

২০ মার্চ বিকেলে ফ্লাগ স্টাফ হাউজে জেনারেল হামিদ ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের সামনে হাতে লেখা পরিকল্পনাটি পড়া হলো। দুজনেই পরিকল্পনাটির প্রধান প্রধান বিষয়গুলো অনুমোদন করলেন। কিন্তু জেনারেল হামিদ বাঙালী সৈনিকদের নিরস্ত্রীকরণের ধারাটি বাতিল করে দেন। কেননা, তাঁর মতে, 'এ ধারাটি বিশ্বের একটি অন্যতম চমৎকার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করবে। .... পরে প্রসিডেন্ট পরিকল্পনার একটি মৌলিক ধারা বাতিল করে দেন। নির্ধারিত তারিখে প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠকরত আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার করতে হবে–এ বিষয়টি তিনি মেনে নেন না। প্রেসিডেন্ট বলেন, 'রাজনৈতিক সমঝোতার উপর জনগণের আস্থাকে আমি নির্মূল করতে পারি না, গণতন্ত্রের প্রতি একজন

www.bjilibrary.com

বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আমি ইতিহাসে চিহ্নিত হতে চাই না।' তাঁর হুবহু এ কথাগুলো ওই বৈঠকে উপস্থিত এক ব্যক্তি আমাকে বলেন।

অন্যদিকে মুজিবের ডি-ফ্যাক্টো কমাণ্ডার-ইন-চীফ কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) এম. এ. জি. ওসমানিও ইয়াহিয়া সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সামরিক পরিকল্পনা তৈরি করেন। তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালী সৈনিকদের সাথে গোপনে যোগাযোগ করলেন—যাতে তারা মুজিবের ডাকে সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে বেরিয়ে আসতে পারে। মেজর জেনারেল ডি. কে. পালিতের বর্ণনা অনুসারে ('The Lighting Campaign' by D. K. Palit-১৯৭১ সালের যুদ্ধের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভারত সরকার কর্তৃক বেসরকারীভাবে প্রকাশিত) নিম্নলিখিত ব্যবস্থাবলী গ্রহণের কার্যক্রম কর্নেল ওসমানির পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো ঃ

(ক) পূর্ব পাকিস্তান অবরোধের জন্যে ঢাকা বিমান বন্দর ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দখল করতে হবে।

(খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘাঁটি করে ঢাকা নগরের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করবে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনী। সশস্ত্র ছাত্ররা তাদেরকে সাহায্য করবে।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পরিত্যাগকারী ব্যক্তিরা প্রচণ্ড আঘাত হানবে ক্যান্টনমেন্ট দখলের জন্যে।

১৮ মার্চ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর উপদেষ্টাদের সাথে আওয়ামী লীগের আলোচনা সমাধানের কাছাকাছি আনতে যখন পারলো না, তখনই নতুন অগ্রগতির সংবাদ এলো। মুজিব এ সংবাদের সত্যতাকে নিশ্চিত করলেন প্রত্যক্ষভাবে। তিনি বললেন, যদি ফল না পাওয়া যায়, তাহলে তিনি আর আলোচনা চালাচ্ছেন কেন। জেনারেল টিক্কা খানকে এ ইতিবাচক অগ্রগতির সংবাদ জানানো হলো। এবং তার মাধ্যমে জানলেন মেজর জেনারেল খাদিম রাজা। ক্যান্টনমেন্ট নামক অন্ধকারময় সুড়ঙ্গের মধ্যে বসবাসকারী আমাদের মতো কয়েক জনের কাছে খবরটি ছিটেফোটা এসে পড়লো ! সুড়ঙ্গের ভেতরকার মানুষদের কাছে যা তখন পৌছেছে সম্ভবত তা অতিরঞ্জিত হয়েই আসছে। তবু ভবিষ্যত সম্পর্কে আমরা আশান্বিত হলাম। এবং আনন্দিত হলাম। কয়েকজন তাদের পরিবারবর্গকে পশ্চিম পাকিস্তান পাঠানোর পরিকল্পনা বাতিল করলো। অবশ্য আমাদের মধ্যে যারা অতিমাত্রায় বাস্তববাদী তারা পাঠিয়ে দিলো।

www.bjilibrary.com

আওয়ামী লীগের প্রস্তাবাবলীর উপরই ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠকের আলোচ্য বিষয় কেন্দ্রীভূত ছিলো। প্রস্তাবগুলো ছিলো–অনতিবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে কোনো রকমের পরিবর্তন ছাড়াই পাঁচটি প্রদেশের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা এবং আপাতত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় সরকার বহাল রাখা। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ প্রস্তাব করলো যে, গোড়াতেই জাতীয় পরিষদকে দুটি কমিটিতে ভাগ করতে হবে। দুটি কমিটি গঠিত হবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এম. এন. এ.-দের সমন্বয়ে কমিটি দুটি ইসলামাবাদ ও ঢাকাতে বৈঠক করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৃথক পৃথক রিপোর্ট তৈরি করবে। এরপর দুটো রিপোর্ট নিয়ে জাতীয় পরিষদ বৈঠকে বসবে এবং দুটোর মধ্যে একটা আপোস ফর্মুলা বের করে আনার চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র সংশোধন করে ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করে সেটা জারি করা যেতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহ তাদের স্বায়ত্তশাসনের পরিধি নির্ধারণের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনাটি প্রেসিডেন্টের এক ঘোষণার মাধ্যমে জারি করতে হবে। এর মধ্যে প্রসেডেন্ট একটা ভালো বিষয় দেখলেন। এ পরিকল্পনাটি তাঁর অবস্থানের নড়চড় করছে না। তিনি তখনো প্রেসিডেন্ট থাকছেন এবং সাহায্যের জন্যে নিজের ইচ্ছামতো প্রেসিডেন্ট উপদেষ্টা নিতে পারছেন। এর ভিত্তিতে খবরের কাগজে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতির খবর বেরুলো।

কিন্তু এ পরিকল্পনা মারাত্মক পরিণতির সম্ভাবনা বহন করছিলো। যদি সামরিক আইন তুলে নেয়া হয়, তাহলে ইয়াহিয়া সরকার আইনগত বৈধতা হারাবে এবং প্রদেশগুলো স্বাধীন সত্তা দাবী করার ব্যাপারে অবাধ অধিকার লাভ করবে। তবু প্রেসিডেন্ট মুজিবকে প্রতিশ্রুতি দিলেন এই বলে যে, এ পরিকল্পনায় ভুট্টো যদি কোনো আপত্তি না তুলেন তাহলে তিনি এটা গ্রহণ করবেন। সুতরাং ভুট্টোকে আবার ঢাকায় আসতে বলা হলো। তখনো তিনি করাচীতে ছিলেন এবং পরিস্থিতির প্রতি নজর রাখছিলেন।..... ভুট্টো ঢাকায় আসতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন, কেননা ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর বক্তব্য প্রেসিডেন্টের কাছে পরিষ্কারভাবে উত্থাপন করেছেন। অন্যদিকে সম্মেলন টেবিলে ভুট্টোর উপস্থিতির বিষয়ে মুজিব বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো যে, পূর্ব পাকিস্তানে রক্তপাতের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা রয়েছে। মুজিব যাতে তাঁর সাথে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত হন, সে

www.bjilibrary.com

বিষয়ে ভুট্টো আশ্বাস লাভের জন্যে চাপ সৃষ্টি করলেন। .... ভুট্টো এবং তাঁর মুখ্য সহচররা ২১ মার্চ ঢাকায় এলেন। প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত সততার সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত আওয়ামী লীগের পরিকল্পনার মুখ্য বিষয়গুলো ভুট্টোকে অবহিত করলেন এবং জানালেন যে, বাস্তবায়নের জন্যে তাঁর অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া ভুট্টো নিজের ভাষায় এভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ 'দুই কমিটির প্রস্তাব সম্পর্কে আমার সহকর্মীদের আমি জানালাম। তারা এ ব্যাপারে তাদের আশংকা প্রকাশ করে পরামর্শ দিলেন যে, এ প্রস্তাব আমার গ্রহণ করা উচিত হবে না। কেননা, এর ভেতর দুই পাকিস্তানের বীজ রোপিত আছে। আমরা আরো ঐকমত্যে পৌছলাম যে, এটাকে পুরোপুরিভাবে জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করতে হবে তাদের অনুমোদনের জন্যে। যে আইন সভার উপর শাসনতন্ত্র ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত-দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক নেতা সেই পুরো আইন সভার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না।" (The Great Tragedy Z. A. Bhutto) অপেক্ষমাণ অনুমোদন আর এলো না। সেই মারাত্মক ত্রিভুজ অনড় রইলো।

২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ একটি নতুন প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এলো। আগের শাসনতান্ত্রিক কমিটির প্রস্তাব পরিত্যাগ করে শাসনতান্ত্রিক কনভেনশনের প্রস্তাব দিলো। এ কনভেনশন পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে পৃথক পৃথক দুটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। জাতীয় পরিষদ এ দুটি শাসনতন্ত্র নিয়ে বৈঠকে বসবে। দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে পাকিস্তানকে একটি কনফেডারেশনে পরিণত করবে। একই দিনে ভুট্টো প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করলেন। দুজনেই এ ঐকমত্যে পৌছেন যে, সম্ভবত প্রথমবারের মতো নয় যে, আওয়ামী লীগ তার বাজির চাল ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন থেকে পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ভাঙ্গনের পদক্ষেপ নিয়েছে। জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্যে তারা যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করার চিন্তা করুন না কেন কিংবা যা-ই সিদ্ধান্ত নিন না কেন-ঘোষণা করা হলো যে, আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী তাজউদ্দীন আহমদ সন্ধ্যায় ঘোষণা করলেন, তাঁর দল চূড়ান্ত প্রস্তাব পেশ করেছে এবং এতে নতুন কিছু সংযোজন কিংবা সমঝোতামূলক কিছু করার নেই।

ভুট্টোর সহচররা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ এবং উপদেষ্টারা করাচীর পথে 'ফেরা' শুরু করলেন। ....

www.bjilibrary.com

সর্বশেষ প্রবণতা নির্ধারণে আওয়ামী লীগের নিজস্ব পদ্ধতি ছিলো। কিন্তু পরে এ দলের প্রতি সহানুভূতিশীল এক ব্যক্তি আমার কাছে অভিযোগ করে বলেন, 'আমরা এখনও আশা করছি যে, সমঝোতার চেষ্টা চলছে। বৈঠক ভেঙ্গে গেছে বলে কেউ এখনও বলেননি। অথবা এমন সতর্কবাণীও কেউ উচ্চারণ করেননি যে, আমরা সীমা অতিক্রম করছি–যেখানে আছে শুধু মৃত্যু আর ধ্বংস।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কনফেডারেশনের প্রস্তাবের পরও আপনি কি এখনও মনে করেন আশা আছে ?'

জবাবে তিনি বললেন, 'এখানেই আমরা ভুল হিসেব করেছি। আমরা ভেবেছিলাম এবং সরকারের পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে, সেনাবাহিনী নতি স্বীকার করেছে। সুতরাং আমরা চাপ দেয়া শুরু করলাম। কিন্তু পুরোপুরি ভুলে গেলাম যে, ভুট্টো ইতিমধ্যেই দৃশ্যপটে হাজির হয়েছেন।'

২৫ মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ঢাকা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন।"[২১৩]

সিদ্দিক সালিকের এ বিবরণ থেকে পরিষ্কার, প্রেসিডেন্ট একটা বদ্ধমূল ধারণা নিয়েই পূর্ব পাকিস্তানে পা দিয়েছিলেন। শেখ মুজিব দাবী আদায়ের জন্যে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন, একথা সত্য। কিন্তু জাতীয় পরিষদকে দুই কমিটিতে ভাগ করা এবং প্রদেশগুলোর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার যে অভিযোগ তা মুজিবের উপর বর্তায় না। এ দুটি বিষয়ই এসেছে প্রাথমিকভাবে ভুট্টোর কাছ থেকে। আলোচনার শেষ পর্যায়ে মুজিব পাকিস্তানের নাম 'কনফেডারেশন অব পাকিস্তান' রাখার প্রস্তাব করেছিলেন। মুজিব এটা করেছিলেন অবস্থার চাপে যার ইংগিত ডঃ কামাল হোসেনের লেখায় পাওয়া যায়। কিন্তু মুজিবের এ প্রস্তাবটাও কোনো ফাইনাল ব্যাপার ছিলো না। আওয়ামী লীগ পরিষ্কারই বলেছিলো যে, বিষয়টা ইয়াহিয়া-মুজিবের শীর্ষ বৈঠকের জন্যে রেখে দেয়া যেতে পারে। এ প্রস্তাবের পর একে 'nonnegotiable' বলা যেতে পারে না। তাজউদ্দীনের যে উক্তিকে আলোচনা ক্লোজ করার দলিল হিসেবে উপস্থিত করা হচ্ছে, তা হাস্যকর বৈ কিছু নয়। যে বৈঠকে তাজউদ্দীন ঐ কথা বলেছিলেন, সেই বৈঠকেই

২১৩. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃষ্ঠা–৭১-৮১। এ গ্রন্থের লেখক জনাব সিদ্দিক সালিক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন মেজর ছিলেন। সেই সময় তিনি ঢাকায় সেনাবাহিনীর 'গণ সংযোগ অফিসার' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

www.bjilibrary.com

আওয়ামী লীগের তৈরি খসড়া ঘোষণা চূড়ান্ত করার জন্যে ডঃ কামাল হোসেন ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পক্ষের এম. এম. আহমদের বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত হয়েছিলো। তাছাড়া মুজিব ও ইয়াহিয়ার শীর্ষ বৈঠকের কর্মসূচী তো ছিলোই। সুতরাং আওয়ামী লীগ আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছে একথা সর্বৈব মিথ্যা। বরং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকেই আলোচনার দরজা বন্ধ করে দিয়ে সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো। এর কারণ কি ছিলো ? কারণ এই ছিলো যে, প্রেসিডেন্ট একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন। তিনি মুজিবকে বাজিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন, পরখ করতে চেয়েছিলেন। ইয়াহিয়া ক্যান্টমেন্টে সেনা অফিসারদের ব্রিফিং বৈঠকে যে কথা বলেছিলেন তা একথাই প্রমাণ করে। মনে হয় তিনি কিছুটা নমনীয় ও সমঝোতামূলক মনোভাব গ্রহণ করে মুজিবকে সামনে বাড়ার সুযোগ দিয়েছিলেন, কতদূর মুজিব যেতে পারে তা দেখতে চেয়েছিলেন। শেষটা দেখার পর আলোচনা বিনা নোটিশে বন্ধ করে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের উপর সামরিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে ইয়াহিয়ার যে দর্শন ছিলো তাহলো ভুট্টোকে খুশী করা। মার্চের ৫ তারিখে রাওয়ালপিণ্ডিতে জেনারেল ইয়াহিয়া রাও ফরমানকে যে কথা ('আমার ঘাঁটি সম্পর্কে আমাকে ভাবতে হয় বাচ্চু, পশ্চিম পাকিস্তান সম্পর্কে আমাকে ভাবতে হবে, আমি তো আমার নিজের ঘাঁটি ধ্বংস করতে পারি না) বলেছিলেন তাই হলো এ দর্শনের ভিত্তি। ইয়াহিয়ার সামরিক পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি হিসেবে বলা হয়, শেখ মুজিবও সামরিক পদক্ষেপের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে ভারতের মেজর জেনারেল ডি. কে. পালিতের বিবরণকে সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড় করান হয়। প্রকৃতপক্ষে ডি. কে. পালিতের বিবরণ অস্বাভাবিক কিছু প্রমাণ করে না। ইয়াহিয়া যদি রাজনৈতিক সমাধানে না আসেন, যদি সামরিক শক্তিই প্রয়োগ করেন, তাহলে সেই পরিবেশে আত্মরক্ষার ঐ ধরনের চিন্তা অসংগত কিছু নয়। তবে ডি. কে. পালিতের বিষয়টাকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে, ঘটনা তেমন ছিলো না। বাস্তব অবস্থাই তা প্রমাণ করেছে। কর্নেল ওসমানির নেতৃত্বে শেখ মুজিবের নির্দেশ নিয়ে যদি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, বিডিআর, পুলিশ সশস্ত্র প্রতিরোধের চরম সিদ্ধান্ত নিতো, তাহলে ২৫ মার্চ রাতে অপারেশন শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঢাকার পতন ঘটা স্বাভাবিক নয়। আমাদের বাঙালী সৈনিক, বিডিআর এবং পুলিশের দৃঢ়তা ও প্রতিরোধ শক্তি যে এমন ছোট করে দেখার মতো নয় তা পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়। পঁচিশে মার্চের সেই কালো রাতে নিরস্ত্র জনগণ কার্যত কোনো প্রতিরোধই দাঁড় করাতে

www.bjilibrary.com

পারেনি। ২৫ মার্চের রাতের অন্ধকার নেমে আসার মতো সেদিন যখন সামরিক সরকারের সামরিক অভিযান আসন্ন হয়ে উঠেছিলো, তখন প্রতিবাদী জনগণ ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় গাছের গুঁড়ি, ভাঙা গাড়ি, ইত্যাদি দিয়ে ব্যারিকেট রচনা করেছিলো। কিন্তু এ প্রতিরোধ বেশীক্ষণ টেকেনি। ফার্মগেট এলাকার এ ধরনের একটা চিত্র পাওয়া গেছে ঃ রাইফেলের গুলীর কিছু শব্দ 'জয়বাংলা' শ্লোগানের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেলো। একটু পরেই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের বিস্ফোরণ বাতাসে তীক্ষ্ণ শব্দ তুললো। গগণবিদারী শ্লোগান ও গুলীর শব্দের সাথে হালকা মেশিনগানের হালকা কিচির-মিচির আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসতে থাকলো। পনের মিনিট পর গোলমালের শব্দ কমে এলো–এবং শ্লোগান ক্ষীণতর হতে হতে এক সময় থেমে গেলো। স্পষ্টতই অস্ত্র বিজয়ী হলো।'[২১৪] এ ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিলো সেদিন ঢাকার সবখানে। এটাই প্রমাণ করে ঐ ধরনের প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তুতি এবং ইচ্ছা কোনোটাই ছিলো না। কর্মী ও নেতৃবৃন্দের প্রতি শেখ মুজিবের নির্দেশও একথাই প্রমাণ করে। মুজিব ২৫ মার্চ বিকেলেই জানতে পেরেছিলেন আপোস হচ্ছে না, একটা আর্মি অপারেশন আসছে। তিনি তাঁর সহকর্মীদের তৎক্ষণাৎ ঢাকা ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। তিনি তোফায়েল, রাজ্জাক এবং অন্যান্য তরুণ নেতাদের বুড়িগঙ্গা পার হয়ে গ্রামাঞ্চলে চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২১৫] জনাব মওদুদ আহমদের ভাষায় শেখ মুজিবের ঐ নির্দেশের একাংশ ছিলো এ রকম ঃ "I was present when Mujib directed Tofail and others to leave Dacca. Mujib said, 'I an known to all, if I am arrested international powers will take up my case, but you are not known, So you must leave."[২১৬] শেখ মুজিবের একজন প্রধান উপদেষ্টা, পরবর্তীকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন ২৫ মার্চ রাত সাড়ে দশটায় শেখ মুজিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় আসেন। সাড়ে দশটা পর্যন্ত শেখ মুজিবের বাসায় বসে বসে তিনি জেনারেল পীরজাদার কাছ থেকে আলোচনার নতুন সময় নির্ধারণের অপেক্ষা করেছেন। বাসায় ফেরার সময় মুজিব তাঁর কাছে জেনারেল পীরজাদার টেলিফোন তিনি পেয়েছেন কিনা জিজ্ঞেস করেছেন, আসন্ন

---

২১৪. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল ঃ সিদ্দিক সালিক, পৃষ্ঠা–৮৫

২১৫. Bangladesh : Constitutional quest for Autonomy-Maudud Ahmed, Page-248

২১৬. Bangladesh Constitutional quest for Autonomy-Maudud Ahmed, Page-253

www.bjilibrary.com

পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো নির্দেশ তিনি দেননি। বরং মনে হয়েছে, তাদের করণীয় কিছু নেই, অবস্থার উপর তারা নিজেদের ছেড়ে দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জেনারেল তাজউদ্দীন আহমদকেও ঢাকা শহর থেকে সরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। তাজউদ্দীনকে ঢাকার শহরতলিতে আত্মগোপন করতে বলা হয় যাতে করে শীঘ্রই তারা আবার একত্রিত হতে পারেন।[২১৭] প্রতিরোধ কিংবা মুক্তি আন্দোলনের কোনো প্রস্তুতি, এমনকি কোনো পরিকল্পনাও ছিলো না আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জেনারেল তাজউদ্দীন আহমদের তৎপরতা থেকেও তা পরিষ্কার। তাজউদ্দীন আহমদ শেখ মুজিবের নির্দেশ অনুসারে ঢাকার শহরতলি এলাকাতেই আত্মগোপন করেছিলেন। কিন্তু এভাবে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কারও সাথে আলোচনা পরামর্শ ছাড়াই তখনকার করণীয় কাজ তার নিজেকেই নির্ধারণ করতে হলো। তাজউদ্দীনের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী, মুজিব নগর সরকারের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মঈদুল হাসান তাঁর মূলধারা '৭১ গ্রন্থে তখনকার চিত্র এভাবে এঁকেছেন ঃ "এক নাগাড়ে প্রায় তেত্রিশ ঘণ্টা গোলাগুলীর বিরামহীন শব্দে তাজউদ্দীনের বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি-যে অনুমানের ভিত্তিতেই তাঁকে শহরতলিতে আত্মগোপন করতে বলা হয়ে থাকুক, তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। তরুণ সহকর্মী আমিরুল ইসলামকে সাথে নিয়ে ২৭ মার্চ ঢাকা ত্যাগের আগে দলের কোনো নেতৃস্থানীয় সদস্যের সাথে আলাপ পরামর্শের কোনো সুযোগ তাজউদ্দীনের ছিলো না।[২১৮] তা সত্ত্বেও পরবর্তী লক্ষ্য ও পন্থা সম্পর্কে দুটি সিদ্ধান্ত নিতে তাঁদের কোনো বিলম্ব ঘটেনি ঃ (১) পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর সর্বাত্মক আঘাতের মাধ্যমে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তার হাত থেকে বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হলো সশস্ত্র প্রতিরোধ তথা মুক্তির লড়াই ; (২) এ সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামকে সংগঠিত করার প্রাথমিক ও অত্যাবশ্যক পদক্ষেপ হিসাবে ভারত ও অন্যান্য সহানুভূতিশীল দেশের সাহায্য-সহযোগিতা লাভের জন্য অবিলম্বে সচেষ্ট হওয়া। .... লক্ষ্য স্থির করে সসঙ্গী তাজউদ্দীন ফরিদপুর ও কুষ্টিয়ার পথে পশ্চিম বাংলার সীমান্তে গিয়ে হাজির হলেন ৩০ মার্চের সন্ধ্যায়।"[২১৯] তাজউদ্দীন ভারতে গিয়ে দেখতে পেলেন মুজিব মুক্তিযুদ্ধের

---

২১৭. মূলধারা '৭১-মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা-৯, তাজউদ্দীনের একান্ত সাক্ষাতকার, সেপ্টেম্বর, ১৯৭২
২১৮. তাজউদ্দীনের সাক্ষাতকার, সেপ্টেম্বর, ১৯৭২
২১৯. মূলধারা '৭১-মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা-৯,

www.bjilibrary.com

কোনো পরিকল্পনা প্রস্তুতি ভারতের সাথেও করে যাননি। মূলধারা '৭১-এর মঈদুল হাসান লিখছেন ঃ

"সীমান্ত অতিক্রম করার আগে কয়েকবারই তাজউদ্দীন মনে করেছিলেন হয়ত বা এ আপদকালীন পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্যে উচ্চতর পর্যায়ে কোনো ব্যবস্থা ভারত সরকারের সাথে করা হয়েছে। তাঁর একথা মনে করার বিশেষ একটি কারণ ছিলো। ৫ অথবা ৬ মার্চে শেখ মুজিবের নির্দেশে তাজউদ্দীন গোপনে সাক্ষাত করেন ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার কে. সি. সেন গুপ্তের সাথে। উদ্দেশ্য ছিলো, পাকিস্তানের শাসকেরা যদি সত্য সত্যই পূর্ব বাংলায় ধ্বংস তাণ্ডব শুরু করে, তবে সে অবস্থায় ভারত সরকার আক্রান্ত কর্মীদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান বা সম্ভাব্য প্রতিরোধ সংগ্রামে কোনো সাহায্য করবে কিনা জানতে চাওয়া। উত্তরের অন্বেষণে সেন গুপ্ত দিল্লী যান। সারা ভারত তখন সাধারণ নির্বাচন নিয়ে মত্ত। সেখানে সরকারী মনোভাব সংগ্রহ করে উঠতে উঠতে তাঁর বেশ কদিন কেটে যায় এবং ঢাকা ফেরার পর সেনগুপ্ত ১৭ মার্চ ভাসাভাসাভাবে তাজউদ্দীনকে জানান যে, ...আঘাত যদি নিতান্তই আসে, তবে ভারত আক্রান্ত মানুষের জন্যে 'সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা' প্রদান করবে। এ বৈঠকে স্থির হয়, তাজউদ্দীন শেখ মুজিবের সাথে পরামর্শের পর সেনগুপ্তের সাথে আবার মিলিত হবেন এবং সম্ভবত তখন তাজউদ্দীন সর্বশেষ পরিস্থিতির আলোকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতার প্রকার ও ধরন সম্পর্কে নির্দিষ্ট আলোচনা চালাতে সক্ষম হবেন। ২৪ মার্চ বৈঠকের কথা ছিলো। কিন্তু শেখ মুজিব এ বিষয়ে কোনো আলোকপাত করতে না পারায় এবং নির্ধারিত সময়ে তাজউদ্দীনকে অন্য জরুরী কাজে ব্যস্ত রাখায়, সেনগুপ্তের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। সীমান্ত অতিক্রমের আগে তাজউদ্দীন ভেবেছিলেন, হয়তোবা ২৪ মার্চের আলাপ অন্য কারো মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে এবং সম্ভবত এ আপদকালীন পরিস্থিতি মুকাবিলার কোনো ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করা হয়েছে।

সীমান্তে পৌঁছুবার পর তাঁর আশাভঙ্গ ঘটে। তিনি দেখতে পান, বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সেনাদের পক্ষে ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের কোনো ইচ্ছা তো নেই-ই, এমনকি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অস্ত্র গোলা-বারুদ সরবরাহের কোনো এক্তিয়ারও ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের নেই।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার একমাত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং তাজউদ্দীন চাইলে তাঁকে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাওয়ার ব্যবস্থা

www.bjilibrary.com

করে দিতে পারেন মাত্র। তাজউদ্দীন বুঝলেন, ভারতের সাথে কোনো ব্যবস্থাই নেই, কাজেই শুরু করতে হবে একদম প্রথম থেকে।"[২২০]

সুতরাং কোনো প্রকার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিহীন অবস্থায় ঢাকার জনগণ তথা দেশের মানুষ একটি সুসংবদ্ধ সশস্ত্র বাহিনীর পরিকল্পিত হামলার মুখোমুখি হয়। এর ফলে ঢাকার শুধু সহজ পতন ঘটেছিলো তা-ই নয়, খোদ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দও করণীয় সম্পর্কে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলো। এমনকি আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জেনারেল তাজউদ্দীনও নিজ বুদ্ধিতেই করণীয় ঠিক করে নিয়েছিলেন। তাঁর ভারত গমন এবং স্বাধীন সরকার গঠনের কাজও অবস্থার দাবী হিসেবে নিজ বুদ্ধিতেই করেছিলেন[২২১] আওয়ামী লীগের আশ্রয় সন্ধানী অন্যান্য নেতা

---

২২০. মূলধারা '৭১-মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা-৯-১১। মূলধারার লেখক মঈদুল হাসান এ বিবরণ তাজউদ্দীনের সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ এবং ৮ মে, ১৯৭৩-এর একান্ত সাক্ষাতকার থেকে উদ্ধৃত করেন।

২২১. "৩রা এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা শুরু করার পূর্বে আরো কয়েকটি মূল সিদ্ধান্ত তাজউদ্দীনকে নিতে হয়। তখনও তিনি দলের নেতৃস্থানীয় অপরাপর সহকর্মীর সাক্ষাত পাননি। তারা জীবিত কি মৃত, পাকিস্তানী কারাগারে বন্দী কি সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টায় রত-এমন কোনো তথ্যই তখন অবধি তাঁর কাছে পৌছায়নি। এ অবস্থায় তাঁকে স্থির করতে হয় ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলোচনাকালে তাঁর নিজের ভূমিকা কি হবে? তিনি কি শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের একজন ঊর্ধতন নেতা হিসাবে আলাপ করবেন? তাতে বিস্তর সহানুভূতি ও সমবেদনা লাভের সম্ভাবনা থাকলেও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার উপযোগী পর্যাপ্ত অস্ত্র লাভের আশা ছিলো অনিশ্চিত। বস্তুত তাজউদ্দীনের মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না যে, একটি স্বাধীন সরকার এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে সেই সরকারের দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত হওয়ার আগে, ভারত বা যে কোনো বিদেশী সরকারের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা আশা করা নিরর্থক। কাজেই 'সামরিক বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের সাথে সাথে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে যে সরকার গঠন করেন সেই সরকারের সদস্য হিসাবে তাজউদ্দীন মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় সাহায্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দিল্লী এসেছেন'-এমনতর ভূমিকায় সাহায্য সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজ হবে বলে তাজউদ্দীন মনে করেন। অন্তত পক্ষে ভারত সরকারের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা একটি অনিবর্তনীয় বিষয় হিসেবেই গণ্য হবে বলে তার ধারণা জন্মেছিলো। ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বৈঠকের আগের দিন দিল্লীতে তাঁরই এক উর্ধতন পরামর্শদাতা তাজউদ্দীনের সাথে আলোচনাকালে জানতে চান, আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যে কোনো সরকার গঠন করেছে কিনা। এ জিজ্ঞাসা ও সংশ্লিষ্ট আলোচনা থেকে তাজউদ্দীন বুঝতে পারেন, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন হয়েছে কি হয়নি সে সম্পর্কে কোনো প্রকৃত সংবাদ ভারত কর্তৃপক্ষের জানা নেই এবং সরকার গঠনের সংবাদে তাদের বিস্মিত বা বিব্রত হওয়ারও কোনো আশংকা নেই। বরং সরকার গঠিত হয়েছে জানতে পারলে 'পূর্ব বাংলার জনগণকে সাহায্য করার' জন্যে ভারতীয় পার্লামেন্ট ৩১ মার্চ যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তা এ নির্দিষ্ট ও কার্যকর রূপ গ্রহণ করতে পারে বলে তাজউদ্দীনের ধারণা জন্মায়। (তাজউদ্দীনের একান্ত সাক্ষাতকার, সেপ্টেম্বর, ১৯৭২)

এসব বিচার বিবেচনা থেকে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বৈঠকের সূচনাতে তাজউদ্দীন জানান যে, পাকিস্তানী আক্রমণ শুরুর সাথে সাথে ২৫ ও ২৬ মার্চেই বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করে একটি সরকার ঘোষণা করা হয়েছে। শেখ মুজিব সেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং মুজিব ইয়াহিয়া বৈঠকে যোগদানকারী সকল প্রবীণ সহকর্মীরাই মন্ত্রী সভার সদস্য। শেখ মুজিবের গ্রেফতারের খবর ছাড়া অন্যান্য সদস্যের ভালোমন্দ সংবাদ তখনও যেহেতু সম্পূর্ণ অজানা, সেজন্যে দিল্লীতে সমবেত দলীয় প্রতিনিধিদের পরামর্শক্রমে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে উপস্থিত করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। (বাঁকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দষ্টব্য)

www.bjilibrary.com

তাজউদ্দীনের মতোই যে যেমনভাবে, যেদিক দিয়ে পারেন দেশ ত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগ নেতা মনসুর আলী, কামারুজ্জামান এবং শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, আ. স. ম. আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ বিভিন্নভাবে বুড়িগঙ্গার ওপারে কলাতিয়ায় গিয়ে জমা হন। তারপর ৪ঠা এপ্রিল মনসুর আলী, কামারুজ্জামান, শেখ ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমদ ভারতের সারিয়াকান্দিতে পৌছান। মনসুর আলী সিরাজগঞ্জ যান পরিবার পরিজনের সন্ধানে। কামারুজ্জামান ও শেখ ফজলুল হক মণি, প্রমুখ যুবনেতা ৬ এপ্রিল কোলকাতা পৌছান।[২২২] সৈয়দ নজরুল ইসলাম ময়মনসিংহ হয়ে গারো পাহাড়ের পথে ভারত যান। খন্দকার মুশতাক অনেক পর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ঘোষিত হবার পরে ধানমণ্ডির এক নার্সিং হোম থেকে ছদ্মবেশে ভারতের আগরতলা গিয়ে পৌছান। অর্থাৎ দেশের ভেতরে কোনো কাজ নয়, আশ্রয়ের সন্ধানে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সবারই একমাত্র লক্ষ্য ছিলো ভারত পৌছা। জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া পাকিস্তানের আগ্রাসী বাহিনীকে মুকাবিলার কোনো প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা শেখ মুজিবের ছিলো না। প্রবীণ লেখক ও আওয়ামী লীগের একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি জনাব কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর 'স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতপর গ্রন্থে লিখেন, "আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের এমনিভাবে দেশ ত্যাগ করায় এটাই পরিষ্কার হয়েছিলো যে, এ ধরনের পরিস্থিতির মুকাবিলা করার জন্যে শেখ সাহেব বা আওয়ামী লীগের কোনো প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা ছিলো না। তাঁরা যদি তৎক্ষণাৎ স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুত থাকতেন, তাহলে শেখ সাহেবও পাক সেনার হাতে বন্দী হতেন না।"[২২৩]

পঁচিশ ও পঁচিশ-পূর্ব এ সকল ঘটনার বাস্তবতা সামনে রেখে শেখ মুজিব কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার পরবর্তীকালের দাবীকেও অস্বীকার করা হয়। পঁচিশ পরবর্তী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাজ ও আচরণ এবং ভারতের ভূমিকা প্রমাণ করে, তাঁরা এ ধরনের স্বাধীনতা ঘোষণার কথা জানতেন না। জিয়াউর রহমান অর্থাৎ 'মেজর জিয়া'র স্বাধীনতা ঘোষণা

তাজউদ্দীনের এ উপস্থিত সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অসামান্যভাবে শক্তি সঞ্চারিত হয়। ইন্দিরা গান্ধী 'বাংলাদেশ সরকারের' আবেদন অনুসারে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন, ফলে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অত্যন্ত সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে।" মূলধারা, '৭১ মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা-১১-১২

২২২. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-৪৮৫-৪৮৬

২২৩. স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর, কামরুদ্দীন আহমদ, পৃষ্ঠা-১২১

www.bjilibrary.com

ছাড়া অন্য কারও কথা জনগণও জানে না। সকলের কাছে মেজর জিয়াই স্বাধীনতার ঘোষক। ১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিব জানালেন, স্বাধীনতার নির্দেশনামা তিনি জহুর আহমদ চৌধুরীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।[২২৪] আরেকটা বিবরণ পাওয়া যায়, ডেভিড লোসাকের লেখা লণ্ডনে প্রকাশিত 'Pakistan Crisis' গ্রন্থ থেকে। ঐ বর্ণনা অনুসারে '(২৫ মার্চ রাতে) যখন প্রথম গুলীটি বর্ষিত হলো, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তান রেডিও'র সরকারী তরঙ্গের (ওয়েভ লেংনথ) কাছাকাছি একটি তরঙ্গ থেকে শেখ মুজিবের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। ওই কণ্ঠের বাণী মনে হয় আগেই রেকর্ড করে রাখা হয়েছিলো। তাতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রিক বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করেন।'২২৫ শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার অন্য একটি বিবরণ দিয়েছে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা 'বংগবন্ধু স্পীকস'। স্বাধীনতার এ ঘোষণাটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রচারিত হয়।[২২৬] স্বাধীনতা সংক্রান্ত এ তিনটি ঘোষণার মধ্যে স্থানকাল-পাত্র ও বক্তব্যের দিক দিয়ে অসংগতি প্রকট। শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে তাঁর যে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা উল্লেখ করেছেন তা জহুর আহমদ চৌধুরীর মাধ্যমে চট্টগ্রামের কাছাকাছি বঙ্গোপসাগরে নোঙর করা জাহাজ হতে টেকনাফ থেকে দিনাজপুর দেশের সর্বত্র এবং বন্ধুদেশগুলোতে প্রচার করা হয়।[২২৭] ডেভিড লোসাক তাঁর 'পাকিস্তান ক্রাইসিস' গ্রন্থে পূর্বে বাণীবদ্ধ স্বাধীনতা ঘোষণায় যে সময়ের কথা (যা সিদ্দিক সালিকের 'নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল' বইতে উদ্ধৃত হয়েছে) বলেছেন, সেটা হলো ২৫ মার্চের রাতে প্রথম গুলী বর্ষিত হওয়ার সময়। এ সময়টা দাঁড়ায় ২৫ মার্চের মধ্যরাত। প্রচারের মাধ্যম ছিলো বেনামী ওয়েভলেংনথ, কারণ তখন পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'বংগবন্ধু স্পীকস' পুস্তিকায় শেখ মুজিব

---

২২৪. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-৫০১

২২৫. নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, সিদ্দিক সালিক, পৃষ্ঠা-৮৫

২২৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১

২২৭. This message was communicated from Teknaf to Dinajpur and to friendly countries through some vessel which was anchored at Bay of bengal near chittagong by Mr. Zahur Ahmed choudhury."জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-৫০২

www.bjilibrary.com

কর্তৃক স্বাধীনতার যে ঘোষণাটির কথা বলা হয়েছে, তা চিটাগং থেকে সাবেক ইপিআর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। আবার পুস্তিকাটির শিরোনামায় এ ঘোষাণাটি 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে' প্রচার হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২২৮] কিন্তু সে সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়নি। স্থান-কাল-পাত্রের এ পার্থক্য ছাড়াও ঘোষণার বক্তব্যের বিরাট পার্থক্য লক্ষণীয়। ১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিব তাঁর যে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা উল্লেখ করেন, তাহলো ঃ

"A historic message from Bangbandhu Sk. Mujibur Rahman conveyed to Mr. Zahur Ahmad Chaudhury on the 25th March. 1971 at 11-30 hours immedately aftar crackdown of Pak Army :

Pak Army suddenly Sttacked EPR base at Pilkhana, Rajarbagh Police line and killing citizens. streets, battles are going of in every street of Dhaka, Chittagong. I appeal to the nations of the world for help our freedom fighters are gallantly fighting with the enimies to free the motherland. I appeal and order you all in the name of almighty Allah to fight to the last drop of blood to liberate the country. Ask Police, EPR, Bengal Regiment and Ansars to stand by you and to fight. No Compromise, Victory is ours. Drive out the last enimy from the holy soil of motherland. Convey this message to all Awami league leaders, workers and other patriots and lovers of freedom. May Allah bless you.[229]

Joy Bangla
Sk. Mujibur Rahman

---

228. "Message embodying declaration of indepndence sent by Bangabandhu Shaikh Mujibur Rahman to Chittagong shortly after midnight of 26th March, 1971 for transmission through out Bangladesh over the ex-EPR transmitter." বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১

২২৮. শিরোনাম ঃ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণা।' বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১

২২৯. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-৫০১-৫০২)

www.bjilibrary.com

২৫ মার্চ মধ্য রাতের পর শেখ মুজিব প্রেরিত স্বাধীনতার যে ঘোষণাটি চট্টগ্রাম থেকে সাবেক ই পি আর ট্রান্স মিটারের মাধ্যমে প্রচারিত হয়, তার বক্তব্য ছিলো ঃ

"This may be last message from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of the Bangladesh and final victory is achived."[২৩০]

উপরের উদ্ধৃত দুটি ঘোষণার মধ্যে পার্থক্য যে আকাশ-পাতাল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তৃতীয় আরেকটি যে ঘোষণার কথা ডেভিড লোসাকের লেখা 'পাকিস্তান ক্রাইসিস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, তার পূর্ণ বিবরণ আমাদের হাতে নেই। তবে যেহেতু সেটা পূর্বে রেকর্ড করা, তাই উপরোক্ত দুটির কোনোটিই সেটা নয় বলা যায়। অবশ্য যদি ধরে নেয়া হয় যে, ইপিআর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রেরিত ঘোষণা এবং ডেভিড লোসাকের উল্লিখিত ঘোষণা এক জিনিস, তবু একে শেখ মুজিবের ঘোষণা হিসেবে মেনে নেয়া কঠিন হয়। কারণ ১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিব যে ঘোষণাটিকে তাঁর বলে চিহ্নিত করেছেন, তার সাথে এটা মেলে না। তারপর প্রশ্ন দাঁড়ায়, আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে উল্লিখিত ঘোষণাই যদি শেখ মুজিবের প্রকৃত স্বাধীনতা ঘোষণা হয়, ইপিআর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রচারিত ঘোষণাটি এলো কোত্থেকে এবং তা 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ '-এর মতো সরকারী দলিলে স্থান পেল কেমন করে ? আর শেখ মুজিব যাকে তাঁর ঘোষণা বললেন, সেটা এ দলিলে স্থান পেল না কেন ?

এসব প্রশ্নের জবাবে বলা হচ্ছে, আসলে শেখ মুজিব স্বাধীনতার কোনো ঘোষণাই দেননি। তাঁর সে রকম কোনো পরিকল্পনা-প্রস্তুতিই ছিলো না। তাঁর পক্ষ থেকে কথিত স্বাধীনতার ঘোষণার যে মাধ্যমগুলো আমরা পাচ্ছি, তার কোনোটিই আওয়ামী লীগের নেতা বা দায়িত্বশীল কেউ নন। তাজউদ্দীনসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যাদেরকে তিনি সেই রাতে সরে থাকতে বললেন, তাঁদের কাউকেই তিনি এ ধরনের ইংগিত দেননি। যে সিদ্ধান্ত তখনও হয়নি, তা তাহলে কখন হলো ? যা হোক, এ ব্যাপারে

২৩০. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১

www.bjilibrary.com

একটা সুন্দর তথ্য দিয়েছেন জনাব অলি আহাদ। তিনি লিখেছেন, "......... বাংলা জাতীয় লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এম এম আনোয়ারের উদ্যোগে আগরতলা (ভারত) এসেম্বলি মেম্বার রেস্ট হাউজে আমার ও আওয়ামী লীগ নেতা এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য আবদুল মালেক উকিলের মধ্যে সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর এক দীর্ঘ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতারের পূর্ব মুহূর্ত অবধি কোনো নির্দেশ দান করেন নাই।" অলি আহাদ আরও লিখেন, "ইতিমধ্যে আমি সর্বজনাব আবদুল মালেক উকিল, জহুর আহমদ চৌধুরী, আবদুল হান্নান চৌধুরী, আলী আজম, খালেদ মোহাম্মদ আলী, লুৎফুল হাই প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতার সহিত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে আলোচনাকালে নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ভবিষ্যত কর্মপন্থা বা লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো নির্দেশ দিয়াছিলেন কিনা, জানিতে চাহিয়াছিলাম। তাহারা সবাই স্পষ্ট ভাষায় ও নিঃসঙ্কোচে জবাব দিলেন যে, ২৫ মার্চ পাক বাহিনীর আকস্মিক অতর্কিত হামলার ফলে কোনো নির্দেশ দান কিংবা পরামর্শ দান করা নেতার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অথচ স্বাধীনতা উত্তরকালে বানোয়াটভাবে বলা হয় যে, তিনি পূর্বাহ্নেই নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, শেখ মুজিবুর রহমানও ১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে, তিনি নির্দেশনামা জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীকে পাঠাইয়াছিলেন। .... আওয়ামী লীগ নেতাদের সাক্ষ্য অনুসারেই শেখ মুজিবুর রহমানের এ দাবী যে বিতর্কের ঊর্ধে নয় তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য একথা সত্য যে, সেদিন আমার মতো কোটি কোটি উৎকণ্ঠিত বাঙালী প্রাণ উল্লিখিত অনুরূপ একটি নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। পক্ষান্তরে সেই অন্ধকার ও চরম সংকটময় মুহূর্তে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র হইতে ভাসিয়া আসিয়াছিলো একটি নির্ভয় বীরদর্পী বিদ্রোহী কণ্ঠ। এ কণ্ঠই সেদিন লক্ষ কোটি বাঙালীকে দিয়াছিলো অভয়বাণী, ডাক দিয়াছিলো মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতে। কণ্ঠটি বেংগল আর্মীর মেজর জিয়াউর রহমানের। সময়োপযোগী নেতৃত্বদানের ব্যর্থতা ঢাকিবার জন্যই পরবর্তীকালে শেখ মুজিবুর রহমান অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্দেশ প্রদানের একটি ঘোষণাপত্র ছাপাইয়া সাধারণ্যে বিলি করিয়াছিলেন।"[২৩১]

---

২৩১. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, পৃষ্ঠা–৫০০-৫০২

www.bjilibrary.com

স্বাধীনতার ঘোষণা শেখ মুজিব দিয়েছিলেন কিনা, কিংবা কে দিয়েছিলো এ সংক্রান্ত বিতর্ক এটুকু কথার মধ্যে শেষ করা যায় না। এ নিয়ে লম্বা বিতর্ক চলে আসছে এবং তা এখনও শেষ হয়েছে বলা যাবে না। এ বিতর্কের প্রথম সূত্রপাত ঘটে জাতীয় সংসদে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতা আওয়ামী লীগের জনাব আসাদুজ্জামান মেজর রফিকুল ইসলাম লিখিত 'এ টেল অব মিলিয়নস' গ্রন্থের বরাত দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলেন এবং জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার দাবীকে মিথ্যাচার বলে উল্লেখ করেন।[২৩২] বিতর্কে অংশ নিয়ে সরকার দলীয় সদস্য লেফটেন্যান্ট কর্নেল আকবর হোসেন বললেন, 'স্বাধীনতার বিষয়ে আমরা ২৭ মার্চেই প্রথম চট্টগ্রাম বেতার থেকে তদানীন্তন মেজর জিয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা শুনতে পাই। শেখ সাহেব ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বলে যে দাবী করা হয় তা সর্বৈব মিথ্যা।[২৩৩] এভাবেই বিতর্ক শুরু হয়ে গেলো। ছড়িয়ে পড়লো সংসদের বাইরেও। আসাদুজ্জামানকে সমর্থন করে এবং কর্নেল আকবর হোসেনের বক্তব্যের বিরোধিতা করে প্রথম বিবৃতি দিলেন–এ টেল অব মিলিয়নস-এর লেখক মেজর রফিক। তিনি বললেন, তাঁর বইতে যা বলা হয়েছে তা পুরোপুরি সত্য। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র খোলা হলে আওয়ামী লীগের নেতা মরহুম আবদুল হান্নান ২৬ মার্চ দুপুর আড়াইটায় স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেন।' এ সময় জনাব আসাদুজ্জামান ও মেজর রফিকের সমর্থনে এগিয়ে এলেন আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা ও মন্ত্রী জনাব এম আর সিদ্দিকী। তিনি এক বিবৃতিতে বললেন, "২৬ মার্চের সকালে চট্টগ্রামে তিনি 'বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রেরিত বলে কথিত' একটি ওয়ারলেস মেসেজ পান। তক্ষুণি সংগ্রাম কমিটির বৈঠক ডাকা হয়। মরহুম ডঃ জাফর ঘোষণাটি বাংলায় মুসাবিদা করেন এবং কমিটি তা অনুমোদন করেন। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মরহুম এম এ হান্নানের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ঘোষণাটি তদানীন্তন রেডিও পাকিস্তানের কালুঘাট সাব-স্টেশন থেকে পাঠের ব্যবস্থা হয়। ২৬ মার্চ বিকেল ৩টায় ঘোষণাটি বেতারে প্রচার করা হয় এবং সেটা অসময় ও অপ্রত্যাশিত বলে তা অনেকেই শুনতে পাননি।"[২৩৪]

---

২৩২. বিচিত্রা, ১৭ জুলাই, ১৯৮১
২৩৩. বিচিত্রা, ১৭ জুলাই, ১৯৮১
২৩৪. বিচিত্রা, ১৭ জুলাই, ১৯৮১

www.bjilibrary.com

স্বাধীনতার দশ বছর পর এসে এ বিতর্ক শুরু হলো। অথচ স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাস এবং তারপরও কয়েক মাস পর্যন্ত স্বাধীনতা ঘোষণা কে করেছিলেন তা নিয়ে কোনো বিতর্ক দেখা দেয়নি। তখন সবাই মেনে নিয়েছিলেন, সবাই জানতেন যে, মেজর জিয়াই স্বাধীনতার ঘোষক। এ ব্যাপারে কারো মনে কোনো সংশয় ছিলো না। পরে ধীরে ধীরে নতুন কথা বলা শুরু হলো। প্রথম কথা বললেন জনৈক নূরুল আলম মন্টু। ১৯৭২ সালের ৬ মার্চ দৈনিক বাংলায় লিখিত একটা ফিচার নিবন্ধে তিনি কালুরঘাট সাব স্টেশন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে একটা নতুন কথা সামনে নিয়ে এলেন। ঐ নিবন্ধে কিভাবে কালুরঘাট সাব স্টেশনকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছিলো এবং কারা কোন্ অবস্থায় কোন্ উদ্দেশ্যে তা করেছিলেন এসব কথা বলার পর জনাব নূরুল আলম মন্টু লিখেন ঃ "ডঃ সৈয়দ আনোয়ার আলী, ওয়াপদার ইঞ্জিনিয়ার দিলীপ দাশ ও আশিকুল ইসলামকে নিয়ে ওয়াপদার একটা গাড়ীতে করে মেজর জিয়ার কাছে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তারা কয়েকজন ছাত্রের কাছে দেশবাসীর ও বিশ্ববাসীর কাছে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি আবেদনের কপি লাভ করেন। ডঃ আনোয়ার ও তাঁর বন্ধুরা এবং আরো অনেকে মিলে তখন অমানুষিক পরিশ্রমের পর প্রথমে কালুরঘাট বেতারকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করেন এবং সেখান থেকেই স্বাধীনতার বাণীটি প্রচার করা হয় ২৬ মার্চের দুপুরে।"[২৩৫] জনাব নূরুল আলম মন্টুর এ নিবন্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগঠকদের নাম থাকলেও স্বাধীনতার ঘোষকের নাম উল্লেখ নেই।

এ সম্পর্কিত আরেকটা মজার প্রবন্ধ পাওয়া গেল ১৯৮১ সালের দৈনিক বাংলার ২৬ মার্চ স্বাধীনতা সংখ্যায়। প্রবন্ধের লেখক ছিলেন জনাব নূরুল আলম মন্টু উল্লিখিত জনাব ডঃ সৈয়দ আনোয়ার আলী। এ প্রবন্ধেও জানা গেল একটি স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী পাঠ করার তাকিদেই তারা কালুরঘাট সাব স্টেশনকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। আরও জানা গেল, ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা শেখ মুজিবের নির্দেশে মরহুম হান্নানও দেননি, মেজর জিয়াও নন, দিয়েছিলেন যিনি তার নাম আবুল কাশেম সন্দীপ। তিনি তার নিবন্ধে এ কাহিনী সবিস্তারে এভাবে লিখেছেন ঃ

২৩৫. দৈনিক বাংলা, ৬ মার্চ, ১৯৭২

www.bjilibrary.com

"আগ্রাবাদ রোডে একজন লোক টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম বলে চেঁচাচ্ছিলো। আর একটা ছোট কাগজ বিলি করছিলো। গাড়ী থামিয়ে আমি একটি কাগজ সংগ্রহ করি। কাগজটা ছিলো শেখ মুজিবের নামে প্রচারিত একটা বাণী। তিনি তাতে ২৫ মার্চের ঘটনাবলী উল্লেখ করে বিশ্ববাসীর কাছে সাহায্যের ও দেশবাসীর প্রতি প্রতিরোধের নির্দেশ দিয়েছেন। টেলিগ্রামের কাগজটা আমার স্ত্রী মিসেস মঞ্জুলা আনোয়ারের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। দেখে তিনি প্রথমে উল্লসিত হয়েছিলেন। কিন্তু একটু পরেই নিরাশ হয়ে বললেন ঃ এ রকম একটা বাণী আমাদেরকে কতটা অনুপ্রাণিত করবে সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। কেননা এতে স্বাধীনতার উল্লেখ নেই। যাই হোক তিনি নিজেই উদ্যোগ নিয়ে ব্যাপক প্রচারের জন্যে সেটা বাংলায় অনুবাদ করে পাড়ার কিছু ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কার্বন কপি করাতে শুরু করেন। বাংলা অনুবাদে তিনি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটা পরিবর্তন সাধন করেছিলেন আমার সাথে আলাপ করে। আমার স্ত্রী এতে একটি ছোট্ট অথচ আকাঙ্ক্ষিত শব্দ যোগ করেছিলেন। সেটা হলো 'স্বাধীনতা'। ঘোষণাটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলো এ রকম ঃ 'বাঙ্গালী ভাই বোনদের কাছে এবং বিশ্ববাসীর কাছে আমার আবেদন। রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প ও পিলখানা ইপিআর ক্যাম্পে রাত ১২টায় পাকিস্তানী সৈন্যরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে হাজার হাজার লোককে হত্যা করেছে। হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে আমরা লড়ে যাচ্ছি। আমাদের সাহায্য প্রয়োজন এবং তা পৃথিবীর যে কোনো সূত্র থেকেই হোক। এমতাবস্থায় আমি বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করছি...................... শেখ মুজিবুর রহমান।'.................কুরআন তেলাওয়াতের পরই আমার স্ত্রী মঞ্জুলার অনুবাদ (ও পরিবর্তিত) বার্তাটি পাঠ করেন জনাব আবুল কাশেম সন্দীপ। ইংরেজী বার্তাটি পাঠ করেন ইঞ্জিনিয়ার আশিকুল ইসলাম। ফেরার পথে .... শুধু দেখেছিলাম আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান ছোট একটা কামরায় নীরবে কি যেন লিখছেন। আমি তাকে বললাম, 'আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেছি। শীঘ্রই কিছু বলুন, দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করুন।' উনি বললেন, 'আমি তাই লিখছি।' আমি তাকে বলেছিলাম, এখন লেখার সময় নয় যা মুখে আসে তাই বলুন।"[২৩৬]

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে পত্র পত্রিকায় নতুন চিন্তার পরিবেশন শুরু হলো ১৯৭২ সালের মার্চ থেকে। এরপর আওয়ামী লীগও আলোচনার

---

২৩৬. বিচিত্রা, ১৭ জুলাই, ১৯৮১

www.bjilibrary.com

আসরে অবতীর্ণ হলো। ১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিব চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরীর কাছে স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী টেলিগ্রাম যোগে পাঠিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করলেন। এই ১৯৭২ সালেই সরকারের বহির্বিভাগ প্রচার দফতর শেখ মুজিবের 'স্বাধীনতার ঘোষণা' প্রকাশ করে। ইতিপূর্বে আলোচনায় দেখিয়েছি, এ দুটি ঘোষণার মধ্যে স্থান, কাল, পাত্র, বক্তব্য, ইত্যাদি কিছুরই মিল নেই। যাই হোক, এসব থেকেই আওয়ামী লীগ মহল বলা শুরু করলো যে, ২৫ মার্চ রাতেই শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু তখনও তারা বলতে পারলো না যে, শেখ মুজিবের স্বাধীনতার সেই ঘোষণাটি কে কবে কখন চট্টগ্রাম বেতার থেকে পাঠ করেছিলেন, অথবা আদৌ পাঠ করেছিলেন কিনা। জিয়াউর রহমানের আমলে জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আসাদুজ্জামান চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার থেকে ২৬ মার্চ শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা এম এ হান্নান কর্তৃক পাঠ করার যে দাবী করলেন, তা মাত্র রফিকের 'এ টেল অব মিলিয়নস' এর উপর ভরসা করে।

'স্বাধীনতার ঘোষণা' সম্পর্কে আওয়ামী লীগের দাবী, 'এ টেল অব মিলিয়নস'-এর মেজর রফিকের এ সম্পর্কিত তথ্য, এম আর সিদ্দিকীর বিবৃতি, নূরুল আলম মণ্টু ও ডঃ সৈয়দ আনোয়ার আলীর নিবন্ধের এ সম্পর্কিত বক্তব্য, ইত্যাদি সম্পর্কে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত সংগত প্রশ্ন তুলেছেন জনাব খন্দকার আলী আশরাফ বিচিত্রায় প্রকাশিত 'স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিয়েছিলেন' শীর্ষক একটি নিবন্ধে। প্রশ্নগুলো এইঃ

(১) ডঃ আনোয়ার 'টেলিগ্রাম' বলে কথিত স্বাধীনতার ঘোষণাবিহীন ও আবেদন সমৃদ্ধ যে চিরকুটটি পেয়েছিলেন সেটা আদৌ কোনো টেলিগ্রামের কপি ছিলো কিনা আর হলেই বা তার উৎস কি ? কে কোত্থেকে সেটা পাঠিয়েছিলেন ? তাতে শেখ মুজিবের নাম থাকলেই তিনিই যে পাঠিয়েছিলেন তার প্রমাণ কি ? সেই তথাকথিত টেলিগ্রামও যে ডঃ আনোয়ার আলী ও তার পত্নী মিসেস মঞ্জুলার মতো চট্টগ্রামের কোনো দেশপ্রেমিক বা দেশপ্রেমিকদের কীর্তি নয় একথা কে বলতে পারে ? জনগণকে স্বাধীনতার লড়াই-এর উদ্বুদ্ধ করার জন্যেই হয়তো তারা সেটা করেছিলেন আর ঐ আবেদনটা শেখ সাহেবের নাম ছাড়া অন্য কারো নামে করলে তা যে মূল্যহীন হবে কে তা না জানতো ?

www.bjilibrary.com

(২) ঢাকা থেকে আদৌ যদি কোনো ঘোষণা পাঠানো হয়ে থাকে, তাহলে সেটা জহুর আহমেদ চৌধুরীর কাছে টেলিগ্রাম আকারে গিয়েছিলো, না ওয়ারলেস মেসেজ আকারে এম আর সিদ্দিকীর কাছে গিয়েছিলো ?

(৩) সেই তথাকথিত টেলিগ্রাম বা ওয়ারলেসে কি সুস্পষ্টভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা ছিলো ?

(৪) মরহুম হান্নান যে ঘোষণাটি কালুরঘাট বেতার থেকে পাঠ করেছিলেন বলে বলা হচ্ছে সেটা কি এম আর সিদ্দিকী বর্ণিত সেই ওয়ারলেস মেসেজ, নাকি নিজেই কোনো স্বাধীনতার বাণী তিনি রচনা করেছিলেন, আর তিনি কি শেখ মুজিবের নির্দেশেই তা পাঠ করেছিলেন, না অন্য কারো অনুরোধে অথবা নিজের দেশপ্রেমের আবেগে ?

(৫) শেখ মুজিবুর রহমান আদৌ চট্টগ্রামে কোনো স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়েছিলেন কিনা কিংবা বিরাজমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে টেলিগ্রাম বা ওয়ারলেস কিংবা অন্য কোনো উপায়ে কোনো বক্তব্য পাঠানো তার পক্ষে সম্ভব ছিলো কিনা ?"[২৩৭]

এ প্রশ্নগুলো উত্থাপনের পর গ্রেফতারের আগে পর্যন্ত শেখ মুজিবের পাশে ছিলেন তার এমন ঘনিষ্ঠজনদের বক্তব্য এবং বেগম মুজিবের একটি সাক্ষাতকারের দিকে ইংগিত করে জনাব খন্দকার আলী আশরাফ ঐ নিবন্ধে উপসংহার টানলেন এভাবে ঃ

"তাঁর (শেখ মুজিবের) বাসভবনে কোনো ওয়ারলেস সেটের উপস্থিতি বা তাতে কোনো মেসেজ প্রেরণের............ প্রশ্নই অবান্তর। অথচ শেখ সাহেব যদি রাত সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে কোনো ওয়ারলেস মেসেজ চট্টগ্রামে পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে সময়ের সীমাবদ্ধতা, পরিবেশের জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ হানাদার বাহিনীর হামলাজনিত বিভীষিকাময় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেটা শুধু তার বাসভবনে ওয়ারলেস সেট থাকলেই সম্ভব হতো। সুতরাং ওয়ারলেসে কোনো মেসেজ তিনি পাঠাতে পারেননি। একই কারণে কোনো লোক মারফত সেই অবস্থায় বাইরে কোথাও সেটা পাঠানো সম্ভব ছিলো না।.. বস্তুত রাত এগারটার পর থেকেই রাজধানীর সাথে দেশের অন্য সকল অংশের তার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। শুধু সরকারী চ্যানেলগুলো খোলা থাকে। কিন্তু তা তো ছিলো

২৩৭. 'স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিয়েছিলেন ?' বিচিত্রা, ১৭ জুলাই, ১৯৮১

www.bjilibrary.com

হানাদারদের হাতে। এ অবস্থায় ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে স্বাধীনতার ঘোষণা বা অন্য কোনো মেসেজ শুধু টেলিপ্যাথির মাধ্যমেই সম্ভব ছিলো।

আরো একটা বিষয় লক্ষণীয়। ডঃ আনোয়ার যে টেলিগ্রামের কপিটি আগ্রাবাদে পেয়েছিলেন তাতে রাজারবাগ ও ইপিআর বাহিনীর উপর হানাদারদের হামলার উল্লেখ ছিলো। সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন ওঠে, শেখ সাহেব যদি তার স্বাধীনতার ঘোষণা আগেই তৈরি রাখতেন, তাহলেও হানাদার বাহিনীর হামলার ফলে সৃষ্ট উত্তেজনা ও সন্ত্রাসের মুখে এক কথায় সেই চরম বিভীষিকাময় মুহূর্তে স্বাধীনতার ঘোষণায় রাজারবাগ ও ইপিআর-এর ওপর হামলার উল্লেখ সংযোজন আদৌ সম্ভব ছিলো কি ? ছিলো না।

তাহলে ঘুরে ফিরে সেই প্রশ্নটাই আবার করতে হয় ঃ জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে শেখ সাহেবের কোনো টেলিগ্রাম বা এম আর সিদ্দিকীর কাছে কোনো ওয়ারলেস মেসেজ পৌছানো সম্ভব হয়েছিলো কি ? সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে এর জবাবটা ইতিবাচক হতে পারে না।

সে ক্ষেত্রে চট্টগ্রামে স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা আবুল কাশেম সন্দীপ কিংবা মরহুম হান্নান কিংবা মেজর জিয়া যেই দিয়ে থাকুন না কেন, সেই ঘোষণার উৎসস্থল ধানমণ্ডীর ৩২ নম্বর রোড নয়। এ ব্যাপারে মেজর রফিকের বইতেও নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। তিনি তার বইতে লিখেছেন ঃ মরহুম হান্নানই প্রথমে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন।' কিন্তু সেই ঘোষণাটি ঢাকা থেকে গিয়েছিলো কিনা সে প্রশ্নে তিনি উচ্চবাচ্য করেননি। এমনকি মরহুম হান্নান যে তা বংগবন্ধুর নির্দেশে পাঠ করেছিলেন এমন ধারণাও তার বইয়ের কোথাও নেই। যদিও পত্রিকান্তরে তার সাক্ষাতকারের বিবরণে তার উদ্ধৃতি দিয়েই বলা হয়েছে যে, বংগবন্ধুর নির্দেশেই মরহুম হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। মেজর রফিক সাক্ষাতকারে এ ধরনের কোনো উক্তি করেছেন কিনা সে সম্পর্কে আমাদের মনে গভীর সংশয় আছে। বরং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার মতে, কতিপয় মুক্তিযোদ্ধার সনির্বন্ধ অনুরোধেই মরহুম হান্নান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে গিয়েছিলেন। সেখানে তার উপস্থিতির ঘটনাটি ডঃ সৈয়দ আনোয়ার আলীর লেখা থেকেও সমর্থিত হয়। পরে তিনি যদি স্বাধীনতার কোনো ঘোষণা দিয়েও থাকেন তাহলে সেটা তার নিজেরই রচনা–এম আর সিদ্দিকীর বর্ণিত ও ডঃ জাফর কর্তৃক অনূদিত, শেখ সাহেব প্রেরিত ওয়ারলেস মেসেজ নয়।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, শেখ সাহেব ওয়ারলেসে স্বাধীনতা ঘোষণা

www.bjilibrary.com

করেছিলেন, এমন দাবী শেখ সাহেব নিজেও কখনো করেননি, আওয়ামী লীগ মহল থেকেও করা হয়নি।...........

আর একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। শেখ সাহেব যদি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে থাকবেন, তাহলে তা চট্টগ্রাম কেন্দ্রে প্রচারিত হোক বা না হোক, কেন তা মুজিব নগরস্থ স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে আট মাসে একবারও প্রচারিত হলো না ? আমাদের তো মনে হয়, তেমন কোনো ঘোষণা থাকলে তা প্রতিদিন প্রতিটি অধিবেশনে প্রচারিত হতো (উত্তর কালের 'বজ্রকণ্ঠ' স্মরণীয়) এবং হওয়া উচিত ছিলো।

কেননা সেই চরম দুর্যোগের দিনে জাতিকে অনুপ্রাণিত করতে তার বাণীর চেয়ে শক্তিশালী আর কোনো অস্ত্রই ছিলো না। মুজিব নগরে তো সবাই ছিলেন। ২৫ মার্চের রাতে শেখ মুজিবের বাড়ীতে উপস্থিত নেতা ও কর্মী সবাই তো মুজিব নগর আলো করে রেখেছিলেন। এরা কেউই দুগ্ধপোষ্য অপোগণ্ড শিশু ছিলো না, বরং অনেকেই ছিলো অভিজ্ঞ, দূরদর্শী রাজনৈতিক কর্মী। তা সত্ত্বেও এদের কারো কাছেই শেখ সাহেবের দেয়া স্বাধীনতার ঘোষণার কোনো কপি ছিলো না, কারোরই কি তার ভাষা ও বক্তব্য স্মরণ ছিলো না ? স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এ নীরবতা থেকে স্বাধীনতার ঘোষণার অস্তিত্ব সম্পর্কে কি সংশয় সৃষ্টি হয় না ?

তার চেয়েও বড় কথা মুজিব নগর সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন তাতেও শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এমনকি কোনোও উল্লেখও তাতে নেই। কেন ?

শেষ করার আগে মেজর রফিকের কথায় ফিরে আসা যাক। তিনি তার সাম্প্রতিক বিবৃতিতে বলেছেন, মরহুম হান্নান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন বলে তিনি তার বইতে যে কথা বলেছেন, শেখ সাহেব বা জেনারেল জিয়া তার প্রতিবাদ করেননি।

এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য এই যে, এ ধরনের প্রতিবাদ আশা করা ঠিক নয়। কেননা, মরহুম হান্নান ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা। স্বভাবতই প্রতিবাদ জানিয়ে শেখ সাহেব তাকে হেয়প্রতিপন্ন করবেন না। আর জিয়াউর রহমান তখন দেশ রক্ষা বাহিনীতে কর্মরত। চাকরির শর্ত অনুযায়ী তার কোনো প্রকার বিবৃতি দেয়ার অধিকার ছিলো না।"[২৩৮]

২৩৮. 'স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিয়েছিলেন ?'–খোন্দকার আলী আশরাফ, বিচিত্রা, ১৭ জুলাই, ১৯৮১

www.bjilibrary.com

বস্তুত ২৫ মার্চের সেই রাতে শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, বাস্তব পরিস্থিতির যুক্তিসংগত উপসংহার বোধ হয় এটাই। এমনকি মুকাবিলার কোনো প্রস্তুতি বা ইচ্ছাও তাঁর ছিলো না, তাঁর সে সময়ের কথা ও কাজ এটাই প্রমাণ করে। যদি কোনো প্রস্তুতি থাকতো তাহলে, নেতৃবৃন্দকে সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশ না দিয়ে অমন করে স্রোতের মতো ঢাকার বাইরে ঠেলে দিতেন না। আওয়ামী লীগের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে সেদিন প্রতিরোধের ব্যাপারে যে দৃঢ়তা ছিলো, তা নেতৃত্বের মধ্যে ছিলো না। একটা স্থির সিদ্ধান্তের অভাব এবং ইচ্ছার অনুপস্থিতিরই এটা প্রমাণ। এ চরম অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যেই ২৫ মার্চের কালো রাতে টিক্কা খানের কালো থাবা নিরীহ জনগণের উপর বিস্তৃত হলো। যুক্তি ও বুদ্ধির গলা টিপে ধরলো অস্ত্র। অপ্রস্তুত ও অসংগঠিত জনশক্তির উপর অস্ত্র সাময়িকভাবে বিজয় লাভ করলো।

পঁচিশের কালো রাতে টিক্কা খানের বাহিনী আওয়ামী লীগকে টার্গেট করে রাস্তায় নেমে এলো সংগীন উঁচিয়ে। কিন্তু তাদের উঁচানো এ সংগীন আওয়ামী নেতা কর্মীদের উপর নয়, আপতিত হলো জনগণের উপর। তাদের হত্যা, অত্যাচার, সন্ত্রাস এবং ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের প্রচারণায় আতংকিত মানুষ নিরাপত্তার তাকিদে, আশ্রয়ের সন্ধানে বিপুল সংখ্যায় দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করলো।[২৩৯] প্রথম এক সপ্তাহে যারা ভারতে আশ্রয় নেয় তাদের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশী হবে না। এঁরা মূলত ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী এবং বিদ্রোহী সশস্ত্র বাহিনীর লোকজন। ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত ভারতে আশ্রয় নেয় লক্ষাধিক মানুষ। এপ্রিলের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে পাকবাহিনী তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যায়। ছড়িয়ে পড়ে হত্যা এবং সন্ত্রাসও তার সাথে। এপ্রিলের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই দেশ ত্যাগের সংখ্যা অবিশ্বাস্য হারে বেড়ে যায়। এক এপ্রিলের দ্বিতীয়ার্ধেই ১১ লাখ মানুষ ভারতে আশ্রয় নেয়। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার অভাব ছিলো এ বিপুল

---

২৩৯. একজন ভারত ফেরত রিফুজি তার অভিজ্ঞতা এভাবে লিখেছেন ঃ "The propaganda work by the Indian press and radio was grossly exaggerated and mostly misleading. But it was dressed out in such a plausible way the it was difficult not to believe it. Its real worth was however discovered only after we returned to our homeland Blood curdling stories of 'happening' in districts X made people in other districts run for safety in India. Similar stories of districts Y led the people of districts X to dash towards India."

www.bjilibrary.com

হারে দেশ ত্যাগের আরেকটি বড় কারণ।[২৪০] মে মাসে আরও ৩১ লাখ মানুষ আশ্রয়ের সন্ধানে ভারত যায়।[২৪১] অর্থাৎ মে পর্যন্ত ভারতে রিফুজি দের সংখ্যা ৪৩ লাখের মতো। ডিসেম্বর পর্যন্ত এ সংখ্যা গিয়ে আশি লাখে দাঁড়ায়।

পঁচিশের পর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ভারত গমনের পরই সেখানে স্বাধীন বাংলা সরকার গঠন হলো। অন্যদিকে কারো নির্দেশের অপেক্ষা না করে অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো বিদ্রোহী বীর বাঙালী সৈনিকরা বাঁচার একমাত্র পথ হিসেবে যে যেখানে ছিলো, সেখান থেকেই তারা স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে দিলো। ২৭ মার্চ চট্টগ্রামে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা এ সিদ্ধান্তেরই ফল।

তাজউদ্দীন দিল্লী যাওয়ার পর ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের আগে ৩রা এপ্রিল কিভাবে একক সিদ্ধান্তে স্বাধীন বাংলা সরকার গঠন করে নিজে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে সরকার গঠন অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিশেষ করে যুব নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। ৮ এপ্রিল কোলকাতার বৈঠকে তাঁর এ সিদ্ধান্ত তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হলো। ভারতীয় RAW-এর বিশেষ আশ্রয় ও অনুগ্রহপুষ্ট শেখ মণি সহ যুব নেতারা তাজউদ্দীনের সরকার গঠনের বিরোধিতা করলেন এবং প্রস্তাবিত তাঁর বেতার ভাষণ বন্ধ করার দাবী জানালেন। এই সাথে শেখ মণি উপস্থিত ৪২জন আওয়ামী নেতা ও যুব নেতার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে তাজউদ্দীনের বেতার ভাষণ বন্ধ করার জন্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক আবেদন পাঠালেন। কিন্তু তাদের আবেদন গ্রাহ্য হয়নি।[২৪২]

---

২৪০. 'Washington post'-এর সংবাদদাতা গোটা অঞ্চল সরেজমিনে দেখার পর জানান ঃ "As the special Targets of the army all most all (Hindus) have fled to India, gone into hiding in rural villages or been killed. The army Attack on Hindus have been so widespread that few have doubt that they ordered by pakistan govt, an order that many west pakistan officers and roldiers appear to have obeyed with enthusiasm ...." U. S. cogressional Record, 1971, P. 25850 (মূলধারা '৭১, পৃষ্ঠা-১৯)

২৪১. মূলধারা, '৭১, মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা-১৯

২৪২. শেখ মণি ও যুব নেতাদের পেছনে ভারত সরকার এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW-এর বিশেষ সম্পর্ক ও আনুকূল্য থাকলেও দিল্লীর একটা রাজনৈতিক মহল (বামপন্থী?) তাজউদ্দীনকে সমর্থন দিচ্ছিল। তাছাড়া এ ধরনের একটা স্বাধীন বাংলা সরকারের অস্তিত্ব তখন ভারত সরকারের জন্যে খুবই প্রয়োজন ছিল।

www.bjilibrary.com

তাজউদ্দীনের সরকার এভাবে টিকে গেল। তবে এ সরকার অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে কোনো সময়ই মুক্ত থাকেনি। খন্দকার মুশতাকের নেতৃত্বাধীন একটা বড় গ্রুপ তো তাজউদ্দীনের অজান্তে পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন ও আপোসের আলোচনা চালাচ্ছিল।[২৪৩] তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে আওয়ামী নেতা কামারুজ্জামানও একটা গ্রুপ পোষণ করতেন। আর শেখ মণি, রাজ্জাক, তোফায়েল, প্রমুখ যুব নেতাদের গ্রুপ কোনো দিনই তাজউদ্দীনের সরকারকে মেনে নেয়নি। ভারত সরকারের বিশেষ ব্যবস্থাধীনে এবং ভারতীয় গোয়েন্দা RAW-এর তত্ত্বাবধানে তারা মুজিব বাহিনী গঠন করে-যে বাহিনী তাজউদ্দীন সরকারকে বৃদ্ধাংগুলি দেখাতে পারতো এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র কেড়ে নিতে পারতো।[২৪৪]

অন্যদিকে আওয়ামী লীগের স্বাধীন বাংলা সরকার ন্যাপ, সিপিবি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী অন্য কাউকেই সরকারে নিতে রাজী হয়নি। এমনকি ফ্রন্ট গঠনেও নয়। আওয়ামী লীগের এ ভূমিকা ভারতের বামপন্থী মহল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য লাভে সমস্যা সৃষ্টি করছিলো। অবশেষে দিল্লী থেকে ডিপি ধর ২৯ আগস্ট কোলকাতা আসেন। চারদিনের চেষ্টা সত্ত্বেও কার্যকর কিছু করতে তিনি ব্যর্থ হন। এ ব্যাপারে মঈদুল হাসান তার গ্রন্থে লিখেন ঃ

"ডিপি ধরের সফরের দ্বিতীয় মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশের বামপন্থী দলসমূহকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলশক্তি আওয়ামী লীগের সাথে এমনভাবে গ্রথিত করা যাতে এ সংগ্রাম জাতীয় মুক্তি আন্দোলন রূপ লাভ করে এবং যার ফলে ভারত সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তিকে কেবলমাত্র নিরাপত্তার বর্ম হিসেবে ব্যবহার না করে বাংলাদেশকে পাকিস্তানী দখল বিলুপ্তির অন্যতম মূল সহায়ক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এ রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে বৃহত্তর ঐক্য সাধনের জন্যে ডি পি ধর অত্যন্ত স্বল্প সময়-সীমার মাঝে (অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের শেষে ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফর শুরু হবার আগে) মন্ত্রিসভার অনিচ্ছুক অংশকে ঐক্যজোট প্রস্তাবে যেভাবে সম্মত করান, তা সংশ্লিষ্ট নেতাদের বিরাগ উৎপাদন করে। .....তাঁর (ডিপি ধরের) দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পর পরই

২৪৩. মূলধারা '৭১ পৃষ্ঠা-৯৬-৯৭, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-৫০১
২৪৪. মূলধারা '৭১ পৃষ্ঠা-৮০

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা প্রস্তাবিত জাতীয় মোর্চার নির্দিষ্ট কাঠামো ও ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু এঁদেরই কোনো সদস্যের অভিমতকে প্রতিধ্বনিত করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের বিভিন্ন স্তরে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনের জন্যে ভারত সরকারের 'চাপ' এবং 'হস্তক্ষেপের' বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ গুঞ্জন শুরু হয়। এ পরিস্থিতিতে মন্ত্রিসভা জাতীয় ঐক্যজোট গঠন করেন ঠিকই, তবে এ জোটকে কোনো কার্যকরী সংগঠনের রূপ না দিয়ে নিছক এক উপদেষ্টা সংস্থার মর্যাদা দান করেন এবং এর অধিকার সীমিত করেন মুক্তি সংগ্রামের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে 'পরামর্শ' দানের মধ্যে। কিন্তু এ পরামর্শ দান প্রক্রিয়া কিভাবে বা কত নিয়মিত সংঘটিত হবে, সে বিষয়টিও সর্বাংশে অস্পষ্ট থাকে। অন্য কথায়, বৃহত্তর রণনৈতিক বিবেচনা থেকে জাতীয় মোর্চা গঠনের জন্যে ভারতের জোরাল অভিমতের কথা বিবেচনা করে মন্ত্রিসভা 'জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি' গঠনে সম্মত হলেও সাংগঠনিক অর্থে এ একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করে।"[২৪৫]

স্বাধীন বাংলা সরকারকে আওয়ামী লীগ মনোপলি করে রাখলেও মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু আওয়ামী লীগের দ্বারা শুরু হয়নি। আওয়ামী লীগ নেতারা যখন ভারতে যেতে ব্যস্ত এবং ভারতে গিয়ে সরকার গঠনের কোন্দলে ব্যাপৃত, তখন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। বিদ্রোহী বাঙালী সৈনিক, ইপিআর জোয়ান, পুলিশ ও আনসাররা অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেই প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করে দেয়। শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ 'In Side RAW : The Story of Indias Secret Service' গ্রন্থে Asoka Raina মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী চারটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন। তারা হলো ঃ এক, সর্বস্তর থেকে আসা ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সী যুবক, দুই, আওয়ামী লীগের যুব শাখার চরমপন্থী যুবকরা, তিন, ফ্রন্টিয়ার গার্ড, পুলিশ, মুজাহিদ, আনসার প্রভৃতি প্যারা মিলিশিয়ার লোক এবং চার, ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টের নিয়মিত সৈনিকরা।[২৪৬] এদের মধ্যে চতুর্থ ও তৃতীয় সশস্ত্র গ্রুপই প্রথমে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় এগিয়ে আসে। অবশিষ্ট দুটি গ্রুপ রণাংগনে আসে অনেক পরে–মে মাসের শেষ দিকে ট্রেনিং লাভ করার পর। প্রথম গ্রুপ, যাদের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের সাধারণ কর্মীরা শামিল ছিলো, তাদের ট্রেনিং হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে।

---

২৪৫. মূলধারা, '৭১, পৃষ্ঠা–৮৮-৯০

২৪৬. Inside RAW : The story of India's secret Service-Asoka Raina, Page-55

www.bjilibrary.com

কিন্তু দ্বিতীয় গ্রুপ অর্থাৎ আওয়ামী লীগের যুব শাখার চরমপন্থী যুবকরা ছিলো বিশেষ সুবিধাভোগী গ্রুপ। এদের ট্রেনিং, অস্ত্র সরবরাহ প্রভৃতি সবকিছু ছিলো, RAW-এর জেনারেল উবানের হাতে। RAW-এর তত্ত্বাবধানে দেরাদুনে এদের ট্রেনিং হয়।২৪৭ এসব থেকে একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, প্রকার ও প্রকৃতির দিক দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা একমুখী ছিলো না। বিভিন্ন ধারায় তারা বিভক্ত ছিলো। জনাব মঈদুল হাসান তাঁর 'মূলধারা-'৭১' গ্রন্থে এ ধারাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"২৬ মার্চের পর থেকে প্রথম দশ দিনের মধ্যেই এ প্রতিরোধ সংগ্রামে তিনটি স্বতন্ত্র ধারা পরিস্ফুট হয়।

প্রথম ধারা ছিলো আক্রান্ত বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইপিআর-এর সেনা ও অফিসারদের সমবায়ে গঠিত। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল বাঙালী সৈন্য ও অফিসারই যে এতে যোগ দিয়েছিলো তা নয়। অনেকে নিরস্ত্রীকৃত হয়েছে, অনেকে বন্ধী হয়ে থেকেছে, আবার অনেকে শেষ অবধি পাকিস্তানীদের পক্ষে সক্রিয় থেকেছে। মেজর জিয়ার ঘোষণা এবং বিদ্রোহী ইউনিটগুলোর মধ্যে বেতার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হবার ফলে এসব স্থানীয় ও খণ্ড বিদ্রোহ দ্রুত সংহত হতে শুরু করে। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িত হবার বিষয়টি এদের জন্যে মূলত ছিলো অপরিকল্পিত, স্বতঃস্ফূর্ত এবং উপস্থিত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এ যুদ্ধের রাজনৈতিক উপাদান সম্পর্কে এদের অধিকাংশের জ্ঞানও ছিলো সীমিত। তবু বিদ্রোহ ঘোষণার সাথে সাথে পাকিস্তানী বাহিনী সীমান্ত পর্যন্ত এমনভাবে এদের তাড়া করে নিয়ে যায় যে, এদের জন্যে পাকিস্তানে ফিরে আসার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়। হয় 'কোর্ট মার্শাল' নতুবা 'স্বাধীনতা'-এ দুটি ছাড়া অপর সকল পথই তাদের জন্যে রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এমনিভাবে পাকিস্তানী আক্রমণের এক সপ্তাহের মধ্যে স্বাধীনতার লড়াই-এ শামিল হয় প্রায় এগার হাজার বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইপিআর এর অভিজ্ঞ সশস্ত্র যোদ্ধা। কখনও কোনো রাজনৈতিক আপোস-মীমাংসা ঘটলেও দেশে ফেরার পথ যাদের জন্যে ছিলো বন্ধ যতদিন না বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানীরা সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বিতীয় ধারার সমাবেশ ও গঠন প্রথম ধারার মতো আকস্মিক, অপরিকল্পিত বা অরাজনৈতিক ছিলো না। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আওয়ামী যুব সংগঠনের চারজন নেতা শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমদ ও আবদুর রাজ্জাক সরাসরি

২৪৭. মূলধারা, '৭১, পৃষ্ঠা-৭৮-৭৯

www.bjilibrary.com

কোলকাতায় এসে পড়েন। শেখ মুজিবের বিশেষ আস্থাভাজন হিসেবে পরিচিতি এ চার যুব নেতারই আওয়ামী লীগের তরুণ কর্মীদের উপর বিশেষ প্রভাব ছিলো। বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে এ তরুণ নেতাদের ক্ষমতা অসামান্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ভারতে প্রবেশের পর থেকে তারা স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠীগত ভূমিকা গ্রহণ করে। এদের নেতৃত্বে এবং ভারতীয় বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা 'Research and Analysis Wing' (RAW)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় 'মুজিব বাহিনী' নামে প্রবাসী সরকারের নিয়ন্ত্রণে বাইরে এমন এক সশস্ত্র বাহিনীর জন্ম হয়, এক সময় যার কার্যকলাপ স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিভক্ত করে ফেলতে উদ্যত করে।.....

প্রতিরোধ যুদ্ধে তৃতীয় ধারা যদিও ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলধারায় পরিণত হয়, তবু সূচনায় তা না ছিলো বাঙালী সশস্ত্র বাহিনীর মতো অভাবিত, না ছিলো যুব ধারার মতো 'অধিকারপ্রাপ্ত'। পাকিস্তানী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে কার্যত সমগ্র আওয়ামী সংগঠন দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নেয়। আক্রমণের অভাবনীয় ভয়াবহতা, সর্বময় নেতার কারাবরণ, পরবর্তী কর্মপন্থা ও নেতৃত্ব সম্পর্কে সম্যক অনিশ্চয়তা, ইত্যাকার বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও মূলত মধ্যবিত্ত নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগ এক দুর্লভ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার কাজে প্রয়াসী হয়।"[২৪৮]

এ তিনটি ধারার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় ধারাটি পঁচিশে মার্চের সৃষ্টি। পঁচিশের রাত আমাদের বাঙালী সৈনিক ও জোয়ানদের এমন এক অবস্থানে নিক্ষেপ করে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো বিকল্প তাদের ছিলো না। স্বাভাবিকভাবেই 'ডু অর ডাই' তাদের মন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে রাজনীতি এবং নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ এমন এক অবস্থানে নিক্ষিপ্ত হলো পঁচিশের রাতে যখন ভারতে আশ্রয় নেয়া এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করা ছাড়া তাদের আর কোনো বিকল্প ছিলো না। তবে প্রথম ও তৃতীয় ধারার মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম ধারার কাছে মুক্তিযুদ্ধই ছিল শেষ কথা, কিন্তু তৃতীয় ধারার কাছে রাজনৈতিক সমাধানের একটা সম্ভাবনা ছিলো।[২৪৯] এদিক দিয়ে প্রথম

---

২৪৮. মূলধারা, '৭১, পৃষ্ঠা–৬-৮

২৪৯. স্বাধীন সরকার গঠনের ভাষণেও তাজউদ্দীন যুদ্ধের বিকল্প হিসেবে রাজনৈতিক সমাধানের একটা শর্ত পেশ করেছিলেন। স্বাধীন বাংলা সরকারের অনেকে প্রকাশ্যে এবং গোপনে

www.bjilibrary.com

ধারাটি ছিলো নিখাদ এবং তাদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও দলীয় স্বার্থ ছিলো না বলে এরাই ছিলো প্রকৃতপক্ষে জাতীয় স্বার্থের প্রতীক। যা হওয়া তৃতীয় ধারাটির পক্ষে অসম্ভব ছিলো।

রাজনৈতিক আপোসের একটা চেষ্টাও করে গেছেন। আনন্দ বাজার পত্রিকার রিপোর্টার এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত মিঃ সুখরঞ্জন দাস গুপ্ত লিখেছেন ঃ

"এবার ধীরে ধীরে ধরা পড়তে লাগলো চক্রান্তটা। মুক্তিযুদ্ধ যখন তুঙ্গে ঠিক সেই সময়ই একটি বিদেশী সংস্থার যোগসাজশে এ ষড়যন্ত্রের সূচনা। খোন্দকার এবং মেহবুব চাষী ছাড়াও এ চক্রান্তে ছিলেন কর্নেল ওশমানি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তাহের উদ্দীন ঠাকুর, ফরিদপুরের ওবায়েদুর রহমান আর শাহ মোয়াজ্জেম, মুনসিগঞ্জের ডাঃ টি. হোসেন, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত একটি খবরের কাগজের সম্পাদক মহম্মদ খালেদ প্রমুখ চাঁই। শত্রুর কবল থেকে দেশ উদ্ধারের জন্য একদিকে যখন বুকের রক্ত ঢেলে লড়াই করছে মুক্তিফৌজ, অপরদিকে তখন ওই বেইমানের দল কলকাতায় হোসেন আলির ডেরায় ঘনঘন গোপন বৈঠকে মিলিত হচ্ছে, শলাপরামর্শ করছে মুক্তিফৌজের পিছনে চাকু মারতে, খতম করতে মুক্তিযুদ্ধ।

রাতের অন্ধকারে চক্রান্তকারীরা মিলিত হতো। ওরা একটা মতলব আঁটে। বিদেশ দফতর একটা পশ্চিমীচক্রের মাধ্যমে ইয়াহিয়ার সামরিক জুন্টার সাথে যোগাযোগ করবে। জুন্টাকে বোঝাবে–'একটা ঢিলেঢালা পাক কনফেডারেশনের মধ্যেই তারা যদি বাংলাদেশকে 'পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য' দেয় তাহলে এখনও পাকিস্তানকে অটুট রাখা সম্ভব। এতে রাজি হলে এক্ষুণি যুদ্ধ বন্ধ করে আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা করা যায়।' বিদেশ দফতরের সচিব মেহবুব আলম চাষী এ প্রস্তাবটাই পাক জুন্টার কাছে পাঠায়। ওই বয়ানের সঙ্গে সে আরও জানিয়ে দেয়, জেনারেল ইয়াহিয়া এ প্রস্তাবে রাজি হলে জনাব খোন্দকার এক প্রতিনিধিদল নিয়ে যাবেন। করনেল ওশমানিও থাকবে তাঁর সঙ্গে।.........

রিলিফ দেওয়ার নাম করে ওই সব বিদেশী সংস্থা বিদেশ মন্ত্রকের অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে পড়লো। অনেকে আসে সাংবাদিক হিসাবে সংবাদ সংগ্রহের অছিলায়। কিন্তু নানা যুক্তি প্রমাণে এটা বিশ্বাস করায় অসুবিধা নেই যে, ওরা যেভাবে মেজর জিয়ার সাথে যোগাযোগ করে। ফলে বিদেশী পৃষ্ঠপোষকতায় একটা দক্ষিণপন্থী চক্র মুজিবনগরে বেশ জাঁকিয়ে বসতে পারে। এবার শুরু হ'ল তাজউদ্দীন সম্পর্কে নানা মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিব্রত করার কাজ। এমনকি, তাজউদ্দীন আর নজরুলের মধ্যে ব্যক্তিগত স্তরে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করা হ'ল কুৎসিত উপায়ে। অল্পদিনেই দলাদলিতে ভরে গেল মুজিব নগর। খোন্দকারের নির্দেশে মতলব বাজরা মিলিত হ'ত শলাপরামর্শের জন্য হোসেন আলির ডেরায়। তাহের উদ্দীন ঠাকুর আর মেহবুব চাষী করতে লাগল নানা স্থানে ছড়ানো দক্ষিণপন্থী নেতা আর সমর্থকদের সাথে সংযোগ রক্ষা। আরও একটা জবর খুশির খবর অপেক্ষা করছিলো তাদের জন্য। মুক্তি বাহিনীর নাম কা ওয়াস্তে প্রধান কর্নেল ওশমানির কাছে হাজির হয়েই তারা বুঝতে পারল সেটা। বুঝল ওই কর্নেলও সুযোগের পথ চেয়ে আছে পাশা উল্টে দেওয়ার জন্য।"–(মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্র, সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা–১১-১৬)

www.bjilibrary.com

আর দ্বিতীয় ধারাটির জন্ম পঁচিশে মার্চে নয়, তার অনেক আগে। কমপক্ষে ১৯৬৭ সাল[২৫০ক] থেকে এঁরা আওয়ামী লীগের অজ্ঞাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে কাজ করেছেন।[২০৫খ] ৩রা মার্চ এঁরাই পল্টন ময়দানে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এ ছাত্র তরুণরাই আওয়ামী লীগের আপোস আলোচনা উপেক্ষা করে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করেন।[১৫১] এদিক থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি এঁদের দাবীই ছিলো অগ্রগণ্য। সম্ভবত এ কারণেই তারা সীমান্ত অতিক্রম করার পর দাবী করতে থাকেন যে, 'সশস্ত্র বাহিনী ট্রেনিং এবং মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনার জন্যে শেখ মুজিব কেবলমাত্র তাদের চারজনের (শেখ মণি, সিরাজুল আলম, তোফায়েল, আবদুর রাজ্জাক) উপরেই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন (শেখ মুজিবের এ কথিত নির্দেশের সত্যাসত্য নিরূপণের কোনো উপায় না থাকলেও) অপর কারো উপরে নয়।'[২৫২] তবে তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ করতে হয়নি। কারণ তাদের মুজিব বাহিনী ট্রেনিং নিয়ে তৈরি হতে হতে স্বাধীনতা যুদ্ধই শেষ হয়ে যায়। নিসন্দেহে এ ধারা বিশেষ একটা চেতনা নিয়েই সবার অজান্তে এবং সন্তর্পণে বহু আগে থেকে মুক্তি সংগ্রাম শুরু করেছিলো। সেটাকে তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলা যায়। কিন্তু এ ধরনের কোনো বিশেষ চেতনা প্রথম ও তৃতীয় ধারার ছিলো না। কারণ পঁচিশের রাতে তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ায় এ ধরনের কোনো চিন্তা-ভাবনার সময় তাদের হবার কথা নয়। দেশ এবং দেশের মানুষের আশা-আকাংখা-আদর্শ যেমন, তেমনিভাবে

২৫০ক. 'স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর', কামরুদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা–১০৪

২৫০খ. '১৯৬৪ সালে আমরা কয়েকজন যুবক দেশের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। তখন আমি, সিরাজুল আলম খান ও কাজী আরেফ আহমদ 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ গড়ে তুলি। এ পরিষদকে ইংরেজীতে বলা হতো বিএলএফ। .... আমাদের বিএলএফ–ই পরে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে মে মাসে মুজিব বাহিনীতে পরিণত হয়। .... মুজিব বাহিনী ছিলো একটি রাজনৈতিক বাহিনী। এ বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিলো দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও সমাজতন্ত্রি বাংলাদেশ কায়েমের জন্যে।"(বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে বাকশাল প্রধান আবদুর রাজ্জাকের উক্তি, দৈনিক দেশ, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০)

২৫১. "চরমপন্থী ছাত্র ও যুব নেতৃবৃন্দ তাঁর (শেখ মুজিবের) সিদ্ধান্তকে দুর্বলতা মনে করলো। ছাত্ররা তখন ছাত্র সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে তাদের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত করলো। ঐ তারিখ (৩রা মার্চ) থেকেই আন্দোলন দুটো ধারায় বইতে শুরু করলো। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রধান কার্যালয় স্বাধীনতার জন্যে সর্বাত্মক লড়াই-এর প্রস্তাব গ্রহণ করলো। অন্যদিকে শেখ সাহেবের বাড়ীতে অহিংসা ও অসহযোগ নীতির ভিত্তিতে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত হলো।"–স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর, পৃষ্ঠা–১০৮

২৫২. মূলধারা, '৭১, পৃষ্ঠা–৮

www.bjilibrary.com

তাদের ভালোবেসেই তারা তাদের মুক্তির জন্যে যুদ্ধ শুরু করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জনগণের যে লক্ষ্য-ই ছিলো তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।২৫২ক

পঁচিশে মার্চের পর সৈনিক (ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট), ইপিআর, পুলিশ ও আনসাররা কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, নির্দেশ ও সমন্বয় ছাড়াই যে যার মতো লড়াই করছিলেন। যোগাযোগ ও সমন্বয়ের প্রয়োজন তারা অনুভব করলেন। তাজউদ্দীন যখন দিল্লীতে স্বাধীন বাংলা সরকার গঠন নিয়ে ব্যস্ত, তখন ৪ঠা এপ্রিল আপন তাকিদেই সেনা অফিসাররা একত্রিত হলেন সিলেট জেলার তেলিয়াপাড়া চা বাগানে। এ বৈঠকে ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত কর্নেল (অবঃ) ওসমানি, লেঃ কর্নেল আবদুর রব, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর সফিউল্লাহ, মেজর কাজী নূরুজ্জামান, মেজর নূরুল ইসলাম, মেজর মমিন চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন। আলাপ-আলোচনার পর পরিস্থিতির দাবী অনুসারে তারা সমস্ত বিদ্রোহী ইউনিটের সমবায়ে সম্মিলিত মুক্তি ফৌজ গঠন করলেন এবং কর্নেল ওসমানিকে তা পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হলো।২৫৩ ভারী অস্ত্রশস্ত্র আর গোলা-বারুদের অভাব মেটাবার জন্যে অবিলম্বে ভারতের শরণাপন্ন হবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং বিদেশ থেকে সমর সম্ভার সংগ্রহ করার জন্যে রাজনীতিকদের সমবায়ে যথাশীঘ্র স্বাধীন সরকার গঠনের আবশ্যকতাও তারা অনুভব করলেন।

এভাবে তাঁরা জাতির স্বার্থেকেই বড় করে দেখায় কে কিভাবে সরকার গঠন করলো সেদিকে তাঁরা নজর দেননি। তাজউদ্দীনের সরকার গঠন নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে কোন্দল চললেও, আওয়ামী যুব নেতারা কোন্দল চালালেও তাজউদ্দীনের সরকারকে মেনে নিতে কিন্তু কমাণ্ডাররা দ্বিধা

২৫২ক. " আজ জোর করেই বলা হচ্ছে, ১৯৭১ সালের যুদ্ধ ছিলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র ভালো কি মন্দ সে নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে। কিন্তু সেদিনের মুক্তিযোদ্ধারা এসব আদর্শের কথা ভেবে জীবন মরণ লড়াইয়ের ঝুঁকি নিতে আসেননি। আমাদের যেসব বুদ্ধিজীবি ১৯৭১-এর যুদ্ধকে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত যুদ্ধ হিসাবে ভাষ্য করতে চাচ্ছেন, তারা আসলে কেউই মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ বাজি রেখে লড়াই করতে এগোননি। এদের অনেকেই সে সময় ছিলেন ভারত সরকারের নিরাপদ আশ্রয়ে। এঁরা পেয়েছিলেন থাকার জন্যে সুন্দর বাড়ী। অন্নের কোনো চিন্তা ছিলো না এঁদের।"-(মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত'-ডঃ এবনে গোলাম সামাদ, বিক্রম, জানুয়ারী, ১৯৭৯)

২৫৩. চার মাস পরে অর্থাৎ জুলাই মাসের শেষে 'মুক্তি ফৌজ' নাম বদলিয়ে 'মুক্তি বাহিনী' করা হয়।

www.bjilibrary.com

করেনি।[২৫৪] তাজউদ্দীনের সরকার ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন এদিন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নীতি নির্ধারণী বিবৃতি

---

২৫৪. যেখানে স্বার্থ ও সুখ ভোগের প্রশ্ন থাকে, সেখানেই ভাগাভাগির দ্বন্দ্বটা তীব্র হয়ে ওঠে। ক্ষমতা ও অধিকার কুক্ষিগত করতে গিয়ে অধিকাংশ আওয়ামী লীগ ও যুব নেতারা এ নিকৃষ্ট দ্বন্দ্বেরই পরিচয় দিয়েছেন। তারা সুখে থেকে আরও সুবিধা লাভেরই সংগ্রাম করেছেন। এ সম্পর্কে মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টরের কমাণ্ডার জনাব মেজর এম এ জলিল লিখেন ঃ

"মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরগুলো পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহ করা বাঙালী তরুণ ক্যাপ্টেন, মেজর পদের অফিসার দিয়েই শুরু হয়। কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং শিবির স্থাপনের ব্যাপারে কোনো ধরনেরই অবদান রাখতে পারেনি।
এমনকি পশ্চিম বাংলার নিরাপদ এলাকায় ট্রেনিং শিবির গড়ে ওঠার পরও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে ট্রেনিং শিবিরের আশে-পাশেও দেখা যায়নি। তবে এর ব্যতিক্রম যারা ছিলেন তাদের সংখ্যা সীমিত। .... আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের এ ব্যর্থতার কারণ হিসেবে অনেকে বলে থাকেন যে, 'বেচারারা' বিচ্ছিন্নভাবে যে যেভাবে পেরেছে বর্ডার অতিক্রম করার ফলে পশ্চিম বাংলায় গিয়ে এক রকম কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায়ই এখানে-সেখানে ছুটাছুটি করেছেন। তাদের নাকি নিজেদেরই কোনোরূপ অবস্থান ছিলো না। কি করেই বা যুদ্ধের খবর নিবে ? কথাগুলো বেশ যুক্তি আছে, তবে অতটা জোরালো নয়। .... ভুরি ভুরি প্রমাণ পেয়েছি যখন তাদের দেখেছি কোলকাতার অভিজাত এলাকার হোস্টেল-রেস্টুরেন্টগুলোতে জমজমাট আড্ডায় ব্যস্ত। একাত্তরের সেই গভীর বর্ষণরত দিন-রাতে কোলকাতার অভিজাত রেস্টুরেন্টগুলোতে বসে গরম কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়ে হাঁটুতক কাদাজলে ডুবন্ত মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরগুলোতে অবস্থানরত হাজার হাজার তরুণের বেদনাহত চেহারাগুলোকে তারা একবারও দেখেছে কিনা আমার জানতে ইচ্ছা করে। আমার জানতে ইচ্ছা করে কোলকাতার পার্ক স্ট্রিটের অভিজাত নাইট ক্লাবগুলো 'বিয়ার হুইস্কি' পানরত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মনোমুকুরে একবারও ভেসে উঠেছে কিনা সেই গুলিবিদ্ধ কিশোর কাজলের কথা যে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চীৎকার করে ঘোষণা করেছে 'জয় বাংলা'। আমার জানতে ইচ্ছে করে কোলকাতায় বিশেষ এলাকায় যুবতী নারী সম্ভোগে অধীর কামাতুর ঐ সকল আওয়ামী লীগ নেতাদের মনোসরোবরে একবারও ভেসে উঠেছে কি যুদ্ধরত পূর্ব বাংলার পশু পাঞ্জাবী কর্তৃক ধর্ষিতা বাঙালী মা বোনের বীভৎস চেহারা ?
ভারতে অবস্থানকালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অনেক কিছুই জানতে চেয়েছিলেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক এবং চিত্র নির্মাতা কাজী জহির রায়হান। তিনি জেনেছিলেন অনেক কিছু, চিত্রায়িতও করেছিলেন অনেক দুর্লভ দৃশ্যের। কিন্তু অতসব জানতে বুঝতে গিয়ে তিনি বেজায় অপরাধ করে ফেলেছিলেন। স্বাধীনতার ঊষালগ্নেই সেই অনেক কিছু জানার অপরাধেই প্রাণ দিতে হয়েছে বলে ধারণা। ভারতের মাটিতে অবস্থানকালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের চুরি, দুর্নীতি, অবৈধ ব্যবসায়, যৌন কেলেংকারি, বিভিন্নরূপ ভোগবিলাস সহ তাদের বিভিন্নমুখী অপকর্মের প্রচুর প্রামাণ্য দলিল ছিলো-ছিলো সচিত্র দৃশ্য। আওয়ামী লীগের অতি সাধের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজী জহির রায়হানের এতোবড় অপরাধকে স্বার্থান্বেষী মহল কোন্ যুক্তিতে ক্ষমা করতে পারে ? .... আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৩নং আসামী স্টুয়ার্ড মুজিবেরও ঘটেছিলো একই পরিণতি। এ দায়িত্বশীল, নিষ্ঠাবান, তেজোদীপ্ত যুবক স্টুয়ার্ড মুজিব আমার ৯নং সেক্টরের অধীনে এবং পরে ৮নং সেক্টরে যুদ্ধ করেছে। তার মতো নির্ভেজাল ত্বরিতকর্মা একজন দেশপ্রেমিক যোদ্ধা সত্যিই বিরল। প্রচণ্ড সাহস ও বীরত্বের অধিকারী স্টুয়ার্ড মুজিব ছিলো শেখ মুজিবের অত্যন্ত প্রিয় ও অন্ধ ভক্ত। স্টুয়ার্ড মুজিব ভারতে অবস্থিত আওয়ামী লীগ নেতাদের অনেক কুকীর্তি সম্পর্কে ছিলো ওয়াকিফহাল। এতোবড় স্পর্ধা কি করে সইবে স্বার্থান্বেষী মহল ? তাই স্বাধীনতার মাত্র সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই ঢাকা নগরীর গুলিস্তান চত্বর থেকে হাইজ্যাক হয়ে যায় স্টুয়ার্ড মুজিব। এভাবে হারিয়ে যায় বাংলার আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।" অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা-মেজর (অবঃ) এম এ জলিল, পৃষ্ঠা-২৬-২৭)

www.bjilibrary.com

দিলেন এবং পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সংসদ সদস্য জেনারেল ওসমানিকে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হলো এবং বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে প্রত্যেক সেক্টরের জন্যে একজন করে সেক্টর কমাণ্ডার নিয়োগ করা হলো। মেজর রফিক-উল-ইসলাম, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর সফীউল্লাহ, মেজর সি আর দত্ত, মেজর শওকত আলী, বিমান বাহিনীর এম কে বাশার, মেজর কাজী নূরুজ্জামান, মেজর এম এ মঞ্জুর, মেজর এম এ জলিল, মেজর এম এ তাহের এবং মেজর জিয়াউর রহমান–এ এগারজনকে এগারটি সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হলো। এভাবে মুক্তিযুদ্ধ একটা সুসংবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করলো।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ কার্যকরী রূপ পরিগ্রহ করতে সময় লাগে। ২৬ মার্চ থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের প্রথম যে পর্যায় এ সময় ভারত কার্যত কোনো সাহায্য করেনি। আমাদের সৈনিক, ইপিআর, পুলিশরা এবং তাদের হাতে তৈরি মুক্তিযোদ্ধারা তাদের হাতে যা ছিলো তাই নিয়ে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালায়। কিন্তু প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় সর্বাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে শহর-বন্দরে তাদের অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন ছিলো। সুতরাং বাধ্য হয়ে তাদের পিছু হটতে হয়। .... মে ছিল নিদারুণ হতাশার মাস। পাকিস্তানী বাহিনীর নির্মম অভিযানের মুখে মার্চ-এপ্রিলের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম ক্রমশ থেমে যাওয়ায় দেশের ভেতরে ও বাইরে সর্বত্রই নিরুৎসাহের ভাব। মধুপুর, গোপালগঞ্জ এবং আরও দু একটা ছোট-খাটো অঞ্চল বাদে গোটা বাংলাদেশ পাকিস্তানী সেনাদের করতলগত।'[২৫৫] এ হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা থেকেই মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলো। ৩০ এপ্রিল ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার দায়িত্ব ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর হাতে অর্পণ করলো। আর ৯ মে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেয়ার দায়িত্ব তাদের হাতেই অর্পিত হলো। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধ নতুন প্রাণ পেল। আগের চেয়ে অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটলো। কিন্তু বাংলাদেশ দিল্লীর কাছে যে সর্বাত্মক সাহায্য চাচ্ছিল তা পেল না। ভারত বাংলাদেশ সরকারকে তখনও স্বীকৃতি দেয়নি। একটা রাজনৈতিক সমাধান হয়ে যায় কিনা, পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে ভারত একা পড়ে যায় কিনা ইত্যাদি চিন্তা ভারতকে দ্বিধাগ্রস্ত করছিলো। ভারতের এ দ্বিধাগ্রস্ততার কারণে মুক্তিবাহিনীর প্রয়োজনীয় শক্তিবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অন্যদিকে রাজাকার রিক্রুটের কারণে

২৫৫. মূলধারা, '৭১, পৃষ্ঠা–২২

www.bjilibrary.com

পাক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি হয়। জুলাই মাসে দেশে সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা যখন মাত্র চার হাজার, তখন সশস্ত্র রাজাকারদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো বাইশ হাজারে।২৫৬ "রাজাকার বাহিনীর তুলনামূলক সংখ্যাধিক্য, অস্ত্রশস্ত্রের সুবিধা এবং দ্রুত চলাচল ক্ষমতার দরুন এদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সীমিত অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমশ বেশ বেকায়দায় পড়ে। পাকিস্তানী বাহিনীর নির্বিচার প্রতি আক্রমণের ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের চমকপ্রদ তৎপরতা মাত্র ৫/৬ সপ্তাহের মধ্যেই হ্রাস পেতে শুরু করে।"২৫৭ এ অবস্থায় স্বাধীনতা যুদ্ধকে তীব্রতর করার জন্যে ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করা হলো। এ সময় আগস্ট মাসে ভারত-সোভিয়েতের মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো এবং ২৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরের প্রোগ্রাম স্থির হলো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সোভিয়েত সাহায্য নিশ্চিত করার জন্যে ইন্দিরার মস্কো

---

২৫৬. এ বিপুল সংখ্যায় রাজাকার রিক্রুট হওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ কাজ করেছিলো। বাংলাদেশের সবগুলো ইসলামপন্থী দলের কোনোটিই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। ফলে তাদের সমর্থকদের মধ্য থেকে একটা সংখ্যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজাকার বাহিনীতে শামিল হয়। তবে এ ধরনের আদর্শবাদী লোকদের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিলো। প্রকৃতপক্ষে 'নিয়মিত ভাতা, রেশন, স্থানীয় ক্ষমতার ব্যবহার এবং সর্বোপরি হিন্দু সম্প্রদায় সদস্যদের ঘরবাড়ী ও বিষয়-সম্পত্তি অবাধে লুটপাট ও ভোগ দখল করার' লোভে সমাজের সুযোগ-সন্ধানী এক শ্রেণীর লোক ব্যাপকহারে রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করে।-(মূলধারা, '৭১, পৃষ্ঠা-৭১)। জনাব কামরুদ্দিন আহমদ তাঁর স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় গ্রন্থে এ বিষয়ের একটা প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"বাঙ্গালীদের রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি হবার কতকগুলো কারণ ছিলো। তাহলো ঃ

(ক) দেশে তখন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিলো। সরকার সে দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে ঘোষণা করলো, যারা রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেবে, তাদের দৈনিক নগদ তিন টাকা ও তিন সের চাউল দেয়া হবে। এর ফলে বেশ কিছু সংখ্যক লোক, যারা এতোদিন পশ্চিমা সেনার ভয়ে ভীত হয়ে সন্ত্রস্ত দিন কাটাচ্ছিল, তাদের এক অংশ ঐ বাহিনীতে যোগ দান করলো।

(খ) এতোদিন পাক সেনার ভয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, আত্মরক্ষার একটি মোক্ষম উপায় হিসেবে তারা রাজাকারদের দলে যোগ দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

(গ) এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী জোর করে মানুষের সম্পত্তি দখল করা এবং পৈতৃক আমলের শত্রুতার প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ গ্রহণের জন্যেও এ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো।..........

রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি হবার পর তাদের বুঝানো হলো যে, যুদ্ধে পাক সেনারা হারলে, পাক সেনাদের সাথে সহযোগিতা করার অপরাধে মুক্তি বাহিনী তাদের সকলকে হত্যা করবে। সুতরাং জীবন রক্ষা করার জন্য মুক্তি বাহিনীর গুপ্ত আশ্রয়স্থলের সংবাদ তারা পাক সেনাদের জানিয়ে দিতে শুরু করে। ১৯৭১-এর এপ্রিল মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত ইপিআর ও পুলিশ অবাঙ্গালীদের মধ্য থেকে ভর্তি করা হতো। কারণ বাঙ্গালীদের পাক-সেনারা বিশ্বাস করতো না।"-(স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর-কামরুদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা-১২৬-১২৭)

২৫৭. মূলধারা, '৭১, পৃষ্ঠা-৭১

www.bjilibrary.com

সফরের আগে বামপন্থীদেরকে একটা 'উপদেষ্টা কমিটি'র নামে মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের সাথে শামিল হবার সুযোগ দেয়া হলো। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীতে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কর্মী ছাড়া অন্য কোনো দলের লোক নেয়া হতো না। ন্যাপ, সিপিবি'র লোকদেরকেও নয়। সেপ্টেম্বরের ১৮ তারিখ থেকে ন্যাপ, সিপিবি'র উপর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিধি-নিষেধ উঠে যায়। এ উদ্দেশ্যে দিল্লী থেকে ডিপি ধর (D. P. Dhar) আওয়ামী লীগের স্বাধীন বাংলা সরকারকে রাজী করার জন্যে কোলকাতা আসেন।[২৫৮] তবে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে মুক্তিবাহিনীতে NAP-CPB কর্মীদের রিক্রুট

---

২৫৮. কোলকাতায় ডি পি ধরের বহুমুখী ব্যস্ততা ও আলাপ-আলোচনার মাঝে যে সীমিত বিষয় নিয়ে আমার (মঈদুল হাসান) সাথে তার আলোচনা হয়, সে বিষয়ে রক্ষিত নোটের উদ্ধৃতি সে সময়ের অবস্থা উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক হতে পারে ঃ

১৭ সেপ্টেম্বর

Met D p at 8-30 am. Now that a consultative committee has been formed, restrictions against recruiting N A P-C P B workers as FF can be waived, if the pm (Bangladesh) gives the clearnce, said DP, As I mentoned that such clearance would be readily available, DP, wanted to know how many of left workers could be mobilised for recuitment and how fast. Secondly, he wanted that the clearance should be communicated to him by Tajuddin himself and if possible by tomorrow before he left Calcutta, so that necessary orders could be issued speedily

Met Tajudin at 3-30 at P. M. and told him about the clearance required by Dp ...... He asked for Group captain khondkars opinion, since the C-in-c was out of station, khondkar supported the move. He offered his transport for its use for contacting NAP camps on western sectors. On my way back to DP, I went to NAP and CPB offices, handed over the Jeep and gave necessary advice. Met DP at 5 P. M. as scheduled ... DP said that recuitment and training would begin immediately.....

১৮ সেপ্টেম্বর

Met Tajuddin at 8 am. and briefed him about the development since previous afternoon. He wanted me to keep the pressure on DP about bringing Mujib Bahini under BD command .... Met DP at 5 PM. He showed, anxiety at the decline of FF activity .... I explained the difficulty of repoliticising the occupied areas and its consequence on FF activity. He emphasised the need for better co-ordination in selecting the targets for FF operations and wanted to know if there was any insurmountable difficulty in inducing base workers in a few pre-selected areas for operations. On Mujib Bahini, he felt that his PM (Indira Gandhi) intervetion would be required as it seemed to be a ticky matter "মূলধারা, '৭১-মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা-১০৬-১০৮

www.bjilibrary.com

যথাসম্ভব সন্তর্পণে চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর মস্কো সফর করেন। তিন সোভিয়েত নেতা-ব্রেজনেভ, পোদগর্নি ও কোসিগিনের সাথে তাঁর ছ ঘণ্টা ব্যাপী দীর্ঘ বৈঠক হলো। এ বৈঠক সোভিয়েত ইউনিয়নকে সর্বাত্মকভাবে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড় করাল। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ তাঁর মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করলো। পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে একা হওয়ার যে ভয় ভারত এতোদিন করছিলো, তা এবার উবে গেল।[২৫৯]

মুক্তিযুদ্ধকে সবদিক থেকে শক্তিশালী ও ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ নেয়া হলো। ভারত ও সোভিয়েত ব্লকের মিলিত উদ্যোগ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থনের একটা ভিত্তি রচনা করলো। সোভিয়েত ভেটো এবং সমর্থনের কারণেই যুদ্ধ বিরতি করে শেষ রক্ষার পাকিস্তান-মার্কিন উদ্যোগ সফল হয়নি। আভ্যন্তরীণভাবেও মুক্তিযুদ্ধকে জোরদার করে তোলা হলো। সেপ্টেম্বর থেকেই মাসে ২০ হাজার মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া হয়। নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা মুক্তিযুদ্ধকে তীব্রতর করে তোলে। "পরবর্তী সাত সপ্তাহ ধরে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতা এবং ভারত ও বাংলাদেশের মিলিত বাহিনীর তীব্রতর সীমান্ত চাপের ফলে সর্বাত্মক যুদ্ধ হওয়ার পূর্বেই পাকিস্তানী বাহিনী বিরামহীন তৎপরতার ভারে পরিশ্রান্ত, বৈরী পরিবেশ ও অতর্কিত গোপন আক্রমণের ভয়ে শঙ্কিত, দীর্ঘ সীমান্ত জুড়ে বিস্তৃত হওয়ার ফলে দুর্বল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটে বিভক্ত এবং স্বচ্ছ রাজনৈতিক লক্ষ্য ও সামরিক সাফল্যের অভাবে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলো।"[২৬০ক] অবশেষে এলো ৩রা ডিসেম্বর। অতিষ্ঠ, অধৈর্য পাকিস্তান ৩রা ডিসেম্বর ভারতকে আক্রমণ করে বসলো। বাংলাদেশের দীর্ঘ প্রতীক্ষা পূরণ করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে বাংলাদেশের যুদ্ধকে ভারত ভারতের যুদ্ধ বলে ঘোষণা করলো। শুরু হয়ে গেলো যুদ্ধ। ভারত এটাই কামনা করছিলো। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW-এর মূল্যায়ন ছিলো, সময় ক্ষেপণ কৌশলের মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীকে আরও

---

২৫৯. "বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। কেননা এ প্রথম বাংলাদেশের পরিস্থিতির মাঝে 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উপাদান বর্তমান'-এ স্বীকৃতির ভিত্তিতে এবং 'এ পরিস্থিতি ভারতকে বৃহত্তর সংঘর্ষে জড়িত করে ফেলতে পারে'-এ আশংকায় একমত হয়ে ভারতের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তির সম্মতি বাংলাদেশের মুক্তির জন্যে ভারতের সর্বাত্মক সাহায্যের পথ উন্মুক্ত করে।"-(মূলধারা, '৭১, পৃষ্ঠা-১১২

২৬০ক. মূলধারা, '৭১, পৃষ্ঠা-১৯৭

www.bjilibrary.com

ভালো অবস্থায় আনা যাবে, কিন্তু পাক বাহিনীকে তাদের দ্বারা কাবু করা যাবে না। ভারতের সামরিক পদক্ষেপ তাই যৌক্তিক দাবী।[২৬০খ] ইয়াহিয়া ভারতের এ যৌক্তিক দাবী পূরণের ব্যবস্থা করলেন ভারত আক্রমণ করে। ভারতের এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। এভাবে যে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলো, তা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের হাতে তুলে দিলো, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কমাণ্ডারগণ একান্তভাবেই কামনা করেননি।[২৬১] ভারতীয় জেনারেলের নেতৃত্বে যৌথ কমাণ্ড গঠন ভারতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথকে আরও খোলাসা করে দিলো।[২৬২] তারপরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। মুক্তিবাহিনী এবং আমাদের জানবাজ কমাণ্ডাররা মাসের পর মাস ধরে যে ফসলের বীজ বপন করেছিলো, তা হাত করার জন্যে ভারতীয় বাহিনী ছুটে এলো ঢাকার দিকে। Asoka Raina তাঁর গ্রন্থে এই শেষ অংশটাকে এভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

"ঘটনা দ্রুত গড়িয়ে চললো। পাকিস্তানী প্রতিরোধের দ্বীপগুলো এড়িয়ে ভারতীয় বাহিনী দ্রুত অগ্রসর হলো ঢাকার দিকে। ভারতীয় RAW এজেন্টদের পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতেই পাকিস্তানী প্রতিরোধ বাহিনীর

২৬০খ. These delay tacties only gave the growing Mukti Bahini more time to reoganise. RAW estimates clery indicated that in spite of the Mukti Bahini's growing Strength. it would be unable to take on the pakistan army over a long period, Military action was the only logiacl soultion. Yahya provided the answer on December 3rd at 5-30 PM." Inside RAW The story of India's secret service." Asoka Raina, Page-58

২৬১. "একাত্তরের রণাঙ্গন" বইতে প্রকাশিত এক সাক্ষাতকারে তৎকালীন মেজর শওকত বলেন, যে কোনো যুদ্ধে গেরিলা রণ-কৌশল চালিয়ে একটি সৈন্য দলকে যদি আপনি দুর্বল করে ফেলেন, তাহলে জয় আপনার অবশ্যম্ভাবী। ধরুন, পাকিস্তানীরা যুদ্ধ করেছিলো বাংলাদেশে, প্রত্যেক বাঙালী তাদের শত্রু ছিলো। এ অবস্থায় আর কয়েক মাস পর পাকিস্তানী বাহিনী এমনিতেই আত্মসমর্পণ করতো। ভারতীয় সেনাবাহিনী সাহায্য করলো কি না করলো তাতে কিছুই যেতো-আসতো না। এটাই আমাদের জন্যে দুর্ভাগ্যজনক যে, ডিসেম্বর, '৭১-এ আমরা চাইনি ভারতীয় বাহিনী আমাদের পক্ষে পাকিস্তানীদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করুক। আমরা চেয়েছি, আমরা আরো কিছু দিন লাগতো না হয়, যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করবো। ভারতীয় বাহিনী এলো কেন ?"–একাত্তরের রণাঙ্গন, পৃষ্ঠা–১৯৩

২৬২. অথচ জেনারেল অরোরা যিনি ইস্টার্ণ কমাণ্ডের সি.ইন. সি ছিলেন, তাঁর চেয়ে জেনারেল ওসমানী সিনিয়র ছিলেন।"–মেজর শওকতের সাক্ষাতকার, একাত্তরের রণাঙ্গন, পৃষ্ঠা–১৯৫

www.bjilibrary.com

চোখে ধুলা দিয়ে এভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছিলো। পাকিস্তানীরা অনেক জায়গায় তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর দ্বারা নাজেহাল হয়ে এবং ভারতীয় বাহিনীর অব্যাহত সাফল্যে তারা হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলো। ঢাকা ও তার আশেপাশের উপর ক্রমাগত আক্রমণ পাকিস্তানী ইস্টার্ণ কমাণ্ডকে স্থবির করে দিয়েছিলো এবং এখান থেকে সৈন্যরা কোনো নির্দেশনাই পাচ্ছিল না।

জাতিসংঘে পাকিস্তানী প্রতিনিধিরা যখন যুদ্ধ বিরতির চেষ্টা করেছিলো, ভারত তখন ১২ ডিসেম্বর ঢাকার উপর চূড়ান্ত আঘাতের জন্যে তৈরি হচ্ছিল। এ সময় ভারতীয় গোয়েন্দারা একটা বেতার বার্তা ধরে ফেলে, যা ঢাকার উপর চূড়ান্ত আঘাত এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের নিমিত্ত হয়ে দাঁড়ায়। সেই বেতার বার্তাটি ছিলো এই ঃ 'আমরা দুপুর ১২টায় গবর্নর হাউজে বৈঠকে বসছি।' এ বার্তা থেকে এটা ধরে নেয়া হলো, একটা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক সেখানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বৈঠকটি বানচাল করার পরিকল্পনা নেয়া হলো। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো ভারতীয় বিমান বাহিনীর ইস্টার্ণ কমাণ্ড বোমা বর্ষণের লক্ষ্যস্থল গবর্নর হাউজের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারছিলো না। বিমান ও সেনাবাহিনী হেড কোয়ার্টারে সকল দৌড়াদৌড়ি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। বয়ে যাচ্ছিলো সময়। বিষয়টা অন্য সংস্থার কাছে পাঠানো হলো। RAW-এর যেসব এজেন্ট ঢাকায় কাজ করছিলো দ্রুত তাদের একটি মিটিং ডাকা হলো। এ এজেন্টরা ২৫ মার্চ রাতে সেনা অভিযানের পূর্বক্ষণে ঢাকা ত্যাগ করেছিলো। এ এজেন্টদের মধ্যে একজন তার কাছে অবশিষ্ট ঢাকার একটা পর্যটন ম্যাপ মাত্র দিতে পারলো। ম্যাপটার অবস্থা ছিলো খুব খারাপ। তবু কোনো রকমে তাকে ভিত্তি হিসেবে নিয়ে আকাশ থেকে দেখা যায়, এমন একটা ভূমি চিহ্ন নির্দিষ্ট করে গবর্নর হাজউকে চিহ্নিত করা হলো। RAW-এর তৈরি এ নির্দেশনা ম্যাপটি বিমান বাহিনীর পাইলটের হাতে পৌঁছানো হলো। ভারতীয় বিমান বাহিনীর হান্টার বিমান বোমা বোঝাই করে বেলা ১২টার দিকে কোলকাতা থেকে আকাশে উড়লো। বোমা ফেলা হলো।

পরে পাওয়া তথ্যে জানা গিয়েছিলো, গবর্নর মালিক দৌড়ে নেমে গিয়েছিলেন ভূ-গর্ভস্থ বাংকারে। নামায পড়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে

www.bjilibrary.com

এসে তাঁর মন্ত্রিসভার সহযোগীদের সমেত তিনি পদত্যাগ করেছিলেন।২৬৩ তারপর রেডক্রসের নিয়ন্ত্রণাধীন হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন পাকিস্তান সরকারের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে সামরিক প্রশাসক জেনারেল নিয়াজীর উপর যুদ্ধ পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়লো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তখন প্রায় শেষ। এর দুদিন পর নিয়াজী আত্মসমর্পণ করলেন। আর বাংলাদেশের জন্ম হলো।"২৬৪

১৬ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটায় জেনারেল নিয়াজী রেসকোর্স ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর আত্মসমর্পণের দলিল ভারতীয় জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার হাতে তুলে দিলেন। আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর করলেন জেনারেল নিয়াজী এবং জেনারেল অরোরা। এ ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানি হাজির ছিলেন না। চারটের দিকে জগজিৎ সিং অরোরা এবং অন্যান্য জেনারেলরা এ অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্যে ঢাকা অবতরণ করতে পারলেন। কিন্তু জেনারেল ওসমানির আসা হয়নি। বলা হয়, বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানি বিভিন্ন সমরাঙ্গান সফর করার উদ্দেশ্যে ১১ ডিসেম্বর থেকে কোলকাতায় অনুপস্থিত থাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি।২৬৫ একথা সর্বৈব মিথ্যা ও বানোয়াট। জেনারেল ওসমানির বক্তব্যই এর জলজ্যান্ত প্রমাণ। তিনি বলেন, ঐ দিন ও এর আগের দিন আমি ময়নামতির রণাঙ্গনে, ১৬ ডিসেম্বর দুপুরে লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিংহের সাথে মধ্যাহ্ন ভোজন করি। ১৬ ডিসেম্বর দুপুরে তদানীন্তন লেঃ কর্নেল সফিউল্লাহর 'এস' ফোর্স রণাঙ্গন পরিদর্শন করার জন্য আমার যাবার কথা ছিলো। জেনারেল জগজিৎ সিংহ সেদিন না যেতে অনুরোধ

---

২৬৩. "Mr. A. M. Malik, the governor Wrote the draft of his cabinet resignation letter to the president Yahya with Shaking ball point on a scrap of office paper as the Indian MIG-21s destroyed his official residence .... All morning Mr. Malik and his cabinet had been unable to decide wheather to resign or hang on. The Indian air raids finally decided him The resignation effectively throws all responsibitlity for a last-ditch stand on the East Pakistan Army Commander Lt. gen A. A. K. Niazi, who yesterday vowed to fight to the last man. "The Times, Dec. 15, '71.

২৬৪. 'Inside RAW : The story of India's secret service', Page-60-61

২৬৫. মূলধারা, '৭১, পৃষ্ঠা-২৩৬

www.bjilibrary.com

করে বলেন, সেদিন 'এস' ফোর্স পরিদর্শনে অসুবিধা হতে পারে, যেহেতু তারা অগ্রসর হচ্ছেন। আমি তখন আমার সফরসূচী পরিবর্তন করে সিলেটে 'জেড' ফোর্স পরিদর্শনে যাবার সিদ্ধান্ত নেই। .... বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী তথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানতেন আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে। তাছাড়া মিত্র বাহিনীর উচ্চতম কর্মকর্তারাও জানতেন আমি কোথায়।"[২৬৬]

দেখা যাচ্ছে ১৬ ডিসেম্বর দুপুরে জেনারেল ওসমানি ও জেনারেল অরোরা এক সাথেই ছিলেন। বিকেল ৪টার সময় জেনারেল অরোরা ঢাকা আসেন। যে সংবাদ পেয়ে জেনারেল অরোরা ঢাকা এলেন, সেই সংবাদ পেলে জেনারেল ওসমানি ঢাকা আসতে পারবেন না কেন ? আসলে তাঁকে জানানো হয়নি। জানানো হয়নি তাঁকে ঢাকা আসা থেকে বিরত রাখার জন্যেই। জেনারেল ওসমানির মতো করে উল্লেখযোগ্য অন্যান্য ব্রিগেড কমাণ্ডারদেরকেও ঢাকা আসতে বাধা দেয়া হয়েছে। জনাব এম. আর. আখতার মুকুল লিখেছেন, "আমাদের যেসব ব্রিগেড কমাণ্ডার যুদ্ধ করে ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছিলেন, তাঁদেরকে ভারতীয় বাহিনী ঢাকায় আসতে না দিয়ে অন্যদিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। .... সাবরুম সেক্টর থেকে ঢাকার দিকে অগ্রসরমান তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানকে তাঁর 'জেড ফোর্স' নিয়ে সিলেটের দিকে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো। 'কে ফোর্স-এর অধিনায়ক খালেদ মোশাররফ কসবা আখাউড়া থেকে দুর্বার গতিতে ঢাকার পথে দাউদকান্দি পর্যন্ত এসে হাজির হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় বাহিনী কর্তৃপক্ষ তাঁকে পথ পরিবর্তন করে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়। অথচ খালেদ মোশাররফের দুই নম্বর সেক্টরের 'ক্র্যাক প্ল্যাটুনের' প্রধান ক্যাপটেন হায়দার তাঁর দলবল নিয়ে ঢাকার আশে-পাশে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।"[২৬৭] 'একাত্তরের রণাঙ্গন' শীর্ষক গ্রন্থে 'এস ফোর্স'-এর অধিনায়ক সফিউল্লাহর এক সাক্ষাতকার থেকে জানা যায়, ভারতীয় কমাণ্ডার তাঁর ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়া পসন্দ করেননি। আখাউড়া দখলের পর ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক তাঁকে বললেন আখাউড়া প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকার জন্যে এবং তার বাহিনী ভৈরবের দিকে যাবে বলে জানালেন। তখন 'এস ফোর্স'-এর অধিনায়ক সামনে এগিয়ে যাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক তাঁকে বললেন, 'তাহলে তো আপনাকে নিজস্ব প্রবেশ

২৬৬. সাপ্তাহিক 'বিক্রম', ১২ ডিসেম্বর, ১৯৮৮
২৬৭ আমি বিজয় দেখেছি, পৃষ্ঠা-২১৭-২১৮

www.bjilibrary.com

পথ নিতে হবে।' 'এস ফোর্স'-এর অধিনায়ক বললেন, তাই হবে। ভৈরবে পৌঁছে ভারতীয় কমাণ্ডার বললেন, আপনি ফরটিন্থ ডিভিশনকে ঘিরে রাখুন। তিনি বললেন, ফরটিন্থ ডিভিশন ঘিরে রাখার জন্যে কিছু ফোর্স রেখে আমিও ঢাকা যাব।' ভারতীয় কমাণ্ডার বললেন, আমাদের ফোর্স তো হেলিকপ্টারে নরসিংদী যাচ্ছে, আপনি কিভাবে যাবেন ? 'এস ফোর্স-এর কমাণ্ডার বললেন, ঠিক আছে, আমি হেটে চলে যাব।' নরসিংদী আসার পর ভারতীয় অধিনায়ক আমাদের কমাণ্ডারকে বললেন, আপনি নরসিংদী থাকুন, আমরা ঢাকা যাচ্ছি। 'এস ফোর্স-এর কমাণ্ডার মেজর শফিউল্লাহ বললেন, 'নরসিংদীতে আমার থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। আমিও ঢাকা যাব।' অতপর নরসিংদীর সব যানবাহন ভারতীয় বাহিনী নিজেরা নিয়ে ডেমরা পৌঁছেন। আমাদের কমাণ্ডার তাঁর বাহিনী সহ পায়ে হেঁটে ভোলতা পুলের কাছে আসেন। সেখান থেকে কোণাকুণি পথে রূপগঞ্জ দিয়ে শীতলক্ষা ও বালু নদী অতিক্রম করে ডেমরার পেছনে গিয়ে উঠেন।'[২৬৮]
আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমাণ্ডারদের এ দুর্দশার কাহিনী প্রমাণ করে, ভারতীয় বাহিনী আমাদের সেক্টর কমাণ্ডারদের শুধু ঢাকা আসতেই বাধা দেয়নি, মুক্তিবাহিনীকে তারা অনুগত অনুল্লেখযোগ্য বাহিনীর বেশী মর্যাদা দিতে চায়নি। যার কারণে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমাণ্ডাররা পর্যন্ত অত্যন্ত অপমানকর আচরণের সম্মুখীন হয়েছেন। এমনকি বাংলাদেশ সরকারও তাদের তাচ্ছিল্য ও অপমানকর আচরণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এ সম্পর্কে একটা সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন নবম সেক্টরের কমাণ্ডার জনাব মেজর এম এ জলিল। তিনি লিখেছেন ঃ

"বরিশাল সদর থেকে নির্বাচিত জনপ্রিয় সংসদ সদস্য (প্রাদেশিক) জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুর ইতিপূর্বেই পশ্চিম বংগ ঘুরে বরিশালে ফেরত এসে আমাকে জানালেন যে, লেঃ জেনারেল অরোরা ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সর্বাধিনায়ক এবং তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাঙালী সামরিক অফিসারের কাছে অস্ত্র সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। এ তথ্য লাভের মাত্র ১ দিন পরেই আমি কিছু মুক্তিযোদ্ধা সহকারে ভারত অভিমুখে রওয়ানা হয়ে প্রথমে পৌঁছি পশ্চিম বাংলার বারাসাত জেলার হাছনাবাদ বর্ডার টাউনে। ঐ অঞ্চলের বি এস এফ-এর কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল শ্রী মুখার্জীর সংগে হয় প্রথম আলোচনা। কমাণ্ডার মুর্খাজী অত্যন্ত সুহৃদ বাঙালী অফিসার। তিনি সর্বান্তঃকরণেই আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে সরাসরি লেঃ জেনারেল অরোরার কাছে নিয়ে গেলেন। কলকাতার ফোর্ট

২৬৮. 'একাত্তরের রণাঙ্গন', পৃষ্ঠা-১৫২

www.bjilibrary.com

উইলিয়ামে তার হেডকোয়ার্টার। তিনি আমাকে প্রথম সাক্ষাতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। সাক্ষী-প্রমাণ দাবী করলেন আমার। তখনই আমাকে সদ্য ঘোষিত স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন এবং সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানি সাহেবের নাম নিতে হয়েছে। উত্তরে জেনারেল অরোরা সাহেব আমাদের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে যা বাজে মন্তব্য করলেন তা, কেবল 'ইয়াঙ্কী'দের মুখেই সদা উচ্চারিত হয়ে থাকে। সোজা ভাষায় তার উত্তর ছিলো 'ঐ দুটো ব্লাডি ইঁদুরের কথা আমি জানি না। ওদের কোনো মূল্য নেই আমার কাছে। অন্য কোনো সাক্ষী থাকলে বলো।'

মহা মুশকিল দেখছি। ব্যাটা বলে কি ? আমার স্বাধীন বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সম্পর্কেই যে ব্যক্তি এরূপ কদর্য উক্তি করতে ছাড়েননি, তিনি আমার মতো চুনোপুঁটিদের যে কি চোখে দেখবেন তা অনুধাবন করতেই একটা অজানা আতংকে আমার সর্বাংগ শিহরিয়ে উঠলো।"[২৬৯]

অন্যান্য অনেক ভারতীয় দায়িত্বশীলদের মধ্যেও এ মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। মুক্তিবাহিনীর ভূমিকাকে তারা সব সময় তুচ্ছ ও অনুল্লেখযোগ্য করে দেখবার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় ইস্টার্ণ কমাণ্ডের মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং তাঁর 'দ্য লিবারেশন অব বাংলাদেশ' গ্রন্থে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতাকে সারা সীমান্ত জুড়ে 'ঠোকরানো অভিযান' বলে অভিহিত করেন এবং 'ঘুমন্ত সিংহের উপর পিপড়ার আক্রমণ'-এর সাথে তুলনা করেন।[২৭০] তিনি লিখেন, 'সকল পর্যায়ে 'যুদ্ধ যুদ্ধ' খেলা থেকে যে স্ট্যাটেজী অবশেষে উদ্ভাবিত হলো তা তচ্ছে মুক্তিবাহিনী অপরাশেনের নামে ক্রমাগত অভিযান চালিয়ে সীমান্ত সজীব রেখে পাকিস্তানী বাহিনীকে বের করে নিয়ে আসা।'[২৭১] মুক্তিবাহিনীর যোগ্যতার উপর কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার দ্বারা সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা কমে যায়। কারণ, এটা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, এ ধরনের তৎপরতার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর থেকে (পাকিস্তানী) সামরিক আধিপত্য শিথিল করতে সময় লাগবে।[২৭২] ভারতে ২০ মাউন্টেন ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল লছমন সিংও

২৬৯. অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃষ্ঠা-২২
২৭০. The Liberation of Bangladesh, Page, 123
২৭১. The Liberation of Bangladesh, Page, 92
২৭২. The Liberation of Bangladesh, Page, 106

www.bjilibrary.com

এ একই সুরে কথা বলেন। তিনি তাঁর 'Indian Sword Strikes in East Pakistan' গ্রন্থে উত্তর-পশ্চিম সেক্টরের যুদ্ধ-পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'আমি একমত যে, গেরিলাদের একার পক্ষে পাকিস্তান বাহিনীকে ধ্বংস করা অসম্ভব ছিলো, তবে তারা পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বিশৃংখলা, গোলযোগ ও সংঘাত অব্যাহতভাবে টিকিয়ে রাখতে পারতো।'[২৭৩] মিঃ লছমন সিংহ আরও অগ্রসর হয়ে মুক্তিবাহিনীকে ফায়ফরমাশ খাটা সহকারীর ভূমিকায় নামিয়ে ছেড়েছেন। তিনি বলছেন, 'তারা (মুক্তিবাহিনী) পথপ্রদর্শক স্থানীয় বিষয়াদির ব্যাখ্যা দানকারী, তথ্য ও কাজের লোক সংগ্রহকারী হিসেবে অত্যন্ত উপকারী ছিলো।'[২৭৪]

যারা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে এ দৃষ্টিতে দেখতো, তারা মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ককে কোন্ দৃষ্টিতে দেখবে তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ককে ঢাকা আসতে দিয়ে তাঁকে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হতে দেবে কেন ? তারা হয়তো মনেও করেছে যে, যুদ্ধটা পাক-ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক অবান্তর। সম্ভবত এ কারণেই নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল ভারত সরকারই গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়নের ভারত দায়িত্ব সরকার তাদের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মানেক শ'র হাতে অর্পণ করে।[২৭৫] জেনারেল মানেকশ'ই আত্মসমর্পনের শর্ত-শরায়েত নিয়ে দরকষাকষি করেন। তিনি

২৭৩. Indian sword Strikes in East Pakistan, Page-20

২৭৪. Indian sword Strikes in East Pakistan, Page-181

২৭৫. "At 6-30 P. M. on December 14, General Niazi....... appeared at the American consulate general in Dacca seeking help. He wanted the Indians for ceasfire....... V. S. Consul General Herbert Spivak followed protocol to the letter and sent Niazi's plea to Washington for rebroadcasting. It was received in the state departiment at 7-45 P. M. Dacca time. The state Department, despite its public pleas for peace, did not expedite General Niazi's ceasfire message. The cable was forwarded to Ambassador Farland in Islamabad, to have him seck with yahya It was 3-30 A. M. in Dacca before Washington received sufficient confirmaion from Islamabad The message was finally sent to Ambassadore keating in New Delhi, Where it was received at 12-56 P. M. It took another hour and a half to decode the message, locate Indian officials and deliver it to them " The Anderson paper, pp,-267-268 (মূলধারা, '৭১, পৃষ্ঠা-২৩৩)

www.bjilibrary.com

নিছক যুদ্ধ বিরতির নিয়াজীর 'প্রস্তাব প্রত্যাখান করে দাবী করেন, ভারতীয় বাহিনীর কাছে পাক বাহিনীর শর্তহীন আত্মসমর্পণই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার একমাত্র ভিত্তি হতে পারে।'[২৭৬] যুদ্ধ বিরতির এ প্রস্তাব এবং যুদ্ধ বিরতির এসব শর্ত-শরায়েত সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার এবং সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানি কিছুই জানতেন না, তাঁদের অবহিত করা হয়নি। সব যখন শেষ, তখন ১৬ ডিসেম্বর বেলা ১২টার দিকে ভেসে আসা একটা খবরের মতো বাংলাদেশ সরকার জানতে পারলেন যে, আজ আত্মসমর্পণ হচ্ছে।[২৭৭] এ থেকে প্রমাণ হয়, ভারত যুদ্ধ পরিচালনা, যুদ্ধ বন্ধ, ইত্যাদি নীতিগত ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনীর ভূমিকাকে অবান্তর মনে করতো। অর্থাৎ তাদের কাছে ওটা ছিলো পাক-ভারত যুদ্ধ।[২৭৮] যৌথ কমাণ্ডটা যেন ছিলো কৌশলগত ও কূটনৈতিক একটা বর্ম মাত্র।[২৭৯]

---

২৭৬. মূলধারা, '৭১, পৃষ্ঠা-২৩৪-২৩৫
"Since you (Niazi) have indicated your desire to stop fighting, I (General Manekshaw) expect you to issue orders to all forces unber your command in Bangladesh to ceasfire immediately to my advancing forces wherever they are located............ Immediately I receive a positive response from you I Shall direct Gen, Aurora .... to refrain from all ari and ground action against your force." Daily Telegraph, Dec. 16. 1971.

২৭৭. "১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ কোলকাতাস্থ থিয়েটার রোডে মুজিব নগর সরকারের অস্থায়ী সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছে খবর এসে পৌঁছলো যে, ঢাকার হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণে সম্মত হয়েছে। তাজউদ্দীন আহমদ প্রতি মুহূর্তের খবরের জ ন্যে উদগ্রীব ছিলেন। এমন সময় খবর এলো, আজ বিকেলেই আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকায় আত্মসমর্পণ হবে।"-আমি বিজয় দেখেছি'-এম আর আখতার মুকুল, পৃষ্ঠা-৩০৮

২৭৮. লক্ষণীয়, ভারতের ইষ্টার্ণ নেভাল কমাণ্ডের ফ্ল্যাগ অফিসার কমাণ্ডার ইন-চীফ ভাইস এডমিরাল এস. কৃষ্ণাণ-এর বাংলাদেশ যুদ্ধের উপর লিখিত 'নো ওয়ে বাট সারেণ্ডার' গ্রন্থের প্রচ্ছদ শিরোনাম ছিলো ঃ 'An account of the Indo-Pakistan war in the Bay of Bengal ? আমাদের মুক্তিযুদ্ধে র উপর ভারতের মিঃ প্রাণ চোপরার লিখিত একটা বইয়ের নাম ঃ The Sccond Revoliution of India.'

২৭৯. "আসলে শুধু সামরিক দিক বিবেচনা করলে ভারী অস্ত্রশস্ত্র বিবর্জিত বাংলাদেশ বাহিনীর জন্য এ ধরনের পৃথক মোতায়েন ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে এটা দেখানো দরকার ছিলো যে, বৃহৎ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বাহিনী ভিন্নভাবে যুদ্ধ করছে।" 'দ্য লিবারেশন অব বাংলাদেশ-মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং, পৃষ্ঠা-৩৬
তাছাড়া "তাঁর (সুখওয়ান্ত সিং) গ্রন্থে যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারে মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক এবং প্রবাসী সরকারের নেতৃবর্গের কোনো ভূমিকাই স্বীকার করা হয়নি। তাঁর বর্ণনা মতে যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে লেঃ জেনারেল কে কে সিং এর নেতৃত্বে ভারতীয় বাহিনীর কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটা টিম।"-(মাসিক ডাইজেষ্ট, জানুয়ারী, ১৯৮৬)

www.bjilibrary.com

মুক্তিবাহিনীর প্রতি তাচ্ছিল্য ও অমর্যাদাকর ব্যবহার দেখে এটাই মনে হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর প্রতি তারা এ মানসিকতা পোষণ করলেও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানির ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা ও মর্যাদাবোধকে তারা ভয় করতো। জেনারেল ওসমানি তাঁর দেশ, তাঁর বাহিনীর মর্যাদার ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। ভারতীয় বাহিনীর মিলিটারী অপারেশনের ডিপুটি ডিরেক্টর মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং বলেছেন, "তিনি (ওসমানি) মুক্তিযুদ্ধকালে যেখানেই গিয়েছেন, একটা স্বাধীন দেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে মর্যাদা ও সম্মান প্রাপ্তির দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিলো। আমার মনে আছে, একবার একজন ভারতীয় আর্মি কমাণ্ডার তাঁকে অভ্যর্থনার জন্যে রানওয়েতে তৈরি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিমান অবতরণ করাতে অস্বীকার করেন, যদিও তাঁর বিমান আগেই এয়ারফিল্ডে এসে পড়ে। বেচারী পাইলটকে প্রায় দশ মিনিট আকাশে চক্কর দিতে হয়। সাথের বিমানে আরোহী ভারতীয় কমাণ্ডার আগে নেমে তাকে অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত হবার পরই তার বিমান অবতরণ করে। ওসমানির মনোভাব ছিলো যে, তিনি দেশ থেকে নির্বাসিত হলেও দেশের উপর তাঁর পূর্ণ অধিকার আছে। তাঁর দেশের জন্যে সাহায্য প্রয়োজন, ভিক্ষা নয়। প্রাথমিকভাবে তাঁর সৈন্যরা ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু পরাজিত হয়নি। যদিও তিনি জুনিয়র র‍্যাংকের ছিলেন, তবু মর্যাদা ও অন্যান্য যে কোনো দিক দিয়েই ভারতীয় প্রতিপক্ষের কোনো অংশেই কম ছিলেন বলে মনে করতেন না।"[২৮০] জেনারেল ওসমানি সাহায্য ছাড়া অন্য কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ ও মুরুব্বিয়ানরা সহ্য করতে চাইতেন না। সুখওয়ান্ত সিং-ই বলেছেন, "নিজ দেশের স্বাধীন সত্তা সম্পর্কে তাঁর যে ভয়ংকর অহংকার ছিলো তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি এটা চেয়েছিলেন। তাঁর বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর সাথে সংযুক্ত বলে বিবেচিত হোক, এটা তিনি কিছুতেই চাইতেন না।"[২৮১] জেনারেল অরোরার একক নেতৃত্বে যৌথ কমাণ্ড গঠন করাকেও তিনি সহজভাবে নিতে পারেননি, কিন্তু সম্পূর্ণ অস্বীকার করার ক্ষমতাও তাঁর ছিলো না। "তাই দেখা যায়, যৌথ কমাণ্ড গঠনের পরও তিনি মুক্তিবাহিনীকে সরাসরি কমাণ্ড করতেন। কিন্তু কোনো বেতার যন্ত্র না থাকায় সবসময় যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব ছিলো না।"[২৮২] মেজর জেনারেল লছমন সিং-এর অভিযোগ থেকেও এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত

---

২৮০. দ্য লিবারেশন অব বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা–৩৪ (মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং)

২৮১. দ্য লিবারেশন অব বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা–৩৪ (মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং)

২৮২. "একাত্তরের রণাঙ্গন," পৃষ্ঠা–১৮৫

www.bjilibrary.com

হয়। তিনি লিখেন, "মুক্তিবাহিনী তাঁর কমাণ্ডে আসলেও তারা অনেক সময় তাদের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মতো কাজ করতো এবং এর ফলে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের সমস্যা দেখা দিতো। এ ব্যাপারে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো পরিষ্কার নির্দেশ পাননি।"[২৮৩] কথাটাকে আরও পরিষ্কার করে তিনি লিখেন, "শেষ দিন পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী সরাসরি জেনারেল ওসমানির কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে এসেছে, যা তাদেরকে দেয়া আমাদের পরিকল্পনা ও নির্দেশের সাথে সবসময় সংগতিপূর্ণ হতো না।"[২৮৪ক]

এ ধরনের স্বাধীনচেতা এবং দেশ ও জাতির মর্যাদার ব্যাপারে আপোসহীন মুক্তিযুদ্ধের যে সর্বাধিনায়ক ওসমানি, তাঁকে ঢাকায় নিয়াজীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ডাকা হবে কেন ? ভারতীয়রা ভয় করছে যে, নিজ দেশে ভারতীয় জেনারেলের কাছে পরাজিত শত্রু পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের দৃশ্য বসে বসে দেখতে জেনারেল ওসমানি কিছুতেই রাজী হবেন না, এ অসংগত ব্যবস্থা তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন না। এ জন্যেই আত্মসমর্পণের গোটা ঘটনা তাঁর কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে এবং কৌশলে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়।[২৮৪খ] এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে শত অনুরোধ সত্ত্বেও জেনারেল ওসমানি কোনো দিনই মুখ খোলেননি, বলা

---

২৮৩. Indian sword strikes in East Pakistan, Page-178

২৮৪ক. Indian sword strikes in East Pakistan, Page-181

২৮৪খ. জেনারেল ওসমানি ১৬ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানটিতে কেন হাজির থাকেননি তার আর একটা বিবরণ পাওয়া গেছে সাংবাদিক (বর্তমানে 'দৈনিক মানব জমীন' সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর কাছ থেকে। তিনি বলছেনঃ

নয় মাস আমরা যুদ্ধ করেছি পাক হানাদার বাহিনীর সাথে। .... পাক বাহিনী শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর। মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো প্রায় এক লাখ পাকিস্তানী আধুনিক সৈন্য। মুজিবনগর সরকারের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন মাত্র। এ নিয়ে বিতর্ক ১৯৭২ সাল থেকেই। জেনারেল ওসমানি জীবিত থাকা অবস্থায় বলে যাননি কেন তিনি সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে আসেননি। তৎকালীন সরকারও কোনো সময় বলেননি।........১৯৭১ সালের অক্টোবর। প্রবাসী মুজি বনগর সরকার ও ভারত সরকার একটি সমঝোতায় এলেন। সাতটি বিষয়ে সমঝোতা। এ দিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন ভারতের একজন কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের পক্ষে সৈয়দ নজরুল ইসলাম। চুক্তি স্বাক্ষরের ভয়াবহতা ভেবে এ অনুষ্ঠানেই সৈয়দ নজরুল ইসলাম জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি এ চুক্তি। মুজিবনগর সরকারের অনেকেই জানতেন না। মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন মরহুম তাজউদ্দীন .... প্রশাসনিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ই ছিলো চুক্তির প্রধান লক্ষ্য। প্রশাসনকে গতিশীল করার জন্যে সিদ্ধান্ত হলো মুক্তিযুদ্ধ করেনি এমন কর্মকর্তাদেরকে চাকরি থেকে অবসর দেয়া হবে। অভিজ্ঞ কর্মচারীর শূন্যতা পূরণ করবে ভারতীয় কিছু প্রশাসনিক কর্মকর্তা। লক্ষ্য করে দেখবেন স্বাধীনতার পর বেশ কিছু ভারতীয় সিভিল সার্ভিস অফিসার ঢাকা এসেছিলেন।

www.bjilibrary.com

হয়, "যুদ্ধ বিধ্বস্ত নবীন দেশের কর্মবীর হিসেবে হাজারো জটিল সমস্যার সমাধান চিন্তায় ব্যাপৃত .... শেখ মুজিবুর রহমান পুরনো দিনের কোনো কথা নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি হোক এটা হয়তো অভিপ্রেত মনে করেননি। আর তাই হয়তো জেনারেল ওসমানিকে কিছু কিছু কথা প্রকাশ না করতে তিনি অনুরোধ করেছেন। একদিকে বঙ্গোপসাগর আর অপর তিন দিকে বৃহৎ রাষ্ট্র ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে হয়তো ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সব সত্য কথা সবসময় প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর যেহেতু জেনারেল ওসমানি বঙ্গবন্ধুকে কথা দিয়েছিলেন, কিছু কিছু কথা প্রকাশ করবেন না, তাই তিনি নীরব রইলেন। 'হাফ ট্রুথ' প্রকাশ করার লোক তিনি ছিলেন না।"[২৮৫] কিন্তু অনেক পরে অবশেষে তিনি মুখ খুলতে চাইলেন। তিনি প্রকাশ করতে চাইলেন অন্ধকারের ঘটনাগুলো। ১৯৮৩ সালের ২৪ নবেম্বর বিচিত্রা এক সাক্ষাতকার নেয়ার সময় তাঁকে প্রশ্ন করে, 'পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ আপনার কাছে হলো না কেন?' জেনারেল ওসমানি বলেন, "মুক্তিযুদ্ধের এমন অনেক ঘটনা আমি জানি,[২৮৫ক] যাতে অনেকেরই অসুবিধা হবে। আমি

বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো সেনাবাহিনী থাকবে না। আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী থাকবে। যা পরে রক্ষীবাহিনী হিসেবে গঠিত হয়েছিলো। প্রশিক্ষণে ছিলেন ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাগণ। সামরিক সমঝোতার মধ্যে আরো ছিলো–বাংলাদেশে ভারতের সেনাবাহিনী থাকবে। প্রতি বছর নবেম্বর মাসে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ হবে। ৭২ সনের নবেম্বর থেকে এর কাজ শুরু হবে।

বাণিজ্যিক সমঝোতা ছিলো খোলা বাজার প্রতিষ্ঠা। সীমান্তের তিন মাইল জুড়ে চালু হবে খোলা বাজার। কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। শুধু বছর শেষে হিসেব-নিকেশ হবে। প্রাপ্য মেটানো হবে পাউণ্ড-স্টার্লিং এর মাধ্যমে। বিদেশ বিষয়ে ভারত যা বলবে তাই মেনে চলতে হবে। সাউথ ব্লকের এ্যানেকস হবে সেগুন বাগিচা। এক কথায় বলা চলে উল্লিখিত চুক্তি বলে ভারত বাংলাদেশের সামরিক ও পররাষ্ট্র বিষয়ের কর্তৃত্ব পেয়ে যায়।

পাকিস্তানের সাথে চূড়ান্ত লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান। মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক সহ প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পাবেন না। এ কারণেই জেনারেল ওসমানি আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে দর্শকের ভূমিকা পালন করতে রাজী হননি।'–(শেখ মুজিব চুক্তিটি অগ্রাহ্য করলেন'–মতিউর রহমান চৌধুরী, নাঈমুল ইসলাম খান সম্পাদিত, বাড়ি ৫০ সড়ক ২ এ ধানমণ্ডি থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'কাগজ', ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১১ জানুয়ারী, ১৯৯০)

২৮৫. জেনারেল ওসমানি নীরব রইলেন কেন? এম. মমিন উল্লাহ, মাসিক ডাইজেষ্ট, জানুয়ারী, ১৯৮৬

২৮৫ক. অনেক ঘটনার মধ্যে দিল্লীর সাথে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের গোপন চুক্তিও একটা। সাংবাদিক জনাব মতিউর রহমান চৌধুরী গোপন চুক্তির যে বিবরণ উপরে দিয়েছেন, তার চেয়েও সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা চলাকালীন সময়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের দিল্লী মিশন প্রধান, স্বাধীনতার পর দিল্লীতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার, পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং শেখ হাছিনা সরকারের সময়ে (১৯৯৬-২০০১) জাতীয় সংসদের স্পীকার জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। তিনি একটি সাক্ষাতকারে বলেন,

www.bjilibrary.com

একটা বই লিখছি। তাতে সব ঘটনাই পাবেন।" চিকিৎসার জন্যে লণ্ডন যাওয়ার প্রাক্কালে সি এম এইচ হাসপাতালে দেয়া জীবনের এ সর্বশেষ সাক্ষাতকারে অসুস্থ জেনারেল জানান ঃ

"আমার একটা দুঃখ আছে–আমি বাংলা ভাষা দিয়ে লিখতে পারি না। ইংরেজী স্কুলে লেখাপড়া করেছি তাই। তবে আমি বসে নেই–আমি অনেক ঘটনার নোট টুকে রেখেছি। ইংরেজীতে। একটা আত্মজীবনী লিখবো। অনেক অজানা ইতিহাস থাকবে তাতে। জেনারেল ওসমানির জীবনী গ্রন্থ হবে না সেটা–সেটা হবে বাংলাদেশ জন্মের ইতিহাস। দেশবাসীর কাছে আমি ঋণী। অনেক আগের পাওনা তাদের। বইটা শেষ করে প্রকাশ না করতে পারলে আমার মৃত্যুর সাথে সাথে আমার লাশের মতো অনেক অজানা কথা, অনেক অপ্রকাশিত ইতিহাস কবরের মাটিতে চাপা পড়বে। এটা হওয়া উচিত না ভাবছি, ভালো হয়ে ফিরে এসে অবশ্যই বইটি লিখবো–আর কিসের ভয়। কারে ভয় ? এক বঙ্গবন্ধুকে ভয় করতাম।[২৮৬] সেই লোকটারে কথা দিছিলাম, কিছু কিছু

"১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের সাথে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এক লিখিত চুক্তিতে, প্যাক্ট নয়, এগ্রিমেন্টে আসেন। ওই চুক্তি বা এগ্রিমেন্ট অনুসারে দুপক্ষ কিছু প্রশাসনিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক সমঝোতায় আসেন। প্রশাসনিক বিষয়ে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ভারতের যে প্রস্তাবে রাজি হন, তাহলো যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, শুধু তারাই প্রশাসনিক কর্তকর্তা পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকীদের চাকুরিচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্য জায়গা পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। স্বাধীনতার পর বেশ কিছু ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাংলাদেশে এসে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু (শেখ মুজিব) এসে তাদেরকে বের করে দেন।

সামরিক সমঝোতা হলো–বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে (কতদিন অবস্থান করবে তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় না)। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছর এ সম্পর্কে পুননীরিক্ষণের জন্য দু দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো সেনাবাহিনী থাকবে না।

অভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য মুক্তি বাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে।

ওই লিখিত সমঝোতাই হচ্ছে বাংলাদেশে রক্ষী বাহিনীর উৎস। আর ভারত-পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধ বিষয়ক সমঝোতাটি হলো–সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান, মুক্তিবাহিনী সর্বাধিনায়ক নন। যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তি বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে।

চুক্তির এ অনুচ্ছেদটির কথা মুক্তি বাহিনী সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে জানান হলে তীব্র ক্ষোভে তিনি ফেটে পড়েন। এর প্রতিবাদে রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকেন না।"

২৮৬. এ ভয় কিন্তু তাঁকে নীতিচ্যুত করতে পারেনি। শেখ মুজিব যখন ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠন করে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করলেন, তখন তিনি এর প্রতিবাদে জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।

www.bjilibrary.com

কথা লিখবো না, বলবো না। তিনিও নাই, আমার দেওয়া কথাও নাই। এই সব কথা বর্তমান ও আগামী দিনের নাগরিকদের জানা দরকার। হ্যাঁ, আমি লণ্ডন থেকে ফিরেই লিখবো নিয়মিত।"[২৮৭]

কিন্তু জেনারেল ওসমানি আর ফিরে আসেননি। ফিরে এলো তাঁর লাশ। তিনি জাতিকে যা জানাতে চেয়েছিলেন, তা অজানাই থেকে গেল। যা বলা তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন, তা তাঁর না বলাই রয়ে গেলো। অজানা রয়ে গেল, কি ছিলো সে ষড়যন্ত্র যার শিকার হয়েছিলো দেশ, দেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং তিনি ! বলার অনেক কথা, অনেক ইতিহাস জমেছিলো তাঁর বুকে। ১১নং সেক্টরের অধীনস্থ মুক্তিযুদ্ধের ইনটেলিজেন্স গ্রুপের সৈয়দ আবুল হোসেন রাজার একটি উক্তি ঃ "সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে দিল্লীতে বাংলাদেশের অস্থায়ী কেবিনেটের যে সভা হয়,[২৮৭ক] তাতে যোগদান শেষে দেশে ফিরে (জেনারেল ওসমানি) রণাঙ্গনে দেয়া তাঁর ভাষণে আমাদের বলতেন ঃ 'আজ থেকে আমাদের তিনটি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এর একটি হচ্ছে পাক হানাদার বাহিনী, আরেকটি হলো আমাদের যুদ্ধকালীন সরকারের দুটি বিভক্ত শিবির। কিন্তু তৃতীয় শত্রুর কথা তিনি মোটেই বললেন না। উনি ব্যথিত সুরে বলতেন, প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে আজাদ করার জন্যে আমাদের নেতৃত্বে আজ যারা যুদ্ধ করছেন, তাদের নিকট আমার সতর্কবাণী ঃ আমরা কারো করুণার পাত্র রূপে যুদ্ধ করছি না।"[২৮৮]

তৃতীয় শত্রুটির নাম সেদিন জেনারেল ওসমানি ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে না বলতে পারলেও সে শত্রুকে আমরা চিনি। কিন্তু কি জেনে, কি দেখে, কি বুঝে, কোন্ কারণে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানি সেদিন হানাদার পাক-বাহিনীর সাথে স্বাধীন বাংলা সরকার ও ভারতকে একই শত্রুর কাতারে শামিল করলেন, তা আর কোনো দিনই জানা যাবে না। জানা যাবে না, কি তিনি বলতে চেয়েছিলেন আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে লণ্ডন যাবার প্রাক্কালে ! এ জানাটা বাদ দিয়ে বর্তমানে প্রচলিত ইতিহাস নামের 'মুক্তিযুদ্ধের রূপকথা' শুনে কি জাতির যে প্রয়োজন তা মিটাতে পারে ![২৮৯]

---

২৮৭. বিচিত্রা, নবেম্বর, ২৪, ১৯৮৩

২৮৭ক. ২৮ সেপ্টেম্বর ইন্দিরা গান্ধী মস্কোতে রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশ ব্যাপারে চূড়ান্ত বুঝাপড়ায় বসার আগে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে সম্ভবত ভারত বাংলাদেশ সরকারের সাথে চূড়ান্ত বুঝাপড়া করে।

২৮৮. 'আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ওসমানি না থাকার নেপথ্য কথা'-গোলাম মাবরুক, বিক্রম, ডিসেম্বর, ১২, ১৯৮৮

২৮৯. "এই যে এতো স্বাধীনতা যুদ্ধের বই বাজারে-আমি তার অনেকগুলিই দেখেছি। পাবলিক লাইব্রেরীতে গেছি-দেখেছি সব মুক্তিযুদ্ধের রূপকথা। ...."-জেনারেল ওসমানি, সাক্ষাতকার, বিচিত্রা, ২৪ নবেম্বর, ১৯৮৩

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা যুদ্ধে বিভেদের পটভূমি ও পরিণতি

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

এক

শতকরা ৮৬জন মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের মানুষ বড় বড় সব জাতীয় ইস্যুতেই ঐকমত্যের পরিচয় দিয়েছে। বৃষ্টিস্নাত, নদী বিধৌত নরম মাটির সবুজ বাংলাদেশের অনুভূতিপ্রবণ মানুষ যেন এক সাথে বসেই সব সময় তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। হিন্দুদের বর্ণাশ্রমপীড়িত এ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নিষ্পিষ্ট মানুষ, যাদের পরিচয় ছিলো ম্লেচ্ছ এবং যাদের মুখের ভাষাকে বলা হতো পক্ষির ভাষা, আত্মরক্ষার জন্যই দল বেঁধে একদিন বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলো। কিন্তু আশ্রয় এ বৌদ্ধ ধর্মই যখন হিন্দু ধর্মের গ্রাসে পরিণত হলো, তখন এ দেশের সংগ্রামী মানুষ শান্তি ও স্বস্তির সন্ধানে মুক্ত মানুষ হবার পথ হিসেবে দল বেঁধে আবার ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিলো। এ রকমটা ভারতের আর কোথাও হয়নি। তাইতো দেখা যায় দিল্লী এবং তার আশপাশ ৮শ বছরের মুসলিম শাসনের কেন্দ্র হলেও সে অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যালঘু। অথচ বাংলাদেশ মুসলিম শাসন কেন্দ্রের সবচেয়ে দূরে অবস্থান করার পরেও সেখানে মুসলমানরা সংখ্যা গুরু। হিন্দুদের নিপীড়ন ও বর্ণাশ্রম বিরোধী বাংলাদেশের মানস-প্রকৃতিই নিসন্দেহে এ বৈশিষ্ট্যের কারণ। শুধু তাই নয় বাংলাদেশের উদার ও সংগ্রামী হৃদয় ভারতের মুসলমানদের দুর্দিনগুলোতে ইসলাম ও মুসলমানদের আশ্রয় হিসেবেও কাজ করেছে। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর শাসন শুরুর সময় থেকে শুরু করে বাংলায় মুসলিম শাসনের শেষ পর্যন্ত মোট ৫৬২ বছরে ৭৬জন মুসলিম গভর্নর, রাজা এবং শাসনকর্তা বাংলাদেশে শাসন কাজ পরিচালনা করেন। এ ৭৬ জনের মধ্যে ১৬জন ছিলেন দিল্লীর ঘোরী ও খিলজী সম্রাটদের নিয়োগকৃত গভর্নর, ২৬জন ছিলেন স্বাধীন শাসক এবং অবশিষ্ট ৩৪জন ছিলেন মুঘল সম্রাটদের প্রতিনিধি বা সুবাদার। এঁদের গোটা শাসনকালেই বাংলাদেশ সারা ভারতের দুর্গত, বিপদগ্রস্ত, বিতাড়িত মুসলিম পরিবার ও ব্যক্তিত্বের জন্যে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে কাজ করেছে।[১] এ কারণে বাংলাদেশকে অনেকেই ভারতবর্ষের 'মদীনা' বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুত বর্ণাশ্রয়ী ধর্মের প্রতিভু প্রচণ্ড জাত- বিদ্বেষী আর্যদের ব্যাপারে বাংলাদেশী জনগণের প্রবল মানসিক বৈরীতা এবং আরবের সেমেটিক জনগোষ্ঠী ও তাদের একত্ববাদী ধর্মের সাথে তাদের যেন সহজাত একাত্মতা লক্ষ্য করা যায়। সমাজ বিজ্ঞানীরা এর কারণ সন্ধান করেছেন।

---

১. The origin of the Musalmans of Bengal, Page 17-31 (khandkar Fazli Rabbi, first Pub, 1895)

www.bjilibrary.com

তাঁরা বলছেন, হরপ্পা ও মহেনজোদাড়ো সভ্যতার জনক বাংলাদেশী জনগণ মূলত সেমিটিক দ্রাবিড়। সেমিটিকদের আদি নিবাস আরব ভূখণ্ড থেকেই তারা এসেছেন।[২] অনেক সমাজ বিজ্ঞানী বাংলাদেশী জনগণের সাথে সেমিটিক আরবদের নাড়ির সম্পর্ক সন্ধান করতে গিয়ে বলছেন, খোদ 'বাংলা' শব্দটি আরবী শব্দমালার পরিবর্তিত রূপ।'[৩] 'বাংলা' শব্দের মতো বাংলাদেশের অনেক স্থান-নামের উৎস ও বলা হয় আরবী। যেমন বিক্রমপুর। বিক্রমপুরের উৎস বলা হচ্ছে আরবী শব্দ থেকে।[৪] আরবী মূল

---

২. Encyclopaedia Britanica জানাচ্ছে "At a still pre historic stage, it is believed that an inflow of what are losely called Dravidian races made its way through Baluchistan from western Asia and slowly penetrated to far south." জনাব H. J. Floure তাঁর 'The Dravidian Element in Indian culture' গ্রন্থে বলছেন, "That in so far as the Dravidian civilization was derived from outside sources, its origin is to be traced to Egypt and Mesopotamia, linked up with India by sea commerce." প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Mr Nichalson তার Literary History of the Arabs' গ্রন্থে লিখেছেন, 'The term (semetic) includes the Babylonians, the Assyriars, the Hebrews, the phoemecians, the Armeniasn, the Abyssinians, the sabians, the Arabs." সুতরাং বাঙ্গালী যদি নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের মতেই দ্রাবিড় হয় আর দ্রাবিড় যদি আরব হয়, তদুপরি আরব যদি সেমিটিক হয় তবে বাঙ্গালী যে সেমেটিক আরব গোষ্ঠীরই অধঃস্তন পুরুষ হইতেছে তাহাতে সার সন্দেহ থাকেকি ?-(বাংলার মূল আরবী, অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী, পৃষ্ঠা-১৬)

৩. "বাংলাদেশের প্রাচীন ভৌগলিক ও স্থানীয় বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, উজানের গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চল ছিলো এক সুগভীর ও দুর্ভেদ্য জঙ্গলময় স্থান। উজানের গঙ্গার জঙ্গলময় স্থান বা জ ঙ্গলের আরবী হইতেছে 'বাদিয়াতুল কানকেল আলিয়াহ' বাদিয়া অর্থাৎ জঙ্গলময় স্থান বা জঙ্গল। কানক অর্থ গঙ্গানদী। আলিয়াহ অর্থ উজান। উক্ত 'বাদিয়া কানক আলিয়াহ' হচ্ছে বাদিয়া+কানক+আলিয়া>বাদ্দা কানকাল্লাহ> (প্রাকৃত উচ্চারণ মতে শব্দ-মধ্যে দুই স্বরবর্ণের মধ্যস্থিত ক. গ. চ. ত. দ. প. য়. লোপ পায়,-এ সম্পর্কে ডক্টর শহীদুল্লাহ বিরচিত 'বাংলা সাহিত্যের কথা' প্রথম খণ্ড, পূন দ্রষ্টব্য)>বাঙ্কালাহ>বাঙ্কালা (১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের Gourunal Asiatique-এর ২০৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কান্দাহার শিলালিপিতে দেখতে পাওয়া যায় ঘোড়াঘাট, গৌড়, বাঙ্কালা নামগুলো লেখা হয়েছে কোড়াকাট, কেড়ি এবং বাঙ্গালা রূপে'-বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল-১৩৩৮-১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ, ২য় খণ্ড, শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, এম এ অধ্যাপক বিশ্ব ভারতী পৃষ্ঠা-৩ এবং Gourunal Asiatic-Fevrier-Man, 1890)>বাঙ্গালা>বাংলা (বর্তমান রূপ)" (বাংলার মূল আরবী, অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী, পৃষ্ঠা-১৮)

৪. "Map of Gerard Mercator, 1612> (-Bancala), Bianpur, Bicanpur (Bancala>Baeanur>Bacala+UR UR অর্থাৎ লোকালয়, বন্দর, নগর যাহা মেসোপটেমিয়ার UR নামক একটি বন্দর বা নগরের নাম হইতেই হইয়াছে ......> Bacalaur>Bicanapur>Bicanpor>Bikrampur বা Vikrampur", (বাংলার মূল আরবী, অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী, পৃষ্ঠা-১৮-১৯)

www.bjilibrary.com

থেকে নামগুলো বিকৃত হয়ে পরিবর্তিত রূপ ধারণ করেছে। অনেকগুলোর আবার সুপরিকল্পিতভাবে সংস্কৃত রূপ দেয়া হয়েছে। এ ষড়যন্ত্রের কথা ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও উদারভাবে স্বীকার করেছেন এবং সেই সাথে বলেছেন, নামগুলো দ্রাবিড়ীয়।৫ বলা যায়, বর্ণাশ্রয়ী আর্য হিন্দুদের জুলুম-নিপীড়নে জর্জরিত।৬ বাংলার মানুষ মুক্ত ও মানুষ হবার পথ৭ হিসেবেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বাংলাদেশ হয়ে দাঁড়ায় উপমহাদেশের মুসলমানদের এক আশ্রয় কেন্দ্র-এক মদীনা।

---

৫. "But it is pity that generally there was an attempt to give these names a Sanskrit look ...... In the formation of these we find some word which are distinctively Dravidian. An investigation of place-names of Bengal, as in other parts of Aryan India, is sure to reveal the presence of non-Aryan Speaker, mostly Dravidian, all over the land before the establishment of the Aryantongue." (ডক্টর নীহার রঞ্জনের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' পৃষ্ঠা-৬২)

৬. আর্য হিন্দুরা বাংলার দ্রাবিড় লোককূলের উপর যে বর্বর জুলুম-নিপীড়ন চলায় তার হাজারো মর্মস্পর্শী গাথা ইতিহাস ও লোক কাহিনীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। গোবিন্দ চন্দ্রের ময়নামতি প্লেটে স্বামীহারা ম্লেচ্ছ নারী (দ্রাবিড় নারী)দের বিলাপের একটা চিত্র আছে। উক্ত প্লেটের সপ্তম শ্লোকের বিবরণ এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ "7th Verse-refers to kalyan candra's fight aganist Mlecchas and it is said that he made the river Lohitaya (Brahoma putra) redoubled by the tears droping from the eyes of the Mleccha Ladies, Who were agitated owing to killing of their husbands." (Dynastic History of Bengal, Page-179)

৭. "................. পূর্ব বাংলার চাষী-বাসিন্দাদের অধিকাংশই হচ্ছে মুসলমান। এ অঞ্চলের জলাভূমি ও নদী বহুল জেলাগুলোর আদি বাসিন্দাদেরকে কখনো ভদ্র হিন্দু সমাজে স্থান দেয়া হয়নি। দক্ষিণ দিকে আকর্ষণ ও এ রকম উপযুক্ত সংখ্যায় উপনিবেশ স্থাপন করেনি যার দ্বারা সাগর-উপকূলের এবং বদ্বীপের বাসিন্দাগণকে পুরাকালীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গণ্ডীভুক্ত করা যেতে পারতো। এজন্যে তারা হিন্দু উচ্চবর্ণের গণ্ডীর বাইরেই থেকে যায়। এ চণ্ডালেরা দূরবর্তী সাগরের খাড়িতে মাছ ধরে খেতো এবং বন্যা উপদ্রুত ক্ষেত্র থেকে অতিকষ্টে ধান জন্মিয়ে ঘরে তুলতো। তাদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিলো না। অথবা তারা কোনো ধর্মের বিধি নিষেধেরও ধার ধারতো না। তারা এতোদূর অদ্ভুত সে, উচ্চ কোনো ব্রাহ্মণ সে অঞ্চলে গিয়ে তাদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বাস করতে পারে না, ফলে কয়েক পুরুষের মধ্যে সে উত্তর ভারতের বাসিন্দা তার আপন বংশের সকল রক্তগত সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (তার কারণ এই যে, বহু বছর তারা এসব অস্পৃশ্য চণ্ডালের সাথে বাস করেছে ও তাদের পৌরোহিত্য করেছে)। মুসলমানদের এসব বর্ণবৈষম্যের বালাই ছিলো না। তারা কখনো বিজয়ীর বেশে বসতি স্থাপন করতো, আবার কখনো ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ বদ্বীপে আগমন করতো। .... মুসলমানরা দক্ষিণ অঞ্চলে এ রকম বহু পতিত ভূমি আবাদ করে বসতি স্থাপন করেছিলো এবং এজন্যে তারা পূর্ব বাঙলার নাম রেখে গেছে প্রথম পানি ও মাটির পৃথককারী হিসেবে। আজও শিকারীরা তাদের কতো বাঁধ ডিঙ্গিয়ে, পাকা সড়ক বেয়ে, কতো মসজিদ, মাযার, দীঘি পার হয়ে জংগলের নির্জনতম অঞ্চলে প্রবেশ করে। কারণ মুসলমানরা যেখানেই গেছে, সেখানেই ধর্ম প্রচার করেছে। কতকটা তলোয়ারের জোরে, কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষেরই হৃদয়ের কোমলতম দুটো তন্ত্রীতে সজোরে আঘাত করে। হিন্দুরা এ বদ্বীপের বাসিন্দাদেরকে কখনো তাদের সমাজে স্থান দেয়নি। মুসলমানরা ব্রাহ্মণ ও নীচ জাতি নির্বিশেষে ইসলামের পূর্ণ অধিকার সবাইকে সমানভাবে দান করেছিলো। তাদের উৎসাহী ধর্ম প্রচারকরা এ শিক্ষা দিয়েছিলো-"তোমরা সকলেই তোমাদের আল্লাহর কাছে নতজানু হও, তার দৃষ্টিতে সব মানুষই সমান, সব সৃষ্টিজীব ধরার ধূলার মতোই.......... এক আল্লাহ ছাড়া আর প্রভু নেই এবং মুহাম্মদ তার রাসূল।"-(The Indian Musalmans, W. W. Hunter, Page-149-150.

www.bjilibrary.com

এ ঐতিহ্যবাহী ও সংগ্রামী মানুষরা তাদের ভাগ্যের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে কখনই ভুল করেনি। ১৭৫৭ সালে পলাশীর রণাঙ্গনে এদেশের স্বাধীনতা যখন বিজাতীয় শক্তির হাতে চলে গেল, তখন জনগণ সে সময়ের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে কিছুই জানতে পারেনি। তাই তারা কোনো সম্মিলিত সিদ্ধান্তও নিতে পারেনি। কিন্তু যখনই জানতে পারলো, তখনই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ঝাণ্ডা তারা উড্ডীন করলো। বৃটিশ শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত এ ঝাণ্ডা তাদের অবনমিত হয়নি। ফকির বিদ্রোহ, ওয়াহাবী আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ এবং সর্বশেষে পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশদের হটিয়ে স্বাধীন আবাসভূমি লাভ করে তবেই তারা ক্ষান্ত হয়। ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান ইস্যুর উপর গৃহীত রেফারেণ্ডামে বাংলাদেশের মানুষ একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন আবাসভূমির পক্ষে রায় দেয়ার ক্ষেত্রে যে ঐক্যের পরিচয় দিয়েছিলো, তার দৃষ্টান্ত ভারতের আর কোথাও পাওয়া যায়নি। এখানে তারা ব্যক্তির চেয়ে লক্ষ্যকেই বড় করে দেখেছিল। তাই তো দেখা গেছে, জনগণের যে লক্ষ্য ছিলো, তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে বড় বড় ব্যক্তিত্ব ধরাশায়ী হয়েছেন। এ চিত্র আমরা দেখি ১৯৫৪ সালে আবার। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ সরকারকে সরিয়ে দেবার জন্যে জনগণ আবার ঐক্যবদ্ধ হয়। এখানেও মানুষ লক্ষ্যকেই বড় করে দেখে-ব্যক্তিকে নয়। এ কারণেই দেখা গেল, লক্ষ্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে কলা গাছও নির্বাচিত হয়ে এলো। ১৯৭০ সালে এরই পুনরাবৃত্তি ঘটলো। এখানেও মানুষ লক্ষ্যকেই বড় করে দেখলো। অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার বাংলাদেশী জনগণ তাদের শোষণ মুক্তির প্রোগ্রাম মনে করে ৬ দফার পক্ষে একযোগে ভোট দিলো। লক্ষ্যের পক্ষে যাকে পেয়েছে, নির্বিচারে ভোট দিয়ে তাকেই তারা জিতিয়ে দিয়েছে। এ নির্ভেজাল ঐক্য তাদের ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। এদিন পর্যন্ত দল-মত নির্বিশেষে বাংলাদেশের সব মানুষ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে তাঁর পেছনে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাক-বাহিনী আওয়ামী লীগ বিরোধী অভিযানের নামে বাংলাদেশী জনগণের উপর নির্বিচারে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যখন ভারত চলে গেল, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হলো এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলো, তখন ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জাতির অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক ইস্যুতে জাতির মধ্যে বড় ধরনের বিভেদ দেখা দিলো। ঐতিহ্যবাহী এক জাতি হওয়া সত্ত্বেও

www.bjilibrary.com

স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রশ্নে বিভক্ত মতের উত্থান ঘটলো। এ ধরনের কথা শ্রবণ যন্ত্রের জন্যে বড় কষ্টদায়ক হলেও বেদনাদায়ক এ সত্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারবো না, এড়িয়ে যেতে পারবো না। ইতিহাস ইতিহাসই। ইতিহাস বলছে, ২৫ মার্চের সেনা-অভিযান-উদ্ভূত অশান্তি ও অনিশ্চয়তার শিকার হওয়ার পরও এক শ্রেণীর মানুষ ভারতে যায়নি, এক শ্রেণীর দল ও গোষ্ঠী স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেয়নি। যাদের সংখ্যা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতোই বিপুল। দলীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে যদি আমরা এ বিভক্তির বিচার করি, তাহলে দেখবো, আওয়ামী লীগ, মস্কোপন্থী ন্যাপ ও কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং এদের অংগদল ও সমমনা গ্রুপ ও দলই তখন স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলো, অন্যদিকে মুসলিম লীগ, পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও এদের অংগ দল এবং ইসলামপন্থী বলে পরিচিত সকল দল, গ্রুপ ও ব্যক্তিত্বই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলো। এই সাথে চীনপন্থী বাম দলগুলোও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেয়নি। দেখা গেল, হাজার হাজার সংখ্যায় বাঙালী যুবকরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলো, সেই হাজার হাজার সংখ্যায় তারা আবার যোগ দিলো রাজাকার বাহিনীতেও।

একটি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জনমতের এ ধরনের বিভক্তি অভূতপূর্ব। ১৯৪৭ সালে সমাপ্ত হওয়া বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে এ বিভক্তি আমরা দেখিনি। বৃটিশকে তখন সমর্থন করা দূরে থাক, শক্তিশালী প্রচারনা সত্ত্বেও কংগ্রেসও বাংলাদেশ থেকে কোনো জনশক্তি তার পক্ষে পায়নি। দল-মত নির্বিশেষে সবাই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাস ভূমির জন্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। এ একই দৃশ্য আমরা দেখি আমাদের অতি কাছের ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া সহ এশিয়া-আফ্রিকার সব দেশের সব জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে। কোথাও কখনও এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বৈরী শক্তির কাছে আত্মবিক্রয় করতে হয়তো আমরা দেখি, কিন্তু কোথাও কোনো জাতিকে এভাবে জাতির অস্তিত্বের ইস্যুতে বিভক্ত হতে আমরা দেখি না। ইতিহাস তাই এ প্রশ্ন অতি বড়ো করেই আমাদের সামনে তুলে ধরছে, স্বাধীনতা যুদ্ধে এ অভূতপূর্ব বিভক্তি আমাদের তাহলে কেন?

অতি বড় এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের আগে সেই সময় কার্যরত প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো, যারা ছিলো এ জাতীয় বিভক্তির প্রধান নিমিত্ত, তাদের পরিচয় সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

www.bjilibrary.com

আওয়ামী লীগ

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' নাম নিয়ে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সৃষ্টি মূলত মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলেরই ফল। মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসা কিংবা মুসলিম লীগ থেকে বের করে দেয়া নেতা ও কর্মীদের নিয়েই এ দল গঠিত হয়। যারা আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করলেন, তাদের অনুভূতি তখন এ রকম ছিলো যে, সরকারী মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে তারা জনগণের মুসলিম লীগ গঠন করছেন।[৮] ঢাকার 'রোজ গার্ডেন'-এর হল কামরায় অনুষ্ঠিত প্রায় শ' তিনেক ডেলিগেটের উপস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলো। সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন আসাম মুসলিম লীগের সাবেক সভাপতি এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সদস্য পদ বঞ্চিত মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। মূল সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন জনাব আতাউর রহমান খান। সম্মেলন মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি এবং টাঙ্গাইলের শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করলো।[৯]

পূর্ব পাকিস্তানে এতোদিন কোনো কার্যকরী বিরোধী দল ছিলো না। আওয়ামী মুসলিম লীগই প্রথম সত্যিকার বিরোধী দল হিসেবে মাঠে এলো। দলে স্বাভাবিকভাবেই সংগ্রামী ও তরুণদের আধিক্য ছিলো। মুসলিম লীগের কর্মসূচীহীন ও প্রাসাদ-রাজনীতির মুকাবিলায় আওয়ামী মুসলিম লীগ জনগণকে আকৃষ্ট করার মতো দলীয় নীতিও গ্রহণ করে। তাদের প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোষণায় পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন, বিনা ক্ষতি পূরণে জমিদার প্রথার উচ্ছেদ, কৃষকদের মধ্যে কৃষি জমির বন্টন, তেভাগা নীতির বাস্তবায়ন, রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে সমবায় ও যৌথ কৃষি ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা,

---

৮. "দেখা গেলো, আমরা কতিপয় ছাত্র ব্যতীত আর সকলেই আওয়ামী মুসলিম লীগ নামকরণের ঘোর পক্ষপাতি। তাহাদের যুক্তি, আমরা সকলেই মুসলিম লীগ। আকরম খাঁ, নূরুল আমীন, চৌধুরী খালিকুজ্জামান ও লিয়াকত আলী পরিচালিত মুসলিম লীগ হইল সরকারী মুসলিম লীগ এবং আমাদেরই হইবে আওয়ামের অর্থাৎ জনগণের মুসলিম লীগ।"-(জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-১০০)

৯. সভাপতি ঃ মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সহ সভাপতি ঃ আতাউর রহমান খান, সাখাওয়াত হোসেন, আলী আহাম্মাদ খান, সাধারণ সম্পাদক ঃ শামসুল হক, যুগ্ম সম্পাদক ঃ শেখ মুজিবর রহমান, সহ সম্পাদক, খন্দকার মুশতাক আহমদ, এ. কে. এম. রফিকুল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ ঃ ইয়ার মোহাম্মদ খান।

www.bjilibrary.com

কমনওয়েলথ থেকে সদস্য পদ প্রত্যাহার এবং জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির দাবী জানানো হয়। মৌলিক শিল্পের রাষ্ট্রীয়ত্তকরণের দাবীও এ ঘোষণায় ছিলো। শুরু থেকেই এ দলের ঘোষণায় একটা র‍্যাডিক্যাল প্রবণতা লক্ষণীয়। এর কারণ কিছু তরুণ কর্মী ও প্রবীণ নেতৃত্বের উপর বামপন্থী চিন্তার প্রভাব। ভাসানীর নেতৃত্বে এ প্রভাব পরবর্তীকালে আরও বাড়ে।

১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। এ অধিবেশনে ভাসানীকে সভাপতি এবং শেখ মুজিবকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়। এ কাউন্সিলের পূর্বের নীতিগত ঘোষণা বহাল রাখা হয় এবং রাজনৈতিক একটি প্রস্তাবে দেশরক্ষা, মুদ্রা ও পররাষ্ট্রনীতি ছাড়া সকল বিষয়ের কর্তৃত্বসহ পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দাবী করা হলো। সোহরাওয়ার্দী এ সময় পুরোপুরি আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করলেন। 'পাকিস্তান জিন্নাহ্ আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে তাঁর একটি দল ছিলো। ১৯৫৩ সালের ২১ এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে দুই দলকে একীভূত করা হয় এবং 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ'কে পাকিস্তান ভিত্তিক করার জন্য 'পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' গঠনের উদ্দেশ্যে সোহরাওয়ার্দীকে এর আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হয়।

সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী মুসলিম লীগে প্রবেশকে মাওলানা ভাসানী ভালো চোখে দেখেননি। বামচিন্তা ও বামপন্থীদের প্রভাবে ভাসানী দলের বৈদেশিক নীতিকে জোট নিরপক্ষে করণের নামে কম্যুনিষ্ট ব্লক-মুখী করতে চাচ্ছিলেন। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দাবী-দাওয়ার প্রশ্নেও বিপ্লবাত্মক নীতি অনুসরণ করছিলেন। অন্যদিকে সোহরাহওয়ার্দী ছিলেন কম্যুনিষ্ট ব্লকের প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিবাদী পশ্চিমের একনিষ্ঠ ভক্ত। এ দুই বিপরীতমুখী মানসিকতা আওয়ামী লীগে ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে ওঠে। ৫৪ সালে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ সহ বিরোধী দলগুলো যুক্তফ্রন্ট[১০] গঠনের মাধ্যমে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচন

---

১০. ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টি), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাষানী (আওয়ামী মুসলিম লীগ) নেজামে ইসলাম পার্টি, গণতন্ত্রী দল ও খেলাফতে রব্বানী পার্টির সমন্বয়ে ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৪৩ এবং কৃষক শ্রমিক পার্টি ৪৮ সহ যুক্তফ্রন্ট মোট ২২৩টি আসন লাভ করে এবং মুসলিম লীগ পায় ১০। অবশিষ্ট ৭২টি সংখ্যালঘু আসনের ২৫টি পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন ২৭, কম্যুনিস্ট পার্টি ৪ এবং গণতন্ত্রী দল ৩টি আসন লাভ করে।

www.bjilibrary.com

করে। নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর আওয়ামী লীগের মধ্যকার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য আরও স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ওঠে। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফাকে[১১] পদদলিত করে সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম

---

১১. যুক্তফ্রন্টের বহুল আলোচিত ২১ দফা ছিলো নিম্নরূপ ঃ

"নীতি ঃ কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

(১) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ ক্ষমতা ভোগ দখলের পথে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের একটি গ্রুপ প্রতিবাদের পথ

(২) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে।

(৩) পাট ব্যবসার জাতীয়করণ, পাট চাষীদের পাটের ন্যায্য মূল্য দান, মুসলিম লীগ আমলের পাট কেলেংকারির তদন্ত।

(৪) সমবায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন, সকল কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন।

(৫) পূর্ব পাকিস্তানের লবণ শিল্পকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, লবণ কেলেংকারির জন্য দায়ী মুসলিম লীগ মন্ত্রী সভার সদস্যদের শাস্তি বিধান।

(৬) খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা ও খরার হাত হইতে রক্ষা।

(৭) পূর্ব পাকিস্তানকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত, কৃষিকে যুগোপযোগী করিয়া দেশকে শিল্প ও খাদ্যে স্বাবলম্বী করা এবং I. L. O. এর বিধান অনুসারে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

(৮) শিল্পী ও কারিগর মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা।

(৯) প্রাথমিক, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষকদের ন্যায়সংগত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা।

(১০) শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের মধ্যকার পার্থক্য দূর করা, শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন, ভাতার ব্যবস্থা।

(১১) 'ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন' বাতিল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসন দান, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সহজ লভ্য এবং ছাত্রাবাসকে অল্প ব্যয় সাধ্য করা।

(১২) শাসন ব্যয় হ্রাস, উচ্চ বেতন কমিয়ে, নিম্ন বেতন বাড়িয়ে সামঞ্জস্য বিধান, যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা ১ হাজার টাকার বেশী বেতন না নেয়া।

(১৩) দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ রিসাওয়াত বন্ধ করা, ১৯৪০ সালের পরবর্তী পিরিয়ডের জন্যে সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারী ও ব্যবসায়ীদের সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ এবং অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা।

(১৪) 'জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স' প্রভৃতি কালাকানুন বাতিল, বিনা বিচারে আটকদের মুক্তি দেয়া এবং সংবাদপত্র ও সভা সমিতির অধিকার নিরংকুশ করা।

(১৫) বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগকে পৃথক করা।

(১৬) যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের বদলে কম বিলাসের বাড়ীতে বাস করবেন।

(১৭) ভাষা শহীদদের শাহাদাতের স্থানে শহীদ মিনার স্থাপন ও শহীদ পরিবারের ক্ষতিপূরণ।

www.bjilibrary.com

লীগ ক্ষমতা ভোগ দখলের পথে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের একটি গ্রুপ প্রতিবাদের পথ অনুসরণ করে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যখন যুক্তফ্রন্ট সরকারের উপর যুলুম-নিপীড়ন চালাচ্ছিলো, যখন ইউরোপ সফররত ভাসানীকে দেশে ফিরতে দিচ্ছিলো না, তখন সোহরাহওয়ার্দী কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দান করলেন এবং শেখ মুজিব ও আওয়ামী মুসলিম লীগ তাকে সমর্থন করলো। কনভেনশনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র তৈরির কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণাকে কৃষক শ্রমিক পার্টি থেকে শুরু করে মুসলিম লীগ পর্যন্ত সকলে বিরোধিতা করেছিলো, কিন্তু সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ তার বিরোধিতা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু কোলকাতা থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসিত মাওলানা ভাসানী, যিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি, এর বিরোধিতা করেন। এমনকি সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব ১৯৫৫ সালের ৭ জুলাই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সংখ্যা সাম্য নীতি মেনে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাধিক্যের ন্যায্য দাবীকে বিসর্জন দিলেন। এটাও ভাসানী পক্ষ এবং অন্যান্যরা মেনে নেয়নি। অবশেষে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যায় এবং বিদেশ নীতি ও আভ্যন্তরীণ নীতির প্রশ্নে আওয়ামী মুসলিম লীগ ভাঙনের দিকে ছুটে যায়। ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের সরকার গঠন হয় এবং কেন্দ্রেও সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী। এরপর ভাসানী গ্রুপের সাথে তাদের বিরোধ আরও বেড়ে চলে। বিরোধ সংঘাত-সংঘর্ষে রূপ নেয়। এর মধ্যেও ১৯৫৬ সালে ভাসানীর প্রবল চাপে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাক

---

(১৮) ২১ ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ও সরকারী ছুটি ঘোষণা।

(১৯) ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বশাসিত ও সভরিন করা হইবে, দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্র নীতি ও মুদ্রা ছাড়া সব বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের হাতে থাকবে, নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে থাকবে, অস্ত্র তৈরির কারখানা স্থাপনসহ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা।

(২০) যুক্তফ্রন্ট কোনো অজুহাতেই আইন পরিষদের মেয়াদ বাড়াইবে না, মেয়াদ শেষ হবার ছ মাস আগে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা।

(২১) যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে পরিষদের কোনো সদস্য পদ খালি হলে তিন মাসের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা, পর পর ৩টি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ।-(অলি আহাদের 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫ গ্রন্থ থেকে (পৃষ্ঠা-২০১-২০৫) সংক্ষিপ্ত।

www.bjilibrary.com

আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সরকারীভাবে পূর্ব পাক পার্লামেন্টে স্বায়ত্ত শাসনের বিল উত্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অনেক গড়িমসির পর বিলটি পার্লামেন্টে আনা হয় এবং তা পাস হয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করলেন সোহরাওয়ার্দী। তিনি বললেন, "পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে প্রাদেশিকতার বীজ উস্কে দিয়ে কিছু লোক সেখানে নায়ক হতে চাচ্ছেন এবং এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা তাদের সাথে এক সাথে থাকতে চান না।"[১২] এছাড়া প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৭ সালের ১৫ জুন পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের জনসভায় বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তানকে শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে।' এর আগেও ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে মাওলানা ভাসানী যখন ২১ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্ত শাসনের কথা বললেন, তখন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী তাঁর ভাষণে বলেন, শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে ৯৮ ভাগ স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[১৩] সোহরাওয়ার্দীর ঐ বিবৃতির পর আওয়ামী লীগের মধ্যে সংঘাত তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং ভাঙন চূড়ান্ত রূপ নেয়। ১৯৫৭ সালের ২৫ ও ২৬ জুলাই ভাসানী ঢাকায় গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব এক বিজ্ঞপ্তি মারফত এ সম্মেলনে যোগ না দেয়ার জন্যে আওয়ামী লীগ কর্মীদের নির্দেশ দেন। অবশেষে ভাসানী পন্থীরা সম্মেলনে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ভাঙন সম্পূর্ণ রূপ দিলেন।

ভাসানী ও তাঁর গ্রুপ চলে গেলেও আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে কোন্দল শেষ হয়নি। সংঘাত শুরু হয় এবার মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবের মধ্যে যার নিরসন সোহরাওয়ার্দীও করতে পারেননি। এ সংঘাতের পরিণতি ১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাক সংসদে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীর হত্যা।

---

১২. বিচিত্রা, নবেম্বর, ১৯৮৬ (আওয়ামী লীগের ৩৭ বছর)

১৩. বিচিত্রা, নবেম্বর, ১৯৮৬ (আওয়ামী লীগের ৩৭ বছর) আওয়ামী লীগের ভাসানী গ্রুপের সাথে আওয়ামী লীগের সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের সম্পর্ক এতোটাই খারাপ হয়ে পড়ে যে, "প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী মাওলানা ভাসানীকে 'ভারতের অর্থপ্রাপ্ত অনুচর' হিসেবে চিহ্নিত করে একাধিক ভাষণে বলেন যে, তিনি ভাসানীর মতো 'পাকিস্তান ভাঙ্গনের নৃত্যে অংশ নিতে' বা 'ভারতের অংগ রাজ্যে পরিণত হতে' রাজী নন, কেননা আমার এ হাত পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার জন্যে। বিচিত্রা, নবেম্বর, ১৯৮৬ (আওয়ামী লীগের ৩৭ বছর)

www.bjilibrary.com

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর গোটা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হবার পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়ে। ১৯৬২ সালের ৮ জুন জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন প্রত্যাহার করলেন। সামরিক শাসন জারির ফলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা হারায়, সুতরাং এ দলই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বোধহয় সে কারণেই মার্শাল–ল' প্রত্যাহার হবার পর আওয়ামী লীগ পুনর্জীবিত না করে সোহরাওয়ার্দী চাইলেন সম্মিলিতভাবে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। সুতরাং ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট গঠিত হলো। অন্যদিকে মুসলিম লীগররা (কনভেনশন পন্থী) আইয়ুবের পিছনে সমবেত হয়ে মুসলিম লীগ পুনর্গঠিত করলেন। এন ডি এফ এর আন্দোলন তেমন ভালো এগুলো না। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী মারা গেলেন। অতপর আতাউর রহমান খান আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতাদের বাধা উপেক্ষা করে শেখ মুজিব ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারী আওয়ামী লীগ পুনর্জীবিত করলেন। ১৯৬৪ সালের ৬ মার্চ অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে এ সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হলো। তাদের আন্দোলনের প্রধান টার্গেট হলো দুটো ঃ এক, প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটাধিকারের[১৪] ভিত্তিতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, দুই, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠন। কিন্তু তাদের একক আন্দোলন বেশী দূর এগুলো না। ১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারী ছিলো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ। এ নির্বাচনে সম্মিলিতভাবে সরকারী দলকে মুকাবিলার জন্যে আওয়ামী লীগ সহ বিরোধী দলগুলো ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে 'Combined opposition party' (cop) গঠন করলো।[১৫]

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের[১৬] পরপরই মার্চে জাতীয় পরিষদ[১৭] এবং এপ্রিলে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

---

১৪. আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন যাতে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচন করবেন।

১৫. Cop-এর অংগ দলগুলো ঃ মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী এবং নেজামে ইসলাম পার্টি।

১৬. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কনভেনশন মুসলিম লীগ প্রার্থী আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানে ২১০১২ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২৮৯২১ মোট ৪৯৯৩৩ ভোট পান। আর Cop এর প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে ১৮৪২৪ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১০২৪৪ মোট ২৮৬৬৮ ভোট পান।

১৭. "জাতীয় পরিষদে সম্মিলিতভাবে কাজ করিবার নিমিত্ত বিরোধী দল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পাকিস্তান মুসলিম লীগ, পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (NDF) সম্মিলিত বিরোধী দল (Combined opposition party) গঠন করে এবং নূরুল আমীন, শাহ আজিজুর রহমান ও কামারুজ্জামান যথাক্রমে নেতা, উপনেতা ও সম্পাদক নির্বাচিত হন"–(জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা–৩৪৬)

www.bjilibrary.com

হয়। ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর শুরু হয় পাক ভারত যুদ্ধ। সুতরাং আওয়ামী লীগের পক্ষে ব্যাপকভাবে দলীয় ভিত্তিতে কাজ করার সুযোগ গোটা ১৯৬৫ সালেই তেমন একটা হয়নি। অবশ্য পাক-ভারত যুদ্ধ অবসানের পর বছরের শেষ প্রান্ত থেকে এ সুযোগ এ দলই পেয়ে গেল।

আওয়ামী লীগ ছিলো প্রকৃতই বিরোধী দলীয় মেজাজ সম্পন্ন একটি গণসংগঠন। জনপ্রিয় কিংবা জনপ্রিয় হতে পারে এমন দাবী নিয়ে মাঠে নামা এবং জনমত জয় করে ক্ষমতায় যাবার অভিজ্ঞতা তার ছিলো।[১৮] তারা পাকিস্তানের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বুঝলো আন্দোলনের জন্যে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি খুবই উর্বর। যুদ্ধকালীন অবস্থা দেখে পূর্ব পাকিস্তান যে একেবারেই বঞ্চিত, অরক্ষিত এ অনুভূতি সকলের মনে তীব্র হয়ে উঠেছিলো।[১৯] এ অবস্থায় শেখ মুজিব ১৯৪৯ ও ১৯৫৪ সালের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে আন্দোলনের সূচনা হিসেবে লাহোরে আয়োজিত বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে (৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬) ৬ দফা কর্মসূচী পেশ করলেন। শেখ মুজিবের এ ৬ দফার প্রথম দফায় ফেডারেল ও পার্লামেন্টারী ধরনের সরকারের কথা বলা হলো। দু নম্বর দফায় বলা হলো, ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতি এবং শর্তাধীনে মুদ্রা। এ শর্তের কথা বলা হয়েছে তৃতীয় দফায়। বলা হলো, দেশের দুটি অংশের জন্যে দুটি পৃথক ও সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে, অথবা মূলধন পাচার বন্ধের গ্যারান্টি সহ দুই অঞ্চলের জন্যে একই মুদ্রা থাকবে। চতুর্থ দফায় রাজস্ব সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ ও ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা দেয়া হলো প্রদেশ বা অংগরাষ্ট্রগুলোর হাতে। প্রদেশগুলোর বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসাব ও ব্যবস্থাপনার বিধান ছিলো পঞ্চম দফায়। ষষ্ঠ দফায় ফেডারেল রাষ্ট্রের অংগরাষ্ট্রগুলোকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিশিয়া রাখার ক্ষমতা দেয়া হলো। শেখ মুজিবের এ ৬ দফার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ৬ দফার তৃতীয় দফা ছাড়া অন্যান্য দফাগুলো মূলত যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার বক্তব্য থেকে খুব নতুন কিছু নয়। ৬ দফায়

---

১৮. ১৯৫৪ সালে এ ঘটনাই ঘটে। অবশ্য ক্ষমতায় গিয়ে জনগণের দাবী মনে না থাকাও তার একটা অভ্যাস, যার দৃষ্টান্ত ৫৬ থেকে ৫৮, '৭২ থেকে '৭৪ এবং '৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত তার শাসনকালগুলো।

১৯. "পাক-ভারত যুদ্ধকাল পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় রাজধানী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলো। এখানকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিলো অত্যন্ত দুর্বল। ফলে এ দেশ রক্ষার দায়িত্বভার পড়িয়াছিলো গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের উপর। ইত্যাকার তথ্য ও বক্তব্য মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, চাকরীজীবী সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে আলোড়িত করে।"-(জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-৩৪৯

www.bjilibrary.com

মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের কথা আছে, কিন্তু ২১ দফায় আছে আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরের কথা। স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃতি প্রশ্নে ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের কথা ৬ দফায় আছে, কিন্তু ২১ দফায় নেই। কিন্তু ২১ দফায় এর চেয়েও বড় কথা আছে। ২১ দফায় ১৯তম দফায় 'পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেয়ার' পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানকে এমনকি 'সভরেন' (সার্বভৌম) করার কথা বলা হয়েছিলো।

অথচ এ ৬ দফাই চারদিকে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং সরকারী দল একে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' পদক্ষেপ বলে অভিহিত করে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রপাগাণ্ডা শুরু করলো। যারা আওয়ামী লীগের সাথে এক সাথে গণতান্ত্রিক ও বিরোধী দলীয় আন্দোলন করে আসছিলো, সেই নেজামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলো ৬ দফা কর্মসূচীকে পাকিস্তানের 'সংহতি বিরোধী' 'ভারতের ষড়যন্ত্র' 'পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কর্মসূচী' হিসেবে অভিহিত করলো। এমনকি পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবাজাদা নসরুল্লাহ খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবদুস সালাম খানও ৬ দফার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন।[২০] ২১ দফার বিরুদ্ধে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া না হওয়া এবং ৬ দফার ক্ষেত্রে হওয়ার পেছনে কয়েকটি পরিস্থিতিগত কারণ কাজ করেছে ঃ এক, "এমন একটি সময়ে মুজিব ৬ দফা উপস্থাপিত করলেন, যখন যুদ্ধে পরাজয় এবং তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে 'জাতীয় স্বার্থ ও সম্মান' ভারতের হাতে তুলে দেয়ার অভিযোগে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিকরা একদিকে আইয়ুব বিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছিলেন, অন্যদিকে ক্ষমতার, 'প্রাসাদ নিয়ন্ত্রকরা' ও তাঁকে অপসারণের জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছিলো।[২১] দুই, পাক-ভারত যুদ্ধোত্তর সেই সময়ে জনগণের মধ্যে ভারতের মতলব সম্পর্কে উদ্বেগ, আশংকা এবং সেন্টিমেন্ট তীব্র হয়ে উঠেছিলো। তিন, পাক ভারত যুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগের ভূমিকা ছিলো দ্ব্যর্থবোধক। ভারতের বিরুদ্ধে তার কোনো স্পষ্ট ও শক্ত বক্তব্য পাওয়া যায়নি। প্রথমোক্ত কারণে সরকার তার নিজ স্বার্থে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করে। আর শেষোক্ত দুটি কারণে আওয়ামী লীগ সহযোগী বিভিন্ন দলের সন্দেহ ও সমালোচনার শিকার হয়। মাওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল

২০. বিচিত্রা, নবেম্বর, ১৯৮৬ (আওয়ামী লীগের ৩৭ বছর)
২১. বিচিত্রা, নবেম্বর, ১৯৮৬ (আওয়ামী লীগের ৩৭ বছর)

www.bjilibrary.com

আওয়ামী পার্টিও ৬ দফাকে পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজির সাথে মুকাবিলায় পরাস্ত এবং অবদমিত বাঙালী ধনিক শ্রেণীর অবাধ বিকাশের কর্মসূচী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলো।[২২]

আওয়ামী লীগ ৬ দফার প্রচার শুরু করার সাথে সাথেই সরকারী তরফ থেকে তার উপর জুলুম-নির্যাতন নেমে এলো। এপ্রিলের মধ্যেই শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হলো। মে মাসের শুরুর দিকে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ শীর্ষ নেতা কারান্তরালে চলে গেলেন। প্রচণ্ড সরকারী দমন এবং সাধারণ মানুষের সমর্থনহীন আওয়ামী লীগের একক আন্দোলনের ব্যর্থতা সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের বিপর্যয় ঘটিয়েছিলো।[২৩] ১৯৬৬ সালের জুন মাসের মধ্যেই আওয়ামী লীগ নির্জীব হয়ে পড়লো। এর উপর আওয়ামী লীগে দেখা দিলো ভাঙন। রাজনৈতিক আন্দোলনের বিপর্যস্ত অবস্থায় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ৮ দফা কর্মসূচীতে ১৯৬৭ সালের ৩০ এপ্রিল 'পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক মুভমেন্ট' (পিডিএম)[২৪] গঠিত হয়। মাওলানা তর্কবাগিশ, রাজশাহীর মুজিবর রহমান ও আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিরাট অংশ এ আন্দোলনে যোগদান করে।[২৫] ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারী শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী হিসেবে অভিযুক্ত করা হলো।[২৬] বলা হলো, শেখ

---

২২. বিচিত্রা, নবেম্বর, ১৯৮৬ (আওয়ামী লীগের ৩৭ বছর)

২৩. 'আওয়ামী লীগের ৩৭ বছর' বিচিত্রার নবেম্বর, ১৯৮৬

২৪. পিডিএম পন্থী আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি এবং এন ডি এফ সমন্বয়ে পিপিএম গঠিত হয়। আতাউর রহমান খানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নিম্ন ব্যক্তিদের নিয়ে PDM-প্রথম জাতীয় কমিটি গঠিত হয় ঃ

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) থেকে জনাব নূরুল আমীন, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব আতাউর রহমান খান। কাউন্সিল মুসলিম লীগ থেকে জনাব মমতাজ দওলাতানা, জনাব তোফাজ্জল আলী, সৈয়দ খাজা খয়েরুদ্দীন। জামায়াতে ইসলামী থেকে তোফায়েল আহমদ, মাওলানা আবদুর রহীম এবং অধ্যাপক গোলাম আযম। আওয়ামী লীগ থেকে নসরুল্লাহ খান, আবদুস সালাম খান, গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর। নেজামে ইসলাম পার্টি থেকে চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, ফরিদ আহমদ এবং এম. আর. খান।

২৫. ১৯৬৭ সালের ২৩ আগস্ট মাওলানা তর্কবাগিশকে সভাপতি ও রাজশাহীর মুজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত দলটি PDM পন্থী আওয়ামী লীগ নামে পরিচিত হয়।

২৬. ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারী সরকার এক প্রেসনোটে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারীর যোগসাজশে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবার অপরাধে আঠার জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিকে গ্রেফতারের কথা বলা হয়। তারপর ১৮ জানুয়ারী আরেক প্রেস নোটে এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে শেখ মুজিবকে গ্রেফতারের কথা ঘোষণা করা হয়। অতপর ১৯ জুন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস. এ রহমান এবং পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টের বিচারপতি মুজিবুর রহমান ও বিচারপতি মকসুমুল হাকিমের সমবায়ে গঠিত আদালতে ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত সাঁইত্রিশ জনের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়।

www.bjilibrary.com

মুজিব ভারতের যোগসাজশে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। গোটা দেশে এ অভিযোগের কথা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলো। আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিব ভারতের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগের কথা অস্বীকার করলেন।[২৭] প্রকাশ্য আদালতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হলো ১৯৬৮

---

২৭. আদালতে শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর উপর আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে যে জবানবন্দী দেন তা এই : "স্বাধীনতা পূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে নিরসলভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে আমাকে আমার লেখাপড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, এর ফলে ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্বেও ছিলো এবং এখনও সেইরূপ একটি নিয়মতান্ত্রিকতার পথানুসারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যমান। .... সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই সরকার আমার উপর নির্যাতন চালাইতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ১২ অক্টোবর তাহারা পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেফতার করে এবং দেড় বছর কাল বিনা বিচারে আটক রাখে। আমাকে এই ভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। কিন্তু আমি ঐ সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৫৯ এর ডিসেম্বরে কিংবা ১৯৬০ এর জানুয়ারীতে আমাকে উক্ত আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি লাভের পর আমার উপর কিছু কিছু বিধি-নিষেধ জারি করা হয়-যেমন ঢাকা ত্যাগ করিলে আমাকে গন্তব্যস্থল সম্পর্কে লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে। .... অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারির প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হলো, তখন আমাকেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং ৬ মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনর্জীবিত করা হয় এবং সম্মিলিত বিরোধী দলের অংগদল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি। .... ১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মিলনীর বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধান ছয় দফা কর্মসূচী উপস্থিত করি। ছয় দফা কর্মসূচীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অংশের জন্যই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী করা হইয়াছে। অতপর আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ছয় দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারী ও নেতৃবৃন্দ ও সরকারী প্রশাসনযন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষায়' 'গৃহযুদ্ধ' ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে এক ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায় একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম, তখন তাহারা যশোরে আমার পথ রোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে এই বারের মতো আমাকে গ্রেফতার করে। .... কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এ তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। .... আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচী রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নহি। বর্তমান মামলা উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন-নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে। .... আমি কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে কোনো কিছু করি নাই কিংবা কোনো দিনও এ উদ্দেশ্যে কোনো স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোনো কর্মচারীর সংস্পর্শে কোনো ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই। .... আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।"-(আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানের লিখিত বিবৃতি, বিচিন্তা, ২৫ অক্টোবর, ১৯৮৭) (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.bjilibrary.com

সালের ১৯ জুন। পত্র-পত্রিকাকে বিচারের যাবতীয় বিষয় প্রকাশ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হলো।

আওয়ামী লীগ আর কার্যত মাঠে থাকলো না। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আন্দোলন এমন একটা রূপ নিলো যার কারণে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা রায় পর্যন্ত আর গড়াতে পারেনি। পিডিএম-এর আন্দোলনের সাথে ডিসেম্বর ৬৮ থেকে যুক্ত হয় মাওলানা ভাসানীর ঘেরাও আন্দোলন। দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ হয়ে উঠলো উত্তপ্ত। ছাত্ররাও সম্মিলিতভাবে এগিয়ে এলো আন্দোলনে। ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারী ১১ দফা[২৮] দাবীর ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। স্বৈরাচার বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন জোরদার করার জন্যে পিডিএম কে এরপর পুনর্গঠিত করা হলো। ছয় দফাপন্থী আওয়ামী লীগ ইতিপূর্বে পিডিএম এর

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিষয় শেখ মুজিব নাও জানতে পারেন। আওয়ামী লীগেরই একটা গোপন লবী পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো তা নানাভাবেই পরে প্রকাশ পেয়েছে। যা হোক, আগরতলা ষড়যন্ত্র ঠিকই যে হয়েছিলো তা পরে সুস্পষ্টভাবেই জানা গেছে ঃ ভারত থেকে প্রকাশিত 'In side Raw' বইতে বলা হয়েছে, "In order to present a clear synopsis of the events that frinally brought RAW into the Bangladesh ops (operation), one must review the intelligence activities that started soon after its formation in 1968. But by then indian operatives had already been in contact with the pro-Mujib faction. A meeting concened in Agaortala during 1962-63, between the IB foreign desk operatives and the Mujib faction, gave some clear indication of what was to follow.

The meeting in Agortala had indicated to colonel Mennon (which in fact was Sankaran Nair), the main liaison man between the Mujib faction and the Indian intelligence, that the 'group' `was eager to escalate their movement They raided the armoury of the East Bangala Rifles in Dacca but this initial movements failed, In fact it was total disaster

A few months later, on January 6, 1968, the Pakistan government annoinced that 28 persons would be prosecuted for conspiring to bring about The Scecssodon of East Pakistan, with Indians helf the high court judgment published mentioned that the conspirators had links with Indian agents, whom they named as Major Menon and colonel Tripathi the information they had was far from complete. They had mixed up the ranks of the two officers, who were in fact colonel Menon and Major Tripathi....." (Inside RAW The story of India's secret service, by Asoka Raian, page-49-50

২৮. ছাত্র ইউনিয়ন (মস্কোপন্থী), ছাত্র ইউনিয়ন (পিকিংপন্থী) ছাত্র লীগ, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন ও ডাকসু সমবায়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১১ দফার তৃতীয় দফা ছাড়া অন্য সবগুলো শিক্ষা ও সাময়িক রাজনৈতিক সংক্রান্ত তৃতীয় দফা ৬ দফার অনুরূপ।

www.bjilibrary.com

বাইরে ছিলো। তাকেও আন্দোলনে আনা হলো। মুফতি মাহমুদের জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও ফ্রন্টে শামিল হলো। ৮টি[২৯] রাজনৈতিক দল ৮ দফার[৩০] ভিত্তিতে 'ডেমোক্রাটিক এ্যাকশন কমিটি' (DAC) গঠন করলো ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারী। রাজনৈতিক আন্দোলন প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো। ১লা ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব রাজনীতিকদের গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করলেন। মাওলানা ভাসানী এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গোল টেবিল বৈঠকের বিরোধিতা করলো। আর ডাক (DAC) গোল টেবিল বেঠকের আগে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী করলো। ২১ ফেব্রুয়ারী আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিব সহ অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি দেয়া হলো। ২৬ ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিণ্ডিতে গোল টেবিল বৈঠক[৩১] অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠক কোনোই ফল দিলো না। আইয়ুব খান ২৫ মার্চ ইয়াহিয়ার হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে ক্ষমতা থেকে সরে গেলেন।

গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবের মুক্তি শেখ মুজিবকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলে দিলো। কিন্তু কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে এ জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে তিনি আন্দোলনকারী সকল শক্তিকে অস্বীকার করলেন। অকৃতজ্ঞ ও চরম স্বার্থপর আবার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। গোল টেবিল বৈঠকের সময়ই তিনি ডাক-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন।[৩২] ছাত্রদের ১১ দফাকেও তিনি অস্বীকার করলেন। "অত্যন্ত কৌশলের সাথে মুজিব তাঁর বিস্মৃতপ্রায় ৬ দফাকে পুনর্বাসিত করেছিলেনঃ কিছুকাল পর্যন্ত ১১ দফা ও ৬ দফা বলার পর তিনি ৬ দফা ও ১১ দফা বলতে শুরু করেন এবং শেষ দিকে এসে সমগ্র সাফল্যই তিনি ৬ দফার উপর আরোপ করতে থাকলেন।"[৩৩] নিসন্দেহে শেখ মুজিবের চোখ তখন

---

২৯. আওয়ামী লীগ (ছয় দফা), আওয়ামী লীগ (পিডিএমপন্থী), জামায়াতে ইসলামী, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, এন ডি এফ এবং জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম।

৩০. ৮ দফা দাবী ঃ (১) ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার, (২) প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, (৩) অবিলম্বে জরুরী আইন প্রত্যাহার, (৪) নাগরিক স্বাধীনতার পুনর্বহাল ও সকল কালাকানুন বাতিল, (৫) শেখ মুজিব, খান ওয়ালী খান প্রমুখ সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি এবং সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার, (৬) ১৪৪ ধারা সংক্রান্ত সকল আদেশ প্রত্যাহার, (৭) শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার বহাল, (৮) নতুন ডিক্লারেশন দান এবং ইত্তেফাক, চাট্টান সহ সকল বন্ধ পত্র-পত্রিকা ফেরত দান।

৩১. শেখ মুজিব সহ DAC এর ষোলজন প্রতিনিধি গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন।

৩২. গোল টেবিল বৈঠকের পর DAC ভেঙ্গে দেয়া হয়।

৩৩. 'আওয়ামী লীগের ৩৭ বছর', বিচিত্রা, নবেম্বর, ১৯৮৬

www.bjilibrary.com

ক্ষমতার দিকে। আর প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা ছাড়া আওয়ামী আর কিছুই চোখে দেখে না। তার স্বার্থসিদ্ধির পথে বাধা হলে নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ, মানবিকতা, কিছুরই মূল্য তার কাছে নেই।

পয়লা আগস্ট (১৯৬৯) আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। এ সম্মেলন নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ কাউন্সিলে ৬ দফাকে শাসনতন্ত্রের মূলনীতি এবং অর্থনৈতিক নীতি হিসাবে 'স্বাধীন, শোষণহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা তথা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা' কে আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হলো। এ সময় থেকে শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে 'জয় বাংলা শ্লোগান দিতে শুরু করেন এবং তা অবশেষে দলীয় শ্লোগানে পরিণত হয়।[৩৪]

১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ ইয়াহিয়া নির্বাচনের পূর্বশর্ত হিসাবে ৫ দফা লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক ঘোষণা করলেন। লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্কের মোদ্দাকথা ছিলো–পাকিস্তানের সংহতি ও ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদকে ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র তৈরি করতে হবে এবং প্রণীত শাসনতন্ত্রটিকে প্রয়োজনে বাতিল করার প্রশ্নাতীত ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের থাকবে। অনেক মহল থেকে এ ধরনের শর্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠলো, আন্দোলনের ডাক এলো। কিন্তু শেখ মুজিব কোনো আন্দোলনে গেলেন না।[৩৫] গেলেন নির্বাচনে।

বস্তুত আওয়ামী লীগের লক্ষ্যই ছিলো ক্ষমতা। অতীতের দৃষ্টান্ত বলে, ওয়াদা পূরণ, জনগণের দাবী আদায় ইত্যাদিকে আওয়ামী লীগ থোরাই তোয়াক্কা করে। সুতরাং লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক বা ৬ দফা কিছুই তার কাছে কোনো বড় বিষয় ছিলো না। লক্ষ্য অর্জনের জন্যে শেখ মুজিব প্রথম থেকেই যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন সেটা হলো, জনপ্রিয় দাবী-দাওয়া

---

৩৪. 'আওয়ামী লীগের ৩৭ বছর', বিচিত্রা, নবেম্বর, ১৯৮৬

৩৫. "প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আঁতাতের ফলে ৩০ মার্চ ঘোষিত আইনগত কাঠামো আদেশের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার সক্রিয় আন্দোলন সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে এ আঁতাতের দরুন সরকারও ছয় দফা ভিত্তিক নির্বাচনী প্রচারনায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া স্বীয় ঘোষিত আইনগত কাঠামো আদেশের পরিপন্থী কাজ করতে দ্বিধা করেন নাই। বস্তুত এ ব্যাপারে সরকার স্পষ্টত দ্বিমুখী নীতিই অনুসরণ করিয়াছিলেন। হয়তো এভাবেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান উক্ত ছক কাটা রাজপথে শেখ সাহেবের সহিত ক্ষমতা ভাগাভাগি করার ও ভোগ করার চিন্তা করিয়াছিলেন। কেননা ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও 'আইন কাঠামো আদেশ' ছিলো পরস্পর পরিপন্থী।"–(জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা–৪৪৮)

www.bjilibrary.com

সামনে নিয়ে আসা। যুক্তফ্রন্ট এটাই করেছিলো। শেখ মুজিবও ৬ দফার আকারে তাই করলো। দ্বিতীয় যে নীতি তার সামনে বড় হয়ে উঠেছিলো তাহলো, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে ভারতের সাহায্য ও সমর্থন প্রয়োজন ও মূল্যবান হতে পারে। বিশেষ করে সামরিক শাসন এবং তার পরবর্তী সরকারের অব্যাহত নির্যাতন নিপীড়ন থেকেই সম্ভবত এটা তিনি মনে করেছিলেন। সুতরাং তাঁর কণ্ঠে জয় বাংলা শ্লোগান এলো এবং পররাষ্ট্র নীতিও তিনি নিলেন ভারতকে খুশী করার মতো আর আদর্শিক ক্ষেত্রে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি তো আগে থেকেই ভারতের আনন্দের বিষয় ছিলো। আওয়ামী লীগের এ নীতিগত অবস্থানই তাকে মানুষের কাছে একটি por-Indian দলে পরিণত করে। যার ফলে আদর্শবাদী ইসলামপন্থী দলগুলো আওয়ামী লীগকে প্রবল সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে।

মস্কোপন্থী ন্যাপ

মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ থেকে মস্কোপন্থী অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে মস্কোপন্থী ন্যাপ গঠিত হয়। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে কম্যুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীরা ভাসানীকে ঘিরে আওয়ামী লীগে সমবেত হয়। আওয়ামী লীগের নীতি প্রথম দিকে এদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব সামনে এগিয়ে এলে এবং বাধার সৃষ্টি করলে আওয়ামী লীগ ভেঙে যায়। ১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই কম্যুনিস্ট, সমাজতান্ত্রিক ও সমচিন্তার লোকরা মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপ গঠন করে। ১৯৬৭ সালে ন্যাপ দ্বিখণ্ডিত হয়ে মস্কোপন্থী ন্যাপ ও পিকিংপন্থী ন্যাপ গঠিত হয়। '৬৭ সালের ১৬-১৭ ডিসেম্বর মস্কোপন্থীরা এক তলবী কাউন্সিল অধিবেশনে অধ্যাপক মুজাফফর আহমদকে সভাপতি ও সৈয়দ আলতাফ হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে মস্কোপন্থী ন্যাপের পূর্ব পাক কমিটি গঠন করে।

ন্যাপের এ বিভক্তির মূল কারণ ছিলো আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের বিভক্তি। আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের এক ভাগের নেতৃত্বে এলো চীন, অন্য ভাগে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৬৪ সালে এ ভাঙন সম্পূর্ণ হয়। এ ভাঙনের পথ ধরে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন প্রথম বিভক্ত হয়। ১৯৬৫ সালে রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে গঠিত হয় পিকিংপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন। অন্যদিকে মতিয়া চৌধুরী নেতৃত্ব দেন মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়নকে। এরপর বিভক্ত হয় ন্যাপ।

আদর্শগত কারণ ছাড়াও ন্যাপের বিভক্তির মূলে আরও কিছু রাজনৈতিক কারণও ছিলো। ১৯৬২ সালে চীন ভারত যুদ্ধের পর এবং

www.bjilibrary.com

ভাসানী ১৯৬৪ সালে চীন সফরের পর ন্যাপ নেতা মাওলানা ভাসানী চীনমুখী ও ভারত বিরোধী হয়ে পড়েন। অন্যদিকে চীনের বৈরী মস্কো এবং চীনের বৈরী ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক আরো গভীর হলো। এ সুবাদে ন্যাপের মস্কোপন্থীরা ভাসানী বিরোধী হবার সাথে সাথে ভারতমুখী হয়ে পড়লো এবং ন্যাপের ১৪ দফা কর্মসূচী বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগের ৬ দফা সমর্থন করে বসলো।' মস্কোপন্থীরা ৬ দফাকে 'জাতির মুক্তি সনদ' বলে অভিহিত করলো। এভাবে মস্কোপন্থীরা শেখ মুজিবের প্রতি ঝুঁকে পড়লো। এর বোধ হয় এও একটা কারণ যে, একদিন ভাসানীকে কেন্দ্র করে কম্যুনিস্টরা আওয়ামী লীগে এসে জুটেছিলো, তারপর ভাসানীর আশ্রয়ে তারা জাতীয়তাবাদী প্লাটফরম 'ন্যাপ' গঠন করেছিলেন, পরে যখন ভাসানীকে ছাড়তে হলো, তখন জনপ্রিয় এবং জাতীয়তাবাদী একটি অবলম্বন তাদের প্রয়োজন ছিলো। শেখ মুজিবকে তারা তাই অবলম্বন হিসেবেই গ্রহণ করলো।

তবে আওয়ামী লীগের দুর্দিনে মস্কোপন্থীরা তাদের কোনো কাজে আসেনি। ৬ দফা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের উপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছিলো, তার গোটাটাই তাদেরকে একাই বহন করতে হয়েছে। তবে DAC গঠিত হলে মস্কোপন্থী ন্যাপও আওয়ামী লীগের সাথে 'ডাক' এ যোগদান করে।

জেনারেল ইয়াহিয়া যখন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলো, আওয়ামী লীগের সাথে মস্কোপন্থী ন্যাপও নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলো। লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক-এর বিরুদ্ধে মাওলানা ভাসানী যতটুকু কথা বলেছিলেন, মস্কোপন্থীরা তাও বললো না। তবে মস্কোপন্থীরা ৬ দফা সমর্থনের কথা বললেও তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টো ৬ দফার সাথে সংগতিপূর্ণ ছিলো না। স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে মস্কোপন্থী ন্যাপ কেন্দ্রের হাতে দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্র নীতি ও মুদ্রা রাখার কথা বললো। আর বৈষম্যের প্রতিবিধানের জন্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে 'পৃথক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা'র কথা বললো।

নির্বাচনের পর মস্কোপন্থী ন্যাপ যথা নিয়মে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করলো। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও তারা শেখ মুজিবের সাথে ছিলো। তবে তারা আওয়ামী লীগের ছাত্র ও যুব শাখার স্বাধীনতা দাবীকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেনি। বরং তাদের মুরব্বী সংগঠন কম্যুনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ '৭১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত তাদের রাজনৈতিক মূল্যায়নে বললো ঃ "অন্যদিকে কিছু উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী তথাকথিত স্বাধীন

www.bjilibrary.com

পূর্ব বাংলার নামে অবাঙালী বিরোধী জিগির তুলিয়া এবং মাওলানা ভাসানী স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের আওয়াজ তুলিয়া জনগণের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ বিরোধী মনোভাব গড়িয়া তুলিয়া অবস্থাকে আরও জটিল ও ঘোরালো তুলিতেছে। .... সারা পাকিস্তানে এ (গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের) সংগ্রামের ফলে পাকিস্তানের জন্য একটা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দাবী অর্জিত হইতে পারে–এরূপ সম্ভাবনা আছে। .... এ সংগ্রামের সফলতার জন্য উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদের অবাঙালী জনগণ বিরোধী জিগির এবং মাওলানা ভাসানীর পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ-বিরোধী জিগিরের মুখোশও আমাদের খুলিয়া দিতে হইবে।"[৩৬] 'এ দৃষ্টিকোণ থেকে মস্কোপন্থীরা গোটা মার্চ মাস ব্যাপী স্বায়ত্তশাসন এবং পাকিস্তানের জন্য একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবী অব্যাহত রেখেছিলেন। প্রস্তাবিত সংগ্রামের অংশ হিসেবে তারা ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সাথে শেখ মুজিবের আলোচনাকে স্বাগত জানান এবং সমঝোতার সর্বশেষ প্রচেষ্টাকে সফল করার উদ্দেশ্যে অগ্রণী ভূমিকা নেন ন্যাপ সভাপতি ওয়ালী খান। শুধু তাই নয়, ২৫ মার্চ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করার পর ২৯ মার্চেও কম্যুনিস্ট পার্টির প্রচারপত্রে বলা হয় ঃ নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, সামরিক শাসন প্রত্যাহার, প্রভৃতি যে দাবীগুলো আওয়ামী লীগ প্রধান উত্থাপন করিয়াছেন, ... ঐ দাবীগুলো পূরণে ইয়াহিয়া সরকারকে বাধ্য করা, ইহা হইল এই মুহূর্তের জরুরী কর্তব্য।'[৩৭] মস্কোপন্থীদের এ ভূমিকার কারণ সম্ভবত এই যে, তাদের তৎপরতা যাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখান থেকে তারা কোনো সুনির্দিষ্ট সিগন্যাল পাননি।

সেই সময় মস্কোপন্থীদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করছিলো মস্কোর নীতি ও দৃষ্টিভংগি, ভারতের মনোভাব এবং আওয়ামী লীগের চিন্তা। এ তিনের সমন্বয় নিসন্দেহেই সময় সাপেক্ষ ছিলো। তবে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের পিছনে তাদের থাকার বিষয়টা নতুন কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপার ছিলো না।

---

৩৬. 'ন্যাপের ৩০ বছর', শাহ আমদ রেজা, বিচিত্রা।

৩৭. 'ন্যাপের ৩০ বছর', শাহ আমদ রেজা, বিচিত্রা।
'সেপ্টেম্বর পর্যন্তও এ পার্টি (বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি-সিপিবি) নিজেকে পূর্ব পাকিস্তানের কমুনিস্ট পার্টি নামে পরিচয় দিয়েছিলো। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সোভিয়েত সমর্থন ঘোষিত হবার (২৯ সেপ্টেম্বর, '৭১) পর পার্টি নামের আগে বাংলাদেশের শব্দটি যোগ করে।' –ন্যাপের ৩০ বছর' বিচিত্রা।

www.bjilibrary.com

ভাসানী ন্যাপ

আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি এবং সেখানকার কংগ্রেস-তাড়িত মজলুম মানুষের সংগ্রামী নেতা মাওলানা ভাসানী দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে এসে মুসলিম লীগের সাধারণ মেম্বারশীপও পেলেন না। কিন্তু রাজনীতিকদের রাজনীতি এভাবে বন্ধ করা যায় না। বন্ধ হলো না। তদানীন্তন মুসলিম লীগ রাজনীতিকদের আচরণের প্রতিক্রিয়া এবং ব্যক্তি দ্বন্দ্বের পটভূমিতে ভাসানীর নেতৃত্বে সৃষ্টি হলো আওয়ামী মুসলিম লীগ। এভাবে বিক্ষুব্ধ মনের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটলো একটা সংগঠনের আকারে। ক্ষমতাসীনদের প্রবল বিরোধিতা হলো এ সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য। মাওলানা ভাসানী এ বিরোধিতার ঝাণ্ডা উত্তোলন রেখেছেন তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ভাসানী চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্য কম্যুনিষ্ট ও বামপন্থী কর্মীদের তাঁর চারদিকে সমবেত করে। একদিকে তাঁর চারদিকে বামপন্থীদের এ সম্মেলন, অন্যদিকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের নীতি পশ্চিমাঘেঁষা হওয়ার কারণে আওয়ামী মুসলিম লীগ পররাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে বামঘেঁষা হয়ে উঠলো। আর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা অর্জন ও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে বিপদে ফেলার জন্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক দাবী উত্থাপন করলো। কিন্তু ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের শরিকদল হিসাবে আওয়ামী মুসলিম লীগ নির্বাচন জিতে কেন্দ্রে ও প্রদেশে ক্ষমতাসীন হবার পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে শেখ মুজিবের পরিচালনায় আওয়ামী লীগের একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন এবং অন্যান্য আঞ্চলিক দাবী থেকে সরে দাঁড়ালো। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও তারা পশ্চিমা জোট ঘেঁষা হয়ে উঠলো। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হলো এবং গঠিত হলো মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ।[৩৮] মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের পশ্চিমা জোট ঘেঁষানীতির তীব্র সমালোচনা করলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ বিরোধী হবার অভিযোগ

---

৩৮. in East Pakistan, the Awami league led by Suhrawardy, having abandoned the cause of Bengalis, was split. The leftist led by Maulana who could prevail upon Awami league till 1953 could no more find any common ground to remain together the underground communists were successful earlier through maulana and their workers to make it adopt the path of secularism by droping the word 'Muslim' from its name in 1955."-Bangladesh, constiutional quest for Autonomy-Maudud Ahmed, Page-57.

www.bjilibrary.com

আনলেন। এর আগে ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী কাগমারী সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে সামনে রেখে সুস্পষ্ট কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, 'যদি আপনারা পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনার নীতি অনুসরণ করেই চলেন, যদি পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী মেনে না নেন, তাহলে পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী শুনে রাখুন আপনাদের প্রতি আমাদের 'আস্ সালামু আলাইকুম'। আপনাদের পথে আপনারা চলুন, আমাদের পথে আমরা চলি।[৩৯] মাওলানা ভাসানী 'ন্যাপ' গঠনের পর তাঁর প্রথম ঘোষণায় পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জন্যে পূর্ন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠার অংগীকার করে বলা হলো, দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রা ছাড়া অন্য সব বিষয় প্রদেশের কর্তৃত্বে আনা হবে।[৪০] প্রতিষ্ঠাকালে ভাসানী বিভিন্ন দাবী সম্বলিত ৬৩ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে সব দলের সাথে ন্যাপেরও কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী আহূত সম্মেলনের মাধমে ন্যাপ পুনরুজ্জীবিত হয়। এর আগে ন্যাপ এনডিএফ[৪১]-এর প্লাটফরমে থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নেয়। পরে ন্যাপ পুনরুজ্জীবনের পরই ১৯৬৪ সালে 'ন্যাপ' সম্মিলিত বিরোধী দলীয় জোট 'কপ'-এ যোগদান করে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় পরিষদ নির্বাচন ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেয়। এদিকে ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের পর মাওলানা ভাসানী ভারত বিরোধী এবং বন্ধু চীনের মিত্র আইয়ুব সরকারের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধকালে আওয়ামী লীগ যখন ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলা থেকে বিরত থাকে, তখন মাওলানা ভাসানী আইয়ুব সরকারকে বলিষ্ঠ সমর্থন দেন। পাক-ভারত যুদ্ধের ৪ মাস পর ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগের ৬ দফা ঘোষিত হলে মাওলানা ভাসানী এর তীব্র বিরোধিতা করেন এবং জুন (১৯৬৬) মাসে ১৪ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে পাল্টা আন্দোলনের ডাকা দেন। ন্যাপের মস্কোপন্থী অংশ কিন্তু আওয়ামী লীগকে এবং সেই হেতু ৬ দফা ছাড়তে রাজী ছিলো না। এ মতবিরোধ ন্যাপকে ভাসানী ন্যাপ (চীনপন্থী) ও মস্কোপন্থী ন্যাপ-এ দুই অংশে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে আশু কারণ হিসেবে আজ করলো। এরপর মাওলানা ভাসানীর ন্যাপকে একই সাথে আওয়ামী লীগ ও মস্কোপন্থী ন্যাপের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হতে হলো। ১৯৬৯ সালে

---

৩৯. Bangladesh, constiutional quest for Autonomy-Maudud Ahmed, Page-58.

৪০. 'ন্যাপের ৩০ বছর' বিচিত্রা।

৪১. ১৯৬২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর নূরুল আমীন, সোহরাওয়ার্দী, প্রমুখের নেতৃত্বে এন ডি এফ গঠিত হয়।

www.bjilibrary.com

এসে পিডিএম[৪২]-এর নেতৃত্বে চলে আসা গণতান্ত্রিক আন্দোলন 'ডাক'[৪৩] গঠনের মাধ্যমে যখন তীব্র হয়ে উঠলো, তখন মাওলানা ভাসানী ইসলামী সমাজতন্ত্রের শ্লোগান তুলে ঘেরাও এবং জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন শুরু করলেন। ছাত্রদের ১১ দফা ভিত্তিক আন্দোলনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে নতুন গতি দান করে। সব মিলিয়ে যে অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে উঠলো তার চাপে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত হলো, শেখ মুজিব ছাড়া পেলেন, আইয়ুব খান পদত্যাগ করলেন, জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতায় এলেন এবং ক্ষমতায় এসে তিনি তাঁর ঘোষিত লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্কের আওতায় ১৯৭০ সালের শেষ দিকে সাধারণ নির্বাচনের কর্মসূচী ঘোষণা করলেন। অন্যান্য দলের মতো ভাসানী ন্যাপও আইন কাঠামো আদেশের (লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক) অধীনে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলো। মশিয়ুর রহমান (যাদু মিয়া) ছিলেন এ সময় ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক।

নির্বাচনের বাতাস আওয়ামী লীগের জন্যে সৌভাগ্যের বার্তা নিয়ে এলো। পিডিএম-এর আন্দোলন, ডাক-এর আন্দোলন, ১১ দফার আন্দোলন –সব আন্দোলনের ফল গিয়ে জমা হলো ৬ দফার জন্যে নির্যাতিত আওয়ামী লীগের পকেটে। তার উপর ১৯৭০ সালের ১২ নবেম্বর লাখো লোক বিনাশী ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস-উদ্ভূত আবেগও আওয়ামী লীগের পক্ষেই গেল। আওয়ামী লীগ হয়ে উঠলো অপ্রতিরোধ্য। এ অবস্থায় বহুদর্শী নেতা মাওলানা ভাসানীকে হঠাৎ জ্বলে উঠতে দেখা গেল। বিরাট একটা উল্লম্ফন ঘটলো তাঁর। তিনি ৩০ নবেম্বর পাকিস্তানী অবহেলার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন, ৪ ডিসেম্বরের পল্টনের জনসভায় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামে সকলকে যোগদান করার আহ্বান জানালেন[৪৪] এবং নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে

---

৪২. "........... এক ব্যক্তি শাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি হইতে সমগ্র দেশকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ও জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক বাসনায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (পিডিএম পন্থী), মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), নেজামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ঐক্য সংস্থা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। জনাব আতাউর রহমান খানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত ৩০ এপ্রিলের (১৯৬৭) সভায় 'পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক মুভমেন্ট' (পি পি এম) গঠিত হয়।"–(জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা–৩৭৯-৩৮০)

৪৩. ১৯৬৯ সালের ৭ জানুয়ারী ডাক গঠিত হয় ৮টি দলের সমন্বয়ে। পি ডি এম-এর ৫টি দলের সাথে যুক্ত হয় আওয়ামী লীগ (ছয় দফা পন্থী), ন্যাপ (মস্কোপন্থী) এবং পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম।

৪৪. 'ন্যাপের ৩০ বছর', বিচিত্রা।

www.bjilibrary.com

বললেন, 'ভোটের আগে ভাত চাই'। মাওলানা ভাসানীর এ আকস্মিক উল্টা গতিকে সেই সময় আওয়ামী লীগের হাতে পরাজয় এড়াবার জন্যে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবার একটা কৌশল হিসেবে সবাই মনে করেছিলো। কিন্তু নিছক দলীয় পরাজয় এড়ানো নয়, বিষয়টার শিকড় যে আরো অনেক গভীরে ছিলো, মশিয়ুর রহমানের এক বক্তব্যে পরবর্তীকালে তা পরিষ্কার হয়। জনাব মশিয়ুর রহমান[৪৫] 'মাওলানা আমাদের ঐতিহ্য' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেন ঃ

"'৭০ সালে আমরা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতাম এবং নির্বাচন করতাম তবে ২৫টা আসন অন্তত নিশ্চয়ই পেতাম। পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের চারজন ভুট্টোর সাথে যোগ দিয়ে জিতেছিলো, এটা অনেকেই হয়তো জানেন। সেদিন নির্বাচন বিরোধিতার ডামাডোলের মধ্যে কিন্তু এমন কয়েকজন ছিলেন–আনোয়ার জাহিদ, নূরুল হুদা, কাদের বক্স, মোহাম্মদ সুলতান এবং শ্রদ্ধেয় হাজী দানেশ–যারা ন্যাপের নির্বাচন করার সপক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ আমি মনে করি, যদি প্রথম থেকেই নির্বাচনের ব্যাপারে পার্টি পজেটিভ হতো এবং ২৫টা আসন নিতে পারতো, তাহলে পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরই আঞ্চলিক প্রশ্নের সমাধানের ব্যাপারে আমরা কার্যকরী পদক্ষেপ এবং ভূমিকা রাখতে পারতাম। অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামেও ভারত পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্ব করতে পারতো না। কারণ আমরা থাকতাম বাধা।

এখানে কিছু পূর্বকথা বলে রাখা প্রয়োজন। '৬৯-এর মাঝামাঝির দিকে ইন্টেলিজেন্সের এক অফিসার মেজর কমল (বর্তমানের মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান) দেখা করেছিলেন মাওলানার সাথে। তখন ইন্টেলিজেন্সের চীফ ছিলেন জেনারেল আকবর। মেজর কমল মাওলানার সাথে স্বাধীনতার প্রশ্নে আলোচনা করেছিলেন। পূর্বাপর বিচার করে মাওলানা ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং এ সময় আমার সাথে তাঁর বহু আলাপ হয়, যা আমার জন্যে এক বিরাট অভিজ্ঞতা। আমাদের নিজেদের পার্টি তখন ক্ষত-বিক্ষত। সাধারণ নেতা ও কর্মীরা বিভ্রান্ত। বামপন্থী বন্ধুরা নৈরাজ্যের ঘোরে আচ্ছন্ন প্রায় সবাই। এমনি এক অবস্থায় রাজনীতির ঘোর-প্যাঁচ বেড়ে চললো নেপথ্যে। এ সময় ঘোষিত

---

৪৫. জনাব মশিয়ুর রহমান তখন ছিলেন ভাসানী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক পরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ক্যাবিনেটে ইনি চীফ মিনিস্টার হন।

www.bjilibrary.com

হলো, ইয়াহিয়া চীন যাচ্ছেন সেপ্টেম্বর মাসে। মাওলানা আমাকে বললেন, 'প্রগতিশীল বামপন্থী রাজনীতি বাঁচাতে হলে ইলেকশন বন্ধ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ, ইলেকশন হলেই ৬ দফার আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে রূপ নেবে। সুতরাং ইলেকশন আপাতত স্থগিত রাখার জন্যে যদি কিছু করা যায় তাই কর।' তিনি বললেন, 'আগে শাসনতান্ত্রিক এবং কাঠামোগত প্রশ্নগুলো মীমাংসা করে তারপর নির্বাচন হোক। যেমন ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেংগে দিয়েছে, তেমনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের কাঠামোও ঘোষণা করুক। তারপর যদি নির্বাচন হয়, তাহলেই কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলো সামনে আসবে, না হলে আঞ্চলিক ভিত্তিতেই নির্বাচন চলে যাবে। অতএব আমি বলছি, তুমি নির্বাচন মুলতবি রাখার জন্যে কাজ করো।' এ যেন এক ভবিষ্যত দ্রস্টার অমরবাণী।

আমি পাকিস্তানে চীনা রাষ্ট্রদূত যিনি জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে পিকিং যাচ্ছিলেন তাকে বললাম, 'আপনি প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-কে আমার এ ছোট চিরকুটটি পৌঁছে দেবেন।' চীন থেকে ফিরে এলেন ইয়াহিয়া। সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট হাউজে আমি তাঁর সাথে দেখা করলাম। তাঁর সাথে হুজুরের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলাম। তিনি আমাকে জানালেন,

"প্রধানমন্ত্রী চৌ, সেই জ্ঞানী বৃদ্ধও এমনি আশংকার কথা আমাকে বলেছেন। কিন্তু আমি বলছি, বেশী খারাপ অবস্থা দেখলে আমি ক্ষমতা হস্তান্তর করবো না।' তাঁকে আমি বুঝাতেই পারলাম না, কোন্ পথে এর সমাধান নিহিত। তিনিও বুঝতে চাইলেন না, সেতুর কোন্ পারে সংকট থেকে মুক্তি।"[৪৬]

জনাব মশিয়ুর রহমানের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, মাওলানা ভাসানীর নির্বাচন বর্জন ও 'ভোটের আগে ভাত চাই' আন্দোলনের লক্ষ্য ছিলো আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রয়াসকে রোধ করা এবং এ আন্দোলন তিনি করেছিলেন পাকিস্তান মিলিটারী ইনটেলিজেন্সের সাথে পরামর্শ করেই। এবং তিনি জানতেন যে, নির্বাচনের পর শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার কথা মতো না চললে তার হাতে ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন না।

---

৪৬. 'মাওলানা ভাসানী ঃ রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম', সম্পাদনা–শাহরিয়ার কবির, পৃষ্ঠা–২১-২৩

www.bjilibrary.com

মাওলানা ভাসানীর ন্যাপ শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ নেয়নি। জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন ৪ ডিসেম্বর। ৩০ নবেম্বর তিনি একথা প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন। তারপর অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও তিনি তাঁর এ কথার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন এবং ইয়াহিয়া-মুজিবের মধ্যে যে কোনো সমঝোতার তিনি বিরোধিতা করেছেন। অথচ তাঁর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিলো আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা রোধ করা। ভাসানীর এ দুই অবস্থান পরিষ্কারভাবে পরস্পর বিপরীত। কিন্তু আসলেই কোনো বৈপরীত্য নেই। মাওলানা ভাসানী আন্দোলনের নেতৃত্ব শেখ মুজিবের কাছ থেকে নিজের হাতে আনতে চেয়েছিলেন। এজন্যেই প্রয়োজন ছিলো শেখ মুজিব যা বলেছিলেন তার চেয়ে আগে বেড়ে কথা বলা। কিন্তু মাওলানা ভাসানী সফল হলেন না। নির্বাচনোত্তর দীর্ঘ টানাপোড়েনার পর ইয়াহিয়া যখন ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজী হলেন না এবং নৃশংস দমন অভিযান শুরু করলেন, তখন স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল।

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে অদ্ভুত এক দ্বন্দ্বে পড়লো মাওলানা ভাসানীর ন্যাপ। বহুদর্শী মাওলানা ভাসানী বুঝলেন, যুদ্ধ যেটা শুরু হয়ে গেছে তার পরিণতি বিচ্ছিন্নতা-স্বাধীনতা। এ উপলব্ধির পরও তিনি আওয়ামী লীগের সাথে একাত্ম হলেন না এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণও করতে পারলেন না। ভাসানী ন্যাপ স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রকৃতই কোনো ভূমিকা পালন করেনি।[৪৭] মাওলানা ভাসানী ভারতে গিয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের গোটা সময়ই তিনি সেখানে বন্দী জীবন কাটান। ভাসানী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মশিয়ুর রহমান মাওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করার জন্যে ভারতে গিয়ে ছিলেন। কিন্তু গ্রেফতারী পরওয়ানার সম্মুখীন হয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন এবং তারপর তিনি তাঁর হোম-টাউন রংপুরেই বসবাস করেন।[৪৮] এ অবস্থায় ভাসানী ন্যাপের কোনো কর্মীর পক্ষে ভারত থেকে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিলো না। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা প্রশ্নে পিকিংপন্থী কম্যুনিস্ট গ্রুপগুলোর অধিকাংশের ভূমিকা ছিলো নেতিবাচক।[৪৯] এমনকি মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবদুল আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন 'পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি' (এম এল)

---

৪৭. 'ন্যাপের ৩০ বছর', বিচিত্রা।

৪৮. মাওলানা ভাসানী ঃ রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম, সম্পাদনা-শাহরিয়ার কবির, পৃষ্ঠা-২৫

৪৯. '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টির ভূমিকা' বিচিত্রা।

www.bjilibrary.com

স্বাধীনতা যুদ্ধকে 'প্রতিবিপ্লবী' আখ্যা দিয়ে একে 'সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা প্রত্যাশী দুই কুকুরের কামড়া-কামড়ি' হিসেবে বর্ণনা করেছিলো।[৫০] পিকিংপন্থী গ্রুপ গুলোর মধ্যে শুধু সিরাজ সিকদারের গ্রুপকেই কেউ কেউ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু এ মতও ঠিক নয়। সিরাজ সিকদারের যুদ্ধ ছিলো প্রকৃতপক্ষে আদর্শিক একটা মুক্তি সংগ্রাম যা স্বাধীনতা যুদ্ধকে একটা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। ভারত কেন্দ্রিক চলমান স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে তার কোনোই সম্পর্ক ছিলো না। ২০ এপ্রিলের (১৯৭১) একটা ইশতেহারে 'শেখ মুজিব ও তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে ভারতে গঠিত সরকারকে সমর্থন বা সহযোগিতা দিতে সিরাজ সিকদার অস্বীকার করেছিলেন' এবং 'স্বাধীনতা যুদ্ধের সহায়তার নামে ভারত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বা অন্য কোনো দেশের সৈন্য বা সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্ব বাংলার ভূমিতে প্রবেশ করতে দেয়ার সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের সম্পর্কে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।'[৫১] সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে সিরাজ সিকদারের এ ভূমিকা ছিলো মুক্তিযুদ্ধের জন্যে সর্বনাশের এবং মুক্তিযুদ্ধ বিনাশী শক্তি পাকিস্তান বাহিনীর যুদ্ধ-কৌশলের একান্ত সহায়ক।[৫২] '৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে যে স্বাধীনতা লাভ হয়, তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করে সিরাজ সিকদার একে 'ভারতের উপনিবেশ' এবং 'ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদীদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ' বলে আখ্যায়িত করেন।[৫৩] সিরাজ সিকদারের মৌল অবস্থান ভাসানী ন্যাপের মৌলনীতি ও অবস্থানের সাথে সংগতিপূর্ণ। মাওলানা ভাসানী সেই ১৯৬৬ সালে যে নীতিগত[৫৪] দৃষ্টিকোণ থেকে ৬ দফার সমালোচনা করেছিলেন, যে কারণে চৌ এন লাই ৭০-এর নির্বাচন

৫০. '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টির ভূমিকা' বিচিত্রা।

৫১. '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টির ভূমিকা' বিচিত্রা।

৫২. "তাঁর (সিরাজ সিকদার) মতে ক্ষমতালিপ্সু আওয়ামী লীগ নেতারা ভারতে গিয়ে 'ছয় পাহাড়' তথা ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সমান্তবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ ্যবাদ এবং পূর্ব বাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের দালালে পরিণত হয়েছেন। এদের প্রদত্ত আশ্রয়, অস্ত্র, অর্থ ও সমর্থনের বিনিময়ে তারা নিজেদের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়েছেন, পূর্ব বাংলাকে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের কাছে বন্ধক দিয়েছেন।"-('৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টির ভূমিকা, বিচিত্রা।

৫৩. ঐ

৫৪. "মাওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ৬ দফাকে পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজির সাথে মুকাবিলায় পরাস্ত এবং অবদমিত বাঙালী ধনিক শ্রেণীর অবাধ বিকাশের কর্মসূচী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলো।"- 'আওয়ামী লীগের ৩৭ বছর', বিচিত্রা, নবেম্বর, ১৯৮৬।

www.bjilibrary.com

সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিলেন, সে একই নীতিগত কারণে ভাসানী ন্যাপ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি। ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয় দিবসকে মাওলানা ভাসানি 'বিজয় দিবস' মনে করতেন না। এ তারিখে পাকিস্তান বাহিনীকে ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করানোর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে 'ভারতীয় উপনিবেশ' বানিয়েছে এ যুক্তিতেই ভাসানি ১৬ই ডিসেম্বর 'বিজয় দিবস' এর বদলে একে 'কালো দিবস' হিসাবে পালন করেছেন।

মুসলিম লীগ

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই মুসলিম লীগ সমগ্র ভারতে মুসলিম স্বার্থের প্রতীক হয়ে উঠলো। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু স্বার্থের প্রতীক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মোকাবিলায় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা ছিলো মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দর্শন। জাতীয় স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন মাওলানা আবুল কালাম আযাদের মতো গুটিকয়েক মুসলমান ছাড়া কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ থেকে শুরু করে সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিব পর্যন্ত সকলেই ছিলেন মুসলিম লীগের নেতা ও কর্মী। সংখ্যা গুরু হিন্দুদের গ্রাস থেকে মুসলমানদের রক্ষার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিলো মুসলিম লীগের।

১৯০৫ সালে বংগ-ভংগ হওয়া এবং হিন্দুগণ কর্তৃক এর উৎকট বিরোধিতা ১৯০৬ সালে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সংগঠন 'মুসলীম লীগ'-এর সৃষ্টি ত্বরান্বিত করে। বংগ-ভংগের মাধ্যমে ঢাকা কেন্দ্রিক পূর্ব বংগ প্রদেশ গঠন পূর্ব বংগের অনুন্নত, অবহেলিত মুসলিম সংখ্যা গুরু জনগণের উপকারে এসেছিলো। কিন্তু হিন্দু-পুঁজি ও হিন্দু জমিদার শোষিত পূর্ববংগের মজলুম মানুষের উপকারকে হিন্দুরা ভালো চোখে দেখেনি। "তাঁদের মতে বিভাগ প্রস্তাবের অর্থ বঙ্গ-মাতাকে দ্বি-খণ্ডিত করার প্রচেষ্টা। তাই এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন গড়ে তোলে। সে সংগঠিত আন্দোলনের শ্লোগান ছিলো 'বন্দে মাতরম'। মাতৃ-বন্দনার এ শ্লোগান পরে সাম্প্রদায়িক অর্থ পেয়েছিলো। এক পক্ষের বিভাগ সমর্থন এবং অন্য পক্ষের প্রবল বিরোধিতার ভেতর দিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যটাই নতুন করে উদঘাটিত হলো।"[৫৫] হিন্দুদের এ বাড়াবাড়ি এবং তার ঈর্ষার কথা অমুসলিম লেখক, চিন্তাবিদদেরও নজর এড়ায়নি। ভারতের সংখ্যাগুরু দলিতদের নেতা ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম জনক ডঃ আম্বেদকর

৫৫. উনিশ শ ছয় থেকে ছত্রিশ–অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (শতাব্দী পরিক্রমা' শীর্ষক বিএনআর প্রকাশিত সংকলন থেকে নিবন্ধটি 'আমাদের সাহিত্যে ও ভাবনায় কায়েদে আযম' শীর্ষক সংকলনে নতুন করে ছাপা হয়েছে পৃষ্ঠা–৮৪)

www.bjilibrary.com

লিখছেন, "সারা বাংলা, উড়িষ্যা ও আসাম এমনকি উত্তর প্রদেশও ছিলো বাংলার হিন্দুদের চারণ ভূমি। তারা এসব প্রদেশের সিভিল সার্ভিস দখল করে রেখেছিলো। বংগ বিভাগের অর্থ ছিলো এ চারণ ভূমির সীমা হ্রাস।

বংগ বিভাগের প্রতি হিন্দুদের বিরোধিতার পশ্চাতে বাংলার মুসলমানদেরকে তাদের ন্যায়সংগত অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার ইচ্ছাই প্রধান ছিলো।"[৫৬] ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী নিরদ চন্দ্র চৌধুরী (এন. সি. চৌধুরী) বলছেন, "বংগ বিভাগ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শক্রতার একটি স্থায়ী অবদান রেখে যায় এবং মুসলমানদের প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা আমাদের অন্তরে আসন লাভ করে বন্ধুত্বের যাবতীয় অন্তরঙ্গতার অবসান ঘটায়। রাস্তা-ঘাট, বিদ্যালয় এবং হাট-বাজার সর্বত্রই এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং সর্বোপরি এটা মানুষের মনের মধ্যে বাসা বাঁধে।[৫৭] বস্তুত ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের প্লাটফরমে হিন্দু-মুসলিম মিলন শ্লোগানের মুখোশে হিন্দুদের রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠাকামী ও মুসলিম স্বার্থ বিনাশী যে চেহারা গান্ধী, নেহেরু, প্রমুখ হিন্দু নেতৃবৃন্দ সযতনে গোপন করে রেখেছিলেন, বংগভংগের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে তার নগ্ন প্রকাশ ঘটে। নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়ার উদ্যোগ হিসেবে নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯০৬ সালে ঢাকার শাহবাগ উদ্যানে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করলেন। এ সম্মেলনেই গঠিত হলো 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'। কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম নেতৃবৃন্দ একে একে মুসলিম লীগে চলে এলেন। ১৯১৩ সালে কায়েদে আযম মুসলিম লীগে যোগদানের পর মুসলিম লীগ নতুন প্রাণ পেল। এ মুসলিম লীগই মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাস ভূমি ও আযাদী ছিনিয়ে আনলো ১৯৪৭ সালে।

কিন্তু মুসলমানদের এ ঐতিহ্যবাহী সংগঠন অন্তঃসংঘাত থেকে মুক্ত ছিলো না। দেশ বিভাগ ও কায়েদে আযমের মৃত্যুর পর যা আরও উৎকটভাবে দেখা দেয়। সাংগঠনিক দুর্বলতা, বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে বিরোধী দলের সংখ্যা দাঁড়াল উনিশটিতে। '৫১ পর্যন্ত খোদ মুসলিম লীগ নামের সংগঠনের সংখ্যাই দাঁড়াল পাঁচটি।[৫৮] সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলো পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ

---

৫৬. 'পাকিস্তান এণ্ড দ্য পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া'-বি, আর, আম্বেদকর, পৃষ্ঠা-১১১

৫৭. 'এ্যান অটোবায়োগ্রাফি অব এ্যান আননোন ইণ্ডিয়ান'-এন সি চৌধুরী, পৃষ্ঠা-৩৯

৫৮. মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ', মামদোতের নবাবের নেতৃত্বে 'জিন্নাহ মুসলিম লীগ', মানকি শরিফের পীরের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী মুসলিম লীগ', সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে 'জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ' এবং সরকারী 'মুসলিম লীগ'।

www.bjilibrary.com

সংগঠন। বাংলার মুসলিম নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, খাজা নাজিমউদ্দীন, আবুল হাশিম, আকরম খান প্রমুখ। এঁদের মধ্যে ফজলুল হক আগেই মুসলিম লীগ চত্বর থেকে ছিটকে পড়েন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিমও ঝরে পড়লেন মুসলিম লীগ থেকে। কংগ্রেস নেতা শরৎ বসুর সাথে মিলে যুক্ত বাংলার আন্দোলন করা, দেশ বিভাগের পর তাঁরা ঢাকায় চলে না আসা এবং আরও কিছু কারণে তারা লীগে তাদের অবস্থান হারান। সুতরাং '৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর মুসলিম লীগ পুরোপুরি খাজা নাজিমউদ্দীন গ্রুপের কুক্ষিগত হয়ে পড়লো। আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা ভাসানী আসাম থেকে যখন ফিরলেন মুসলিম লীগের সাধারণ সদস্য পদও পেলেন না। সোহরাওয়ার্দী এবং তাঁর অনুগত কর্মীদের ক্ষেত্রেও এটাই ঘটলো। এ অবস্থায় মুসলিম লীগ যেমন দুর্বল হয়ে পড়লো, তেমনি শক্তিশালী বিরোধী দল গঠিত হবার সুযোগ হলো। ১৯৪৯ সালে ২৩ জুন মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবের মতো মুসলিম লীগ পরিত্যক্তদের নিয়ে গঠিত হলো আওয়ামী মুসলিম লীগ। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো ১৯৫২ সালে। অগণতান্ত্রিকতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা অন্তত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগকে ভেতর থেকে একেবারেই অন্তঃসারশূন্য করে তুললো। বিভাগোত্তরকালে পূর্ব পাক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন মাওলানা আকরাম খান। ১৯৫২ সালের আগস্টের কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতি করা হলো জনাব নূরুল আমীনকে। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতার আসন থেকে মুসলিম লীগ নির্মূল হয়ে যায়। ২৩৭টি আসনের মধ্যে মাত্র দশটি আসনে মুসলিম লীগ জয় লাভ করে। মুসলিম লীগ থেকে যাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও ভারতের অনুচর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিলো, সেই হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীরাই ক্ষমতায় এলেন। পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতা হারালেও মুসলিম লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে ক্ষমতায় থাকলো এবং কেন্দ্রে ক্ষমতার অংশীদার রইলো। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন এলো। '৬২ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসনকালে শাসন চত্বরে মুসলিম লীগ প্রভাবশীল থাকলো। তারপর আইয়ুব খান মুসলিম লীগে যোগদান করে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করায় '৬৯ সালে আইয়ুব খানের পতন পর্যন্ত মুসলিম লীগ ক্ষমতায় টিকে থাকলো। আইয়ুব খান কর্তৃক মুসলিম লীগের কনভেনশন আহ্বানকে কেন্দ্র করে মুসলিম

www.bjilibrary.com

লীগের একটা অংশ আলাদা হয়ে যায়। কাউন্সিল মুসলিম লীগ নামে এ গ্রুপ বিরোধী দলীয় ভূমিকা পালন করে যায়। '৬৯ সালে কনভেনশন মুসলিম লীগ আবার দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে এক ভাগের নেতৃত্বে ছিলেন খান এ সবুর, অন্য ভাগকে নেতৃত্ব দেন ফজলুল কাদের চৌধুরী। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের সব গ্রুপই অংশগ্রহণ করে। কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৭টি, কনভেনশন মুসলিম লীগ (ফজলুল কাদের) ২টি এবং কাইয়ুম মুসলিম লীগ (সবুর) ৯টি আসনে জয়লাভ করে। কিন্তু সবগুলো আসনই পশ্চিম পাকিস্তানে।

মুসলিম লীগের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের জন্ম। মুসলিম লীগ শুরু থেকেই আওয়ামী লীগকে মনে করতো ভারতীয় স্বার্থের প্রতিভু, আর আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগকে মনে করতো পাঞ্জাবী স্বার্থের ক্রীড়ানক। জাতীয় রাজনীতির দুই প্রান্তে ছিলো দু দলের অবস্থান। ১৯৭১ সালের মার্চে অসহযোগ আন্দোলনের সময় কাউন্সিল মুসলিম লীগ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান ও শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে তৎপরতা দেখিয়েছে। কিন্তু কাইয়ুম মুসলিম লীগ সব সময় ভুট্টো পক্ষকেই সমর্থন করে গেছে। অন্যদিকে কনভেনশন মুসলিম লীগ অনেকটা নীরবতা পালন করেছে।

সুতরাং ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলো, মুসলিম লীগ তাকে সমর্থন করেনি। আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে দাঁড়ালে মুসলিম লীগ তার বিপরীত পক্ষে অবস্থান নিলো।

জামায়াতে ইসলামী

জামায়াতে ইসলামী স্বাধীনতা উত্তরকালে হয়ে পড়ে সবচেয়ে বেশী বিতর্কের শিকার। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের তারা বিরোধিতা করেছে এবং পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন করেছে। ১৯৭১ সালে এ ভূমিকা পালন করেছে মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি, পিডিপি, কেএসপি, জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তান সহ ইসলামপন্থী সকল সংস্থা ও সংগঠনও। এদেরকেও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী বলে গালি দেয়া হয়, কিন্তু অভিযোগ ও আক্রমণের প্রবল ঝড় জামায়াতে ইসলামীকেই আহত করেছে সবচেয়ে বেশী। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বি. এন. পি. সরকারও এক সময় জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী হবার অভিযোগ এনে মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে প্রবল এক

www.bjilibrary.com

আন্দোলন শুরু করেছিল। অথচ বি. এন. পি.-র ক্যাবিনেটে তখন শাহ আজিজ, আবদুল আলিম, মাওলানা আবদুল মান্নানের মতো স্বাধীনতা যুদ্ধ বিরোধীদের শক্তিশালী অবস্থান। এরশাদ সরকারের আমলেও এ ঘটনাই ঘটলো। তাঁর ক্যাবিনেটেও স্বাধীনতা যুদ্ধ বিরোধীদের শক্ত অবস্থান আমরা দেখি। অথচ তিনি জামায়াতে ইসলামীকে স্বাধীনতা বিরোধী আখ্যায়িত করে তাঁদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের লাগান। আর আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী দলগুলো তো পারলে জামায়াতে ইসলামীকে উৎখাত করেই ছাড়ে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, যারা তখন রাজাকার সেজে পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগিতা করেছে, তাদের মধ্যে এমনকি আওয়ামী লীগসহ সব দলের লোকই ছিলো, তাদের কথা চেপে যাওয়া হচ্ছে।[৫৯ক] পত্র-পত্রিকারও আক্রমণের টার্গেট জামায়াতে ইসলামী। সাপ্তাহিক বিচিত্রার মতো মানী পত্রিকাও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে অর্ধ ডজনেরও বেশী কভার স্টোরি করে। এর কারণ সম্ভবত এটাই যে, স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান না করা দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামীই সবচেয়ে সংগঠিত ও শক্তিশালী দল হিসেবে আজ আবির্ভূত হয়েছে। সুতরাং আমাদের আলোচনায় রাজনৈতিক অংগনের এ দলটির একটু গভীরেই আমাদের দৃষ্টিপাত করা উচিত।

জামায়াতে ইসলামী ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। দলটির প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ভারতের আওরঙ্গবাদে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লামা ইকবালের আমন্ত্রণে তিনি লাহোরে এসে বসতিস্থাপন করেন।[৫৯খ] জামায়াতে ইসলামী একটি ক্যাডারভিত্তিক দল হিসেবে পরিচিত। দলটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "বাংলাদেশে তথা সারা বিশ্বে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানব জাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত দীন (ইসলামী জীবন বিধান) কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য অর্জন

৫৯ক. খন্দকার আবুল খায়ের, যার বাড়ীতে মুক্তিযুদ্ধকালে শেখ মুজিবের ভাই শেখ নাসের ৩৫ দিন লুকিয়ে ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধকালে যার বাড়ী ছিলো অনেক ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ নেতার আশ্রয়, 'সওয়াল জওয়াব' নামক পুস্তিকায় লিখেন ঃ

"আমি যে জেলার লোক সেই জেলার ৩৭টি ইউনিয়ন থেকে জামায়াত আর মুসলিম লীগ মিলে ৭০-এর নির্বাচনে ভোট পেয়েছিলো দেড় শতের কাছাকাছি আর সেখানে রাজাকারের সংখ্যা ১১ হাজার। যার মাত্র ৩৫টি ছেলে জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগারদের। .... যারা ছিলো সুযোগ সন্ধানী, তারা সুযোগ পেয়েছে, ব্যস রাজাকার হয়ে পড়েছে। এরপর এগার হাজার রাজাকার যারা নৌকা (আওয়ামী লীগ) থেকে নেমে এসেছিলো, তাদের সব দোষ গিয়ে আমাদের (ইসলামপন্থীদের) ঘাড়ে চাপল।"-(সওয়াল-জওয়াব', খন্দকার আবুল খায়ের, পৃষ্ঠা-৪৪, ৪৫, ৬২)

৫৯খ. আল্লামা ইকবালের পুত্র বিচারপতি ডঃ জাবিদ ইকবালের সাক্ষাতকার, বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা, মওদূদী, পৃষ্ঠা-৩২৩

www.bjilibrary.com

করাই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।"[৬০]

জামায়াতে ইসলামীর সদস্য হতে হলে প্রত্যেককেই একটা শপথ বাক্য পাঠ করতে হয়। শপথে বলতে হয় ঃ "আমি অমুক পিতা বা স্বামী অমুক জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর গঠনতন্ত্রে বর্ণিত আকীদা[৬১] উহার ব্যাখ্যা সহকারে ভালোভাবে বুঝিয়া লওয়ার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রাখিয়া ঘোষণা করিতেছি যে-(১) এক ও লা-শরীক আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার বান্দাহ ও রাসূল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ), (২) আমি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উহার ব্যাখ্যা সহকারে ভালোভাবে বুঝিয়া লওয়ার পর অংগীকার করিতেছি যে, দুনিয়ায় সামগ্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানব জাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত দীন কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করাই আমার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য হাসিলের প্রচেষ্টা চালাইবার জন্যে আমি খালিসভাবে জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হইতেছি, (৩) আমি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর গঠনতন্ত্র বুঝিয়া লওয়ার পর ওয়াদা করিতেছি যে, আমি (ক) এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জামায়াতের নিয়ম-শৃঙ্খলা পূর্ণরূপে মানিয়া চলিব, (খ) সর্বদা শরীয়ত নির্ধারিত ফরয-ওয়াজিবসমূহ রীতিমতো আদায় করিব এবং কবীরাহ গুনাহসমূহ হইতে বিরত থাকিব, (গ) আল্লাহর নাফরমানীর পর্যায়ে পড়ে উপার্জনের এমন কোনো উপায় গ্রহণ করিবো না, (ঘ) এমন কোনো পার্টি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক রাখিব না, যাহার মূলনীতি এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জামায়াতে ইসলামীর আকীদা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কর্মনীতির পরিপন্থী। ইন্না সালাতী ও নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়া-ইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন। আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালনের তওফিক দান করুন। আমীন।"[৬২]

জামায়াতে শামিল হবার পর লোকদেরকে দলের তিন দফা দাওয়াত ও চার দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজ করে যেতে হয়। তিন দফা দাওয়াতের কথাগুলো এই ঃ (১) সাধারণভাবে সকল মানুষ ও বিশেষভাবে মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূলের (স) আনুগত্য করিবার আহ্বান,

---

৬০. গঠনতন্ত্র, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-৮

৬১. কালেমায়ে তাইয়্যেবা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) এবং তার ব্যাখ্যা।

৬২. গঠনতন্ত্র, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-৩৬-৩৭।

www.bjilibrary.com

(২) ইসলাম গ্রহণকারী ও ঈমানের দাবীদার সকল মানুষের প্রতি বাস্তব জীবনের সকল কাজে মুনাফিকী ও কর্ম-বৈষম্য পরিহার করিয়া খাঁটি ও পূর্ণ মুসলিম হওয়ার আহ্বান, (৩) সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজের সকল ক্ষেত্র হইতে অসৎ, খোদাদ্রোহী যালিম ও ফাসিক নেতৃত্ব অপসারিত করিয়া সৎ, খোদাভীরু, ন্যায়পরায়ণ ও আল্লাহর নেক বান্দাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আহ্বান।"

আর চার দফা স্থায়ী কর্মসূচীতে বলা হয়েছে ঃ (১) "সর্ব শ্রেণীর মানুষের নিকট ইসলামের প্রকৃত রূপ বিশ্লেষণ করিয়া চিন্তার বিশুদ্ধীকরণ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত করা, (২) ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার সংগ্রামে আগ্রহী সৎ ব্যক্তিদিগকে সংগঠিত করা এবং তাহাদিগকে জাহিলিয়াতের যাবতীয় চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও ইসলাম কায়েম করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীরূপে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দান করা, (৩) ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সংশোধন, নৈতিক পুনর্গঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন এবং দুঃস্থ মানবতার সেবা করা, এবং (৪) ইসলামের পূর্ণাংগ প্রতিষ্ঠাকল্পে গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বাঞ্ছিত সংশোধন আনয়নের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরে সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা।"[৬৩]

জামায়াতে ইসলামীর এ উদ্দেশ্য লক্ষ্য, দাওয়াত কর্মসূচী এবং ক্যাডারভিত্তিক পার্টি গঠনের মূলে জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদীর নিজস্ব একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগি কাজ করেছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মৌল সমস্যাগুলোকে মওদূদী এক বিশেষ দৃষ্টিভংগিতে অবলোকন করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ হলো ঃ "দুনিয়ায় ফেতনা ফাসাদের মূল উৎস হলো মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব (খোদায়ী)। এর থেকেই অনাচার অকল্যাণের সূচনা হয় এবং এর থেকেই আজ হলাহলের বিষাক্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে। .... কোথাও একটি জাতি আরেকটি জাতির খোদা হয়ে বসেছে, কোথাও এক শ্রেণী আরেক শ্রেণীর খোদা, কোথাও গ্রুপ একটি প্রভুত্ব কর্তৃত্বের আসন অধিকার করে আছে, কোথাও জাতীয় রাষ্ট্র খোদার আসনে বিরাজমান, কোথাও কোনো ডিক্টেটর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো খোদা আছে

৬৩. গঠনতন্ত্র, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা–৯-১০)

www.bjilibrary.com

বলে আমার জানা নেই (সূরা কাসাস, ৮৩)। .... এটাই হলো সেই অশুভ শক্তি যা মানুষের সকল বিপদ-মুসিবত, সকল বিপর্যয় ও ধ্বংস এবং সকল বঞ্চনার মূল কারণ। তার উন্নতি-অগ্রগতির পথে এটাই বড় বাধা। .... এর প্রতিকার এছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে, মানুষ সকল খোদায়ীর দাবীদার শক্তিগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র আল্লাহকে নিজের 'ইলাহ' এবং একমাত্র রাব্বুল আলামীনকে নিজের 'রব' বলে মেনে নেবে .... এটাই সেই বুনিয়াদী সংস্কার সংশোধনের কাজ যা আল্লাহর মহান নবীগণ মানুষের জীবনে করেছেন।"[৬৪] এই মৌল সমস্যার পটভূমিতে মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর মত হলো, "মুসলমানদের বাঁচার উপায় থাকলে শুধু এর মধ্যেই আছে যে, তাদেরকে আবার নতুন করে জাতির মুবাল্লিগের ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধুমাত্র এ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমেই তারা সেসব জটিলতা থেকে মুক্ত হতে পারে যার মধ্যে তারা এখন নিমজ্জিত আছে। .... একথা তাদের মনে বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে, ইসলামের নিজস্ব একটা জীবন বিধান আছে। তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা আছে, নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে, তার নিজস্ব চিন্তাধারা আছে, নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা আছে–যা সব দিক দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো থেকে অনেক ভালো ও উচ্চমানের। সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপারে কারো কাছে হাত পাততে হবে, এ ধারণা তাদের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে।"[৬৫]

এ দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে নতুন করে মুবাল্লিগের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্যেই মাওলানা মওদূদী মুসলিম লীগ থেকে ভিন্নতর একটা দল গঠনের কথা চিন্তা করেন। তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন, "তারপর ১৯৩৯ সাল এবং তার পরের কথা। মুসলিম লীগের আন্দোলন জোরদার হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রস্তুতি হতে থাকে। অবশেষে ১৯৪০ সালে আন্দোলন পাকিস্তান প্রস্তাবের রূপ লাভ করে। .... সে সময়ে আমার মনের মধ্যে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তাহলো এই যে, মুসলমানদের মধ্যে এ অনুভূতির সঞ্চার করা হোক যে, তারা নিছক একটা জাতি নয়, বরঞ্চ একটা মুবাল্লিগ জাতি, একটা মিশনারী জাতি। তাদের এমন এক রাষ্ট্র কায়েম করা উচিত যা হবে একটা মিশনারী রাষ্ট্র।

---

৬৪. ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ (দ্রষ্টব্য, 'জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, পৃষ্ঠা–৮২)

৬৫. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা–৮০

www.bjilibrary.com

এ উদ্দেশ্যে আমি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখা শুরু করি.........। যখন আমি দেখলাম যে, আমার সবকিছু অরণ্যে রোদন হয়ে পড়ছে, তখন আমি দ্বিতীয় পদক্ষেপ যা আমি সমীচীন মনে করলাম তা এই যে, নিজের পক্ষ থেকে একটি জামায়াত গঠন করা উচিত–যা চরিত্রবান লোক নিয়ে গঠিত হবে এবং ঐসব ফেতনার মোকাবিলা করবে যার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সে সময় যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমার মনে ছিলো তা এই যে, অবস্থা যেদিকে চলছে তাতে একটা সংকট এটা হতে পারে যে, পাকিস্তান সংগ্রামে মুসলিম লীগ বিফল মনোরথ ....হবে এবং ইংরেজ ভারতে এক ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করে তা হিন্দুদের হাতে তুলে দিয়ে চলে যাবে। তখন কি করতে হবে ? দ্বিতীয় অবস্থা এ হতে পারে যে, মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং দেশ বিভক্ত হয়ে যাবে, এ অবস্থায় কয়েক কোটি মুসলমান যে ভারতে রয়ে যাবে তাদের কি দশা হবে এবং স্বয়ং পাকিস্তানে ইসলামের দশাটাই বা কি হবে ? ....। এ ছিলো এমন এক পরিস্থিতি যখন আমি এ দৃঢ় সিদ্ধান্ত করলাম যে, জামায়াতে ইসলামী নামে একটি জামায়াত গঠন করা হোক।”[৬৬]

জামায়াতে ইসলামীর মৌল দৃষ্টিভংগি সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনা থেকে জামায়াতের যে প্রকৃতিটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে তাহলো ঃ (১) জামায়াতে ইসলামী ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং জামায়াত সদস্যরা মুবাল্লিগ বা মিশনারী চরিত্রের, (২) আদর্শের প্রতিষ্ঠা তাদের মূল লক্ষ্য, এ মূল লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থেই তারা চায় নেতৃত্বের পরিবর্তন যা তাদের ভাষায় সৎ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা, (৩) আদর্শ বা ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার যারা বিরোধী, তারা মানুষের ইহকালীন সুখ-শান্তি ও পরকালীন সাফল্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী এবং এরাই অসৎ নেতৃত্ব, এদের বিরোধিতা করতে জামায়াত আদর্শিকভাবে বাধ্য এবং (৪) জামায়াত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।[৬৭]

জামায়াতে ইসলামীর এ বৈশিষ্ট্যগুলো তাকে একদমই একটা ভিন্ন প্রকৃতির দলে পরিণত করেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ কয়েক

---

৬৬. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা–৮৩-৮৪।

৬৭. “জামায়াত উহার, বাঞ্ছিত সংশোধন ও বিপ্লব কার্যকর করিবার জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ দাওয়াত সম্প্রসারণ এবং সংগঠন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লোকদের মনমগজ ও চরিত্রের সংশোধন এবং অনুকূলে জনমত গঠন করিবে।”–(গঠনতন্ত্র, পৃষ্ঠা–৯)

www.bjilibrary.com

খণ্ডে বিভক্ত হলো, আওয়ামী লীগ গঠিত হলো, তারপর আরও অনেক দল সামনে এলো, কিন্তু কারও সাথেই জামায়াতে ইসলামীর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কম্যুনিস্ট পার্টিও ক্যাডারভিত্তিক, তারও একটা আদর্শিক লক্ষ্য আছে। এ দিক দিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে জামায়াতে ইসলামীর তুলনা করা হয়। কিন্তু আসলেই তাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। কম্যুনিস্ট পার্টির একটা আদর্শ আছে, কিন্তু তা মানবীয়, যার পরিবর্তন মানবীয় ইচ্ছারই অধীন। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ খোদায়ী –যার পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোনো ক্ষমতা জামায়াতে ইসলামীর নেই। কম্যুনিস্ট পার্টি লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিতে পারে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্যের মতোই লক্ষ্যে পৌঁছার পথও তার সুনির্দিষ্ট, যার নির্মাতা মহানবী (স)। এখানে কোনো স্বেচ্ছাচারিতার অবকাশ নেই।[৬৮] জামায়াতে ইসলামীর এ অনড় নীতিনিষ্ঠ প্রকৃতির জন্যেই তাকে মৌলবাদী বা ফাণ্ডামেন্টালিস্ট বলা হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু ইসলাম এখানে প্রতিষ্ঠিত হলো না। সকল মুসলমানের সংগ্রামের ফসল পাকিস্তানকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করলো এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি রাষ্ট্র পরিচালনামূলক আদর্শিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও চরম স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়ে চললো। জামায়াতে ইসলামী এর তীব্র বিরোধিতায় এগিয়ে এলো। উত্থাপন করলো চার দফা দাবী ঃ[৬৯] প্রথম, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সার্বভৌম মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা এবং এ রাষ্ট্রে একমাত্র তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হবে। দ্বিতীয়ত, এ যাবত যত প্রকার ইসলাম বিরোধী আইন বলবত আছে, তার সবই রহিত করতে হবে। তৃতীয়ত, একমাত্র ইসলামী শরীয়তই হবে পাকিস্তানের যাবতীয় আইন-কানুনের উৎস। চতুর্থত, শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যেই পাকিস্তান তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে পারে। এ আন্দোলন দমনের জন্য মুসলিম লীগ সরকার 'জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল করছে', 'জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে

৬৮. "কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা কোনো কর্মপন্থা গ্রহণের সময় জামায়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের (স) নির্দেশ ও বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিবে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্যে জামায়াতে ইসলামী এমন কোনো উপায় ও পন্থা অবলম্বন করিবে না যাহা সততা ও বিশ্বাসপরায়ণতার পরিপন্থী কিংবা যাহার ফলে দুনিয়ায় ফিতনা ও ফাসাদ (বিপর্যয়) সৃষ্টি হয়।"–(গঠনতন্ত্র জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা–৯

৬৯. ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরে আইন কলেজে প্রদত্ত ভাষণে মাওলানা মওদূদী এ চার দফা দাবী উত্থাপন করেন। 'মাওলানা মওদূদী, আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা–৯৮

www.bjilibrary.com

না' ইত্যাদি অভিযোগ তুলে মাওলানা মওদূদীসহ জামায়াতের উর্ধতন নেতৃবৃন্দকে ১৯৪৮ সালের ৪ অক্টোবর গ্রেফতার করলো। দীর্ঘ উনিশ মাস বিনা বিচারে কারাভোগের পর ১৯৫০ সালের ২৮ মে তাঁরা ছাড়া পান। এ আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৫১ সালে জামায়াতে ইসলামী ৯ দফা৭০ দাবীর ভিত্তিতে গোটা দেশ ব্যাপী প্রবল স্বাক্ষর অভিযান শুরু করলো। স্বাক্ষর অভিযান ৫২ সালের শেষ পর্যন্ত চললো। পাঞ্জাব ডিস্টারব্যান্স৭১ যাতে ১১জন নিহত ও ৪৯জন আহত হয়, এর অজুহাতে ১৯৫৩ সালের ২৮ মার্চ মুসলিম লীগ সরকার মাওলানা মওদূদী ও অন্যান্য জামায়াত নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে। সামরিক আদালত মাওলানা মওদূদীকে প্রাণদণ্ড দেয়। কিন্তু দেশের ভেতর ও বাইরে তীব্র প্রতিক্রিয়ার দরুন তাঁকে অবশেষে মুক্তি দেয়া হয়। দীর্ঘ দু বছর ন মাস পরে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

জামায়াতে ইসলামীর রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও সংশোধনের এ আন্দোলন ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হওয়া পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চললো। ১৯৬২ সালে সামরিক শাসন প্রত্যাহার হলে জামায়াত তার আন্দোলন পুনরায় শুরু করলো। ১৯৬৩ সালের ২৫ অক্টোবর লাহোরে জামায়াতে ইসলামীর ৬ শত শামিয়ানার এক বিশাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। কনভেনশন মুসলিম লীগের সরকার একে ভালো চোখে দেখেনি। তারা সম্মেলনে মাইক ব্যবহারের অনুমতি দিলো না। এরপরও সম্মেলন চললে তা সরকার লেলিয়ে দেয়া হামলার সম্মুখীন হয়। প্যাণ্ডেলে আগুন লাগানো হয়। একজন জামায়াত কর্মী আল্লাহ বখশকে গুলী করে হত্যা করা হয়।

---

৭০. "উক্ত ৯ দফা দাবী ছিলো–ইসলামী শরীয়তই হবে দেশের শাসনতন্ত্রের প্রকৃত উৎস, শরীয়াতের খেলাফ কোনো 'আইন প্রণয়ন করা চলবে না, সকল শরীয়ত বিরোধী আইন বাতিল করতে হবে, সরকারের কর্তব্য হবে ভালো কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করা, আদালতে বিচার ব্যতিরেকে নাগরিক অধিকার হরণ করা চলবে না। শাসন বিভাগ ও সরকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দেশের আদালতে বিচার প্রার্থনা করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে, বিচার বিভাগে শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ চলবে না। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন যথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা–এ পাঁচটি বিষয়ের পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।"–(মাওলানা মওদূদী, পৃষ্ঠা–১০৪

৭১. পাঞ্জাব ডিস্টারব্যান্স বা কাদিয়ানী দাংগা ১৯৫৩ সালের ৪ঠা মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত চলে। এ দাংগা যে ডাইরেকট এ্যাকশন এর ফল তাতে জামায়াত ছিলো না। জামায়াত এর বিরোধিতা করেছে এবং জামায়াতের শূরা ৪ঠা ও ৫ই মার্চ এর তীব্র নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করে।–(মাওলানা মওদূদী, পৃষ্ঠা–১০৬-১০৭

www.bjilibrary.com

এরপরও জামায়াতের আন্দোলন অব্যাহত গতিতেই সামনে এগুলো। ১৯৬৪ সালের ৬ জানুয়ারী কনভেনশন মুসলিম লীগের সরকার জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা করে প্রথম সারির ষাটজন জামায়াত নেতাকে জেলে পুরলো। বলপ্রয়োগে ক্ষমতা দখল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়ানো, সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি ইত্যাদি অভিযোগ জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে আনা হয়। জেল থেকে সরকারের কাছে পেশকৃত দীর্ঘ বক্তব্যে জামায়াত প্রধান মাওলানা মওদূদী জামায়াতের বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ যুক্তি প্রমাণ সহকারে অস্বীকার করে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার তিনটি কারণ চিহ্নিত করেন। তিনি লিখেন, "প্রথম কারণ হলো এই যে, ১৯৬৩ সালের রাওয়ালপিণ্ডির এক জনসভায় বক্তৃতাদান কালে আমি দাবী করেছিলাম যে, কালাত, খারান, মাকরান, বাহওয়ালপুর এবং অন্যান্য সীমান্ত রাষ্ট্রগুলোকে যেভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, ঠিক একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ সোয়াত, দীর প্রভৃতি রাজ্যকেও পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত করা উচিত। এবং পাকিস্তানের অন্যান্য নাগরিকরা যেসব সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করছে, এসব এলাকার অধিবাসীদেরকেও সেসব সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দান করা উচিত। আমার দাবী পূর্ণ আইনানুগ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলো যে, যখন প্রাক্তন বৃটিশ ভারতের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র পাকিস্তান ও ভারতের সাথে সংযুক্ত হলো, তখন গোলামী যুগের এ শেষ চিহ্নটিকেই বা কেন অপসারিত করা হবে না ? এমনি পরিষ্কারভাবে একটি নির্ভুল মত ব্যক্ত করার দরুন সরকারের কতিপয় ঊর্ধতন ব্যক্তি অস্বস্তি অনুভব করেন ও ক্রোধে ফেটে পড়েন। দ্বিতীয়ত, জামায়াতে ইসলামীর প্রচেষ্টায় ক্ষমতাসীন দল রাওয়ালপিণ্ডি ও হায়দরাবাদে দুটি উপনির্বাচনে পরাজয় বরণ করে। এটি ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের ক্রোধকে উস্কিয়ে দেয়। এ নির্বাচন দুটি অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে। তৃতীয়ত, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ জামায়াতে ইসলামীর সুসংগঠিত আন্দোলনকে নিজেদের কনভেনশন মুসলিম লীগের পথে বিরাট বাধা স্বরূপ মনে করতেন। এবং আগামী নির্বাচনের পূর্বে বিরোধী দলের এ সবচেয়ে সুসংবদ্ধ দলকে খতম করে দেয়া এবং তার নেতৃবৃন্দকে ময়দান থেকে সরিয়ে দেয়া জরুরী মনে করতেন। কেননা উপনির্বাচনের ফলাফল প্রত্যক্ষ করে তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী সরকারী দলের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রমাণিত হবে।"[৭২]

৭২. ১৯৬৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী লাহোর ডিস্ট্রিক্ট জেল থেকে হোম সেক্রেটারীর কাছে প্রেরিত মাওলানা মওদূদী লিখিত সুদীর্ঘ চিঠির একটা অংশ, 'মাওলানা মওদূদী', পৃষ্ঠা-১৫৯-১৬০

www.bjilibrary.com

জামায়াতে ইসলামী সরকারের এ নিষিদ্ধাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করে। মামলাটি সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। সুপ্রীম কোর্টের রায়ে সরকারের নিষিদ্ধাদেশ বেআইনী ঘোষিত হয়। নয় মাস কারাভোগের পর জামায়াত নেতাগণ মুক্তি লাভ করেন।

এ ধরনের জুলুম নির্যাতনের মধ্যেই জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যায়। তারা যে যে ইস্যুকে সামনে রেখে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, তার মধ্যেও এ কর্মসূচী প্রধান বিষয় ছিলো।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলন চালিয়ে যাবার সাথে সাথে জামায়াতে ইসলামী জনগণের আশু প্রয়োজন পূরণ ও সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও অংশ নেয়। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার ও দাবী দাওয়ার ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য ছিলো খুবই সুস্পষ্ট। জামায়াত প্রধান মাওলানা মওদূদীর বক্তব্য এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৫৬ সালের ২৪ জানুয়ারী থেকে দেড় মাস পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। সফরকালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মৌল সমস্যা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ-বঞ্চনা সম্পর্কে তিনি বলেন, "যারা এখানে সরকারী কর্মচারী হিসেবে এসেছেন, তাদের একটা বিরাট অংশ বিশেষ কোনো প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেননি। ইংরেজদের চেয়ারে বসে তারা নিজেদেরকে ইংরেজ মনে করে নিয়েছেন। অপর জাতির উপর শাসন চালাতে ইংরেজরা যে নীতি অনুসরণ করতো, তারাও সেই নীতি অবলম্বন করেছেন। তারা একথা চিন্তা করেননি যে, নিজ দেশের নিজ জাতির শাসন তথা খেদমতের ভারই তারা গ্রহণ করেছেন। ইংরেজদের অনুকরণ করাই যদি তাদের লক্ষ্য ছিলো তবে ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত নীতি অনুসরণ করাই তাদের কর্তব্য ছিলো। বস্তুত যেসব কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এ ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করেছে যে, তাদেরকে একটি কলোনীতে পরিণত করা হয়েছে, এই হচ্ছে তার প্রধান কারণ। .... বহিরাগত ব্যবসায়ী ও কারখানা মালিকগণ এসে এখানকার শিল্প ও বাণিজ্য সামলে নিয়েছেন। সে জন্যে আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাদের উচিত ছিলো এ দেশকে নিজেদের দেশ এবং এ জাতিকে নিজেদের জাতি মনে করে অনুন্নত ভাইদের সাহায্য করে উন্নত করবার চেষ্টা করা, শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অগ্রসর হবার জন্যে তাদের সাহায্য করা, তাদের দূরবস্থা দূর করার নিমিত্ত এখানের উপার্জিত অর্থ এখানেই ব্যয় করা

১৫—

www.bjilibrary.com

তাদের মঙ্গল ও উন্নতির জন্যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান কায়েম করা এবং তাদের বিপদ-আপদের সময় যথোপযুক্ত সাহায্য করা। বড়ই দুঃখের বিষয়, তাদের মধ্যে অনেকেই এ কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না।"[৭৩]

সরকারী চাকরি ও দেশ রক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের প্রতি কৃত অবহেলা ও বঞ্চনা প্রশ্নে মাওলানা মওদূদী বলেন, "ইংরেজ আমলে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানগণ চাকরির ক্ষেত্রে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ ছিলো। উচ্চ পদগুলোতে তাদের আনুপাতিক স্থান শূন্যের কোঠায় ছিলো। অবশ্য ইংরেজ ও হিন্দুদের দু শত বছর যাবত কৃত এ ত্রুটি সংশোধন করা সহজ সাধ্যও ছিলো না। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর পূর্বাঞ্চলের মুসলমানগণ ন্যায়তই এ আশা করে আসছিলো যে, তাদেরকে উন্নতি লাভের সুযোগ দেয়া হবে। দুঃখের বিষয় তাদের এ আশা পূর্ণ করা হয়নি। কর্তব্য ছিলো বাংলাদেশের অবহেলিত ও অনুন্নত মুসলমান ভ্রাতাগণকে উন্নত করার চেষ্টা করা যাতে তারা দেশের সেবায় সমান অংশগ্রহণ করার সুযোগও লাভ করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে অত্যন্ত অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে। এটা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো সৈন্য বিভাগের চাকরি, এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি আপত্তিজনক। আজ পর্যন্ত এখানে ইংরেজ আমলের নীতিই প্রচলিত রয়েছে যে, সৈন্য বিভাগের জন্যে কেবল 'সামরিক জাতিই' উপযুক্ত। এ পরিণাম এ হয়েছে, সৈনিক বৃত্তি একটা বিশেষ এলাকার লোকদের জন্যে একচেটিয়া হয়ে রয়েছে। .... জানি না আমাদের ক্ষমতাসীন লোকদের নিকট সিংহল, বার্মা, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ইত্যাদি দেশগুলোর বাসিন্দাগণ সামরিক জাতি বলে গণ্য হয় কিনা। যদি না হয়ে থাকে, তবে হয় তাদের দেশ রক্ষার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত, নতুবা অন্য স্থান থেকে সামরিক লোক আহ্বান করে সৈন্য বাহিনী গঠন করা উচিত। আর যদি এ দেশগুলো নিজেদের দেশ নিজেরাই রক্ষা করতে সক্ষম হয় তবে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা তাদের চেয়ে কোন্ অংশে নিকৃষ্ট যে, তাদেরকে সৈন্য বিভাগের চাকরির অযোগ্য বলা হবে ? এ ব্যাপারটির গুরুত্ব এখানেই শেষ নয়। বরং এ পাকিস্তানের একটি জীবন-মরণ সমস্যা। এ দেশের অর্ধেকেরও বেশী লোক এমন একটি ক্ষুদ্র

---

৭৩. পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা ও তার সমাধান, পৃষ্ঠা-৫, ৭, ৮ (মাওলানা মওদূদী-আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা-১২৪-১২৫)। ১৯৫৬ সালের ৪ মার্চ মাওলানা মওদূদী ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হলে যে দীর্ঘ নীতি নির্ধারণী ভাষণ দেন, তা-ই 'পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা ও তার সমাধান' পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

www.bjilibrary.com

এলাকায় বাস করে যার তিনটি দিকই হিন্দুস্তানের আওতার মধ্যে রয়েছে। তার প্রায় চৌদ্দশত মাইলের সীমান্ত রক্ষা করতে হয়। যুদ্ধের সময় একে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোনো সাহায্য করা সম্ভব বলে মনে হয় না। এখানকার বাসিন্দাগণ যদি নিজেদের দেশ নিজেরা রক্ষা করতে সক্ষম না হয়, তবে কখনও তাদের মনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা আসবে না। তাদেরকে আপনারা এ বিশ্বাস দিয়ে কখনও নিশ্চিত করতে পারবেন না যে, যুদ্ধের সময় পূর্বাঞ্চলকে পশ্চিমাঞ্চল রক্ষা করবে। এ একটি ভ্রান্ত দৃষ্টিভংগি ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৭৪] বাংলাদেশের ভাষা সমস্যার ব্যাপারেও মাওলানা মওদূদীর বক্তব্য খুবই সুস্পষ্ট ছিলো। তিনি বলেন, "বাংলাভাষিগণ উর্দুর সাথে বাংলাকেও সরকারী ভাষা করার দাবী জানিয়েছিলেন। .... প্রথম দিনেই এ দাবী মেনে নিলে বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়া হতো। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বিপরীত কাজ করা হয়েছে। একদিকে দমন নীতির সাহায্যে নিস্পেষিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, আর অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বার বার এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়েছে।"[৭৫]

পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর কাজ শুরু হয়। বাংলা ভাষায় তাদের আন্দোলনের সাহিত্যও তখন খুব সীমিত ছিলো। তাই পঞ্চাশের শেষ পর্যন্তও জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তানে কোনো শক্তিশালী সংগঠন হয়ে দাঁড়ায়নি। ষাটের দশকে এসে তা ক্রমশ বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সাথে স্বৈরাচার বিরোধী ও গণতান্ত্রিক সকল আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীকে সক্রিয় দেখা যায়। মৌলিক গণতন্ত্রের নামে আইয়ুব খানের একনায়কতন্ত্র প্রতিরোধের জন্যে ১৯৬৪ সালের ২০ জুলাই যে সম্মিলিত বিরোধী দল (Combined Opposition Party COP)[৭৬] গঠিত হয়, জামায়াতে ইসলামী তার শক্তিশালী শরিক দল ছিলো, যদিও জামায়াতে ইসলামী তখণ নিষিদ্ধ

---

৭৪. পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা ও তার সমাধান, পৃষ্ঠা–১৪-১৬ (মাওলানা মওদূদী–আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা–১২৭-১২৯)

৭৫. পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা ও তার সমাধান, পৃষ্ঠা–১২-১৩ (মাওলানা মওদূদী–আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা–১২৬)

৭৬. "মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম এবং নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিবৃন্দ ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হবার সংকল্পে ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে ২০ জুলাই (১৯৬৪) চার দিবস ব্যাপী বৈঠকে নয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সম্মিলিত বিরোধী দল (Combined Opposition Party গঠন করেন।"–(জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫–অলি আহাদ, পৃষ্ঠা–৩৪৫)

www.bjilibrary.com

ঘোষিত। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ছয় দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মাঠ থেকে আওয়ামী লীগ যখন উৎখাত প্রায়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঝাণ্ডা যখন ভুলুণ্ঠিত, তখন ১৯৬৭ সালে গঠিত হলো 'পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক মুভমেন্ট (পি ডি এম)।৭৭ জামায়াতে ইসলামী এ আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার ছিলো। পিডিএম-এর পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা স্বনামধন্য আইনজীবি জনাব আবদুস সালাম খান এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আযম। তারপর গণতান্ত্রিক আন্দোলন যখন ১৯৬৯ সালের শুরুতে গণ-আন্দোলনে পরিণত হওয়ার মতো ক্রান্তিলগ্নে পৌঁছল, তখন সমগ্র দেশ ব্যাপী গণ-আন্দোলন পরিচালনার তাকিদে ৭ ও ৮ জানুয়ারী ঢাকায় অনুষ্ঠিত দুই দিন ব্যাপী বৈঠকে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি, পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (ছয় দফা), নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (পিডিএম পন্থী) এর সমন্বয়ে গঠিত হলো ডেমোক্রাটিক এ্যাকশন কমিটি (DAC)। জামায়াতে ইসলামী এ আন্দোলনেও অত্যন্ত সক্রিয় ছিলো।

কিন্তু যে আন্দোলন আওয়ামী লীগকে ঘর থেকে এবং জেলখানা থেকে বের করে আনলো, আওয়ামী লীগ বের হয়ে আসার পর সেই আন্দোলনের এবং আন্দোলনকারীদের পিঠে ছুরিকাঘাত করলো। প্রথম ঘটনা ঘটলো পল্টনে ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ তারিখে। এদিন ডেমোক্রাটিক এ্যাকশন কমিটির জনসভায় আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ ছাড়া আর কোনো দলকে বক্তৃতা করতে দেয়া হলো না। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকলো নানা স্থানে। 'পার হলে পাটনি পাটনি শালা' বলে একটা প্রবাদ আছে, আওয়ামী লীগ এ আচরণই করলো। শেখ মুজিব জেল ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত হবার পর এবং ইসলামাবাদের রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স থেকে ফিরে আসার পর শুধু 'ডেমোক্রাটিক এ্যাকশন কমিটি'র

৭৭. "এক ব্যক্তি শাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি হইতে সমগ্র দেশকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ও জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক বাসনায় পাকিস্তান আওয়ামী (পিডিএম পন্থী), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ঐক্য সংস্থা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। জনাব আতাউর রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত ৩০ এপ্রিলের (১৯৬৭) সভায় 'পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক মুভমেন্ট' গঠিত হয়।"–(জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা–৩৭৯-৩৮০)

www.bjilibrary.com

সাথেই সম্পর্কোচ্ছেদ করলেন না, নিজে হিরো সাজার জন্যে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে অত্যন্ত কদর্যভাবে চিত্রিত করলেন।৭৮ আওয়ামী লীগ এবং তার ছাত্র ফ্রন্টের অগণতান্ত্রিক ও সহিংস আচরণের ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যান্য দলের মতো জামায়াতে ইসলামীর পক্ষেও মাঠে থাকা কঠিন হয়ে পড়লো।

১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পদত্যাগ করলেন। এলেন ইয়াহিয়া খান। তিনি ৫ দফা লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্কের ভিত্তিতে নির্বাচন দিলেন। সব দল লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক মেনে নেয়ার পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন মহলের ষড়যন্ত্র এবং লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক ও ছয় দফার মধ্যে সংঘাতের কারণে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন বিজয়ী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হলো না। জামায়াতে ইসলামী

---

৭৮. "শেখ মুজিবুর রহমান রাওয়ালপিণ্ডি গোল টেবিল বৈঠকে অংশ গ্রহণের পর ১৪ মার্চ ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করিলে জনতা তাঁহাকে বিরোচিত সম্বর্ধনা দান করে। বিমান বন্দরে তিনি ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ সমর্থন করিলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ পূর্ব পাকিস্তানের দাবী মানিতে বাধ্য হইতেন। শেখ সাহেব আরো মন্তব্য করেন যে, 'সর্ব জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, মাহমুদ আলী, ফরিদ আহমদ ও আবদুস সালাম খান অদ্যাবধি বিগত ২২ বৎসর যাবত একই খেলায় মাতিয়া আছেন। মাওলানা ভাসানীর রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করা বিধেয় বলিয়াও তিনি মন্তব্য করেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতৃত্ব শেখ মুজিবুর রহমানকে সমর্থন করিত এবং তাহাদেরই প্রত্যক্ষ প্রয়াসের ফলে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে একচ্ছত্র নেতার মর্যাদা পান। প্রসঙ্গত ইহাও অনস্বীকার্য যে, ঘটনার আবর্তনে সমগ্র বাঙ্গালী জনতাই শেখ সাহেবকে বিনা প্রশ্নে নেতারূপে বরণ করিয়াছিলো। অতএব ব্যক্তি-আক্রোশ মিটাইবার কঠিন প্রয়াসে বিমান বন্দরে লাখো জনতার সামনে উপরোক্ত নেতাদের নাম প্রকাশ তাঁহার আদৌ নেতাসুলভ কাজ হয় নাই। ইহা প্রকারান্তরের উপরোক্ত নেতাদের বিরুদ্ধে জনতাকে উস্কাইয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।"-(জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫'-অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-৪৭

"Mujib decided to dissociate from DAC. It was done in the afternoon of March 13 when Mujib read out a written statement in the midst of a few hundred local and infernational media reporters .... The decision to disassociate from the DAC scored two points for Mujib. One, he mainatained his leadership in East Pakistan by nullifying the criticism of the radical forces that he went to the Round Table Conference to compromise the cause of the peple two, he now secured a position to bargain and negotiate with the leaders of the government on his won strength." Bangladesh : Constitutional quest for Autonomy, Moudud Ahmed, Page-159-160

www.bjilibrary.com

সর্বাবস্থায় আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে কথা বলেছে। অসহযোগ আন্দোলনের গোটা সময়ে জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন বক্তব্য থেকে তাদের যে নীতি পরিষ্কার হয়ে যায় তাহলো ঃ (ক) তারা পাকিস্তানের অস্তিত্ব ও সংহতির পক্ষে, (খ) জনগণের রায় আওয়ামী লীগের পক্ষে গেছে, সুতরাং সরকার গঠন করা তার অধিকার। বিনা শর্তে তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়া উচিত।

জামায়াতে ইসলামীর এ নীতি তার আদর্শ ও দলের নীতিমালার সাথে সংগতিশীল। আওয়ামী লীগের ভারত নীতি, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক আদর্শ এবং একনায়কসুলভ তার স্বার্থপরতা সম্পর্কে প্রবল বিরোধী মনোভাব পোষণ করা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক বিধির কারণেই জামায়াত আওয়ামী লীগের হাতে বিনা শর্তে ক্ষমতা হস্তান্তর সমর্থন করেছে। কিন্তু ২৫ মার্চের (১৯৭১) পর আওয়ামী লীগ যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করলো, জামায়াতে ইসলামী তাকে সমর্থন করলো না।

নেজামে ইসলাম পার্টি ও অন্যান্য

মাওলানা সিদ্দীক আহমদের নেতৃত্বাধীন নেজামে ইসলাম পার্টি পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে এসেছে। বলা যায় এটি একটা পুরানো দল। ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট ১৯৬২ সালে গঠিত হয় সোহরাওয়ার্দী, নূরুল আমীন, আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খান প্রমুখের দ্বারা। পরে এখান থেকেই জন্ম হয় নূরুল আমীনের নেতৃত্বে পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টি (পিডিপি)। কৃষক-শ্রমিক পার্টিও পুরানো। এর প্রতিষ্ঠাতা প্রকৃতপক্ষে শেরে বাংলা। পরবর্তীকালে এর নেতৃত্বে আসেন এ. এস. এম সোলায়মান। জমিয়ত ওলামায়ে ইসলাম আলেমদের একটি সংগঠন। বৃটিশ আমল থেকেই আছে এবং পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে এ সবগুলো দলেরই নেতিবাচক ভূমিকা ছিলো। এছাড়া আরও অনেক ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং গ্রুপও স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তাদের নেতিবাচক ভূমিকা রাখে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন পীর মোহসিন উদ্দিন দুদু মিয়া, মেজর আফসার উদ্দিন এবং শর্ষিণার পীর আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ এবং তাঁর গ্রুপ। এছাড়া রয়েছেন মাওলানা আতাহার আলী, মোস্তফা আল-মাদানী, মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী সহ দেশের সকল স্বনামখ্যাত আলেম। এ সমস্ত দল, গ্রুপ, ব্যক্তি সকলের মধ্যেই পাকিস্তানপ্রীতি এবং আওয়ামী লীগ ভীতি প্রবল ছিলো। আওয়ামী লীগ গঠনের পর থেকেই

www.bjilibrary.com

আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের এ মনোভাবের শুরু এবং তা ক্রমশ বেড়েছেই। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে আওয়ামী লীগের ভূমিকা এবং আগরতলা ষড়যন্ত্রের বিষয়বস্তু এবং ১৯৬৯ সালে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে আওয়ামী লীগের চরম স্বার্থপর আচরণ তার প্রতি সকলকে আরও সন্দেহপ্রবণ ও ভীত করে তোলে। উল্লেখ্য, আলেম ওলামা, পীর-মাশায়েখ এবং ইসলামী দল ও গ্রুপগুলো মুসলিম স্বার্থ এবং পাকিস্তানকে এক করে দেখত। আওয়ামী লীগকে তারা দেখত তাদের এ চিন্তার প্রতিকূল শক্তি হিসেবে।[৭৯] অসহযোগ আন্দোলনকালে তাঁদের এ মনোভাব আরও তীব্র হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের অধিকাংশ বিনা শর্তে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরকেও সমর্থন করেনি।

রাজনৈতিক দলগুলোর উপর এই আলোচনার পর আরেকটি বেদনাদায়ক দিকের এখানে উল্লেখ প্রয়োজন। রাজনৈতিক অঙ্গনের মতো বুদ্ধিজীবি অঙ্গনেও স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রশ্নে অত্যন্ত দুঃখজনক বিভক্তি দেখা দেয়। দেশের স্বনামধন্য সম্মানিত বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্বগণ জাতীয় জীবনের এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আবু সাঈদ চৌধুরী, সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ মাজহারুল ইসলাম, ডঃ এ আর মল্লিক, রণেশ দাস গুপ্ত, ডঃ এবনে গোলাম সামাদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, শওকত ওসমান, আসাদ চৌধুরী, সরোয়ার মুর্শেদ প্রমুখের মতো সম্মানিত বুদ্ধিজীবিগণ দেশ ত্যাগ করেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেন। অন্যদিকে প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ, ডঃ কাজী দীন মোহাম্মাদ, ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, কবীর চৌধুরী, কবি

---

৭৯. উনিশ শ একাত্তর সালের ৩ জুন মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর, মাওলানা মুফতী দীন মোহাম্মদ খান, সেক্রেটারী জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া ঢাকা, মাওলানা সিদ্দীক আহমদ, প্রেসিডেন্ট জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান, মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস, প্রিন্সিপাল, কাসেমুল উলুম, পটিয়া, চট্টগ্রাম, মাওলানা মোস্তফা আল-মাদানী, ভাইস প্রেসিডেন্ট, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম, মাওলানা আজিজুর রহমান, সেক্রেটারী, হিজবুল্লাহ, শর্ষিণা, আলহাজ্জ আবদুল ওহাব, কোষাধ্যক্ষ জামিয়া কুরআনিয়া, ঢাকা, মাওলানা আশরাফ আলী, সেক্রেটারী জেনারেল জামিয়াতে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম, মাওলানা আজীজুল হক, মোহদ্দেস, লালবাগ জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া, মাওলানা নূর আহমদ, সেক্রেটারী দাওয়াতুল হক প্রমুখ নিম্নলিখিত বিবৃতি দান করেন ঃ

"লক্ষ্য প্রাণ, অমানুষিক কষ্ট ও বিরাট আত্মত্যাগের বিনিময়ে এবং মুসলমানদের অক্লান্ত ও অতুলনীয় প্রচেষ্টার ফলে পাকিস্তান একটা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে মাথা উঁচু করতে পেরেছে। কিন্তু মুসলিম বিরোধী শক্তিগুলো তাদের ষড়যন্ত্র ত্যাগ করেনি। .... গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ছদ্মাবরণে পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিচ্ছিন্নতাবাদী অভ্যুত্থান ছিলো পাকিস্তানকে ধ্বংস করার অপর একটি ভারতীয় চক্রান্ত। .... যাতে ভারতীয় হামলা মোকাবিলা করা যায়, সে জন্যে সরকারের উচিত তার অনুগত নাগরিকদের মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তোলা।"–দৈনিক পাকিস্তান, ৪ জুন, ১৯৭১)

www.bjilibrary.com

শামসুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, ডঃ হাসান জামান, ডঃ মোহর আলী, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ বুদ্ধিজীবিগণ দেশ ত্যাগ করেননি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধেও অংশ নেননি। বরং তাঁদের অনেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ সংগঠিত করার গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এমন বিবৃতি দেন এবং এমন ভূমিকা পালন করেন যা ছিলো স্বাধীনতা যুদ্ধের অত্যন্ত নগ্ন বিরোধিতা। ১৯৭১ সালের ১৭ মে এক বিবৃতিতে এ বুদ্ধিজীবিগণ বলেন ঃ

"নিউইয়র্কের ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব ইউনিভার্সিটি ইমারজেন্সি বলে পরিচিত একটি সংস্থা তাদের ভাষায় 'ঢাকায় বিপজ্জনক ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে' উদ্বেগ প্রকাশ করে যে বিবৃতি দিয়েছেন আমরা তা পাঠ করে হতবাক হয়ে গিয়েছি। আমরা পূর্ব পাকিস্তানের অধ্যাপক, কলেজ শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক ও শিল্পীবৃন্দ আমাদের নিরাপত্তা, কল্যাণ ও ভবিষ্যতের জন্যে আইসিইউ-র উদ্বেগ প্রকাশকে গভীরভাবে অনুধাবন করছি। যাই হোক, ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই না করে, যা কিনা পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রথম গুণ বলে বিবেচিত, এরূপ সম্মানিত, বিদ্বান ও সুধী ব্যক্তিরা এমন একটা বিবৃতি প্রকাশ করায় আমরা মর্মাহত হয়েছি। সত্যানুসন্ধানই যাদের জীবনের লক্ষ্য তেমন একটি পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরাই অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আমাদের মহান সঙ্গীরা পণ্ডিত ও জ্ঞানান্বেষীর এ মৌল নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির অভিযোগকে সম্বল করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এবং অভিমত প্রকাশ করেছেন। আমাদের অনেকেই গুলীবিদ্ধ ও নিহতের তালিকায় তাদের নাম দেখতে পেয়ে হতবাক হয়েছেন। নেহাত নাচার হয়েই আমাদের জানাতে হচ্ছে আমরা মৃত নই। .... আমাদের পেশাগত কাজের স্বাভাবিক রীতি অনুসারেই আমরা ঢাকা টেলিভিশনের পর্দায় আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ নিয়েছি। আমাদের মৃত্যুর খবর যে অতিরঞ্জিত এটা জানিয়ে দিয়ে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং ছাত্রদের আশ্বস্ত করেছি।

ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে গোলযোগ চলাকালে আমাদের অধিকাংশই মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নিজ নিজ গ্রামে চলে গিয়েছিলাম, এ কারণেই হয়তো ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে থাকবে। সময় নির্দিষ্ট করে বলার কারণ আছে। কেননা এ সময়টাতেই দেশের প্রতিষ্ঠিত বৈধ সরকারকে অমান্য করার কাজ পুরাদমে চলছিলো। নির্বাচনে জনগণের কাছ থেকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ম্যাণ্ডেট পেয়ে চরমপন্থীরা স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার দাবীতে সম্প্রসারিত ও রূপায়িত করার জন্য

www.bjilibrary.com

উঠেপড়ে লেগে গিয়েছিলো, যারাই জনতার অর্পিত আস্থার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে, তাদের উপর দুর্দিন নেমে এসেছিলো।

এ সময়েই ব্যাপকভাবে শিক্ষার অঙ্গনকে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির কাজে অপব্যবহার করা হতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে ছাত্ররা লেখাপড়া বা খেলাধুলায় ব্যস্ত ছিলো না। তা ছিলো বাংলাদেশ মুক্তি ফৌজের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, তা ছিলো মেশিনগান, মর্টার ইত্যাকার সমরাস্ত্রের গোপন ঘাঁটি। ফ্যাসিবাদি সন্ত্রাসবাদ ও রাজনৈতিক দলের অসহিষ্ণুতার এ শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ এড়ানোর জন্য আমাদের অধিকাংশই আমাদের গ্রামগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পাকিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড করার সশস্ত্র প্রয়াস নস্যাৎ এবং প্রদেশে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আগে কেউ শহরে ফিরে আসতে পারেনি।

অবশ্য আমাদের কিছু সহকর্মী বাড়ীতে না ফিরে সীমান্ত পার হয়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। ভারতীয় দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার ২৫ এপ্রিলের খবরে দেখা যাচ্ছে যে, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পনেরজনকে তাদের স্টাফ হিসেবে নেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আরো শিক্ষকদের তাদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ভারত সরকারের কাছে বিপুল অংকের বরাদ্দ দাবী করেছে।

পাকিস্তানী শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আমাদের নিজস্ব অভাব-অভিযোগ রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের যেটা প্রাপ্য সেটা না পেয়ে আমরা অসুখী। আমাদের এ অসন্তোষ আমরা প্রকাশ করেছি একই রাষ্ট্র কাঠামোর আওতায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যাপক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ভোট দিয়ে।

কিন্তু আওয়ামী লীগ চরমপন্থীরা এ সহজ সরল আইন সঙ্গত দাবীকে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার দাবীতে রূপান্তরিত করায় আমরা মর্মাহত হয়েছি। আমরা কখনও এটা চাইনি, ফলে যা ঘটেছে তাতে আমরা হতাশ ও দুঃখিত হয়েছি। বাঙালী হিন্দু বিশেষ করে কোলকাতার মারোয়াড়ীদের আধিপত্য ও শোষণ এড়ানোর জন্যেই আমরা বাংলার মুসলমানেরা প্রথমে ১৯০৫ সালে বৃটিশ রাজত্বকালে আমাদের পৃথক পূর্ববাংলা প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত নেই এবং আবার ১৯৪৭ সালে ভোটের মাধ্যমেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশের মুসলিম ভাইদের সাথে যুক্ত হওয়ার সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। উক্ত সিদ্ধান্তে অনুতপ্ত হওয়ার আমাদের কোনো কারণ নেই।

www.bjilibrary.com

পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু প্রদেশ হিসেবে সারা পাকিস্তানকে শাসন করার অধিকার আমাদের আছে। আর সেটা আমাদের আয়ত্তের মধ্যেই এসে গিয়েছিলো। ঠিক তখনই চরমপন্থীদের দুরাশায় পেয়ে বসলো এবং তারা জাতীয় অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুললো। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন দিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া আলোচনাকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগকে সংখ্যাগুরু দল হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু উল্টোটাই ঘটে গেলো এবং নেমে এলো জাতীয় দুর্যোগ।

কিন্তু আমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী হওয়ার সঙ্গত কারণ রয়েছে। আমরা পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত এবং বর্তমান সরকার অবস্থা অনুকূলে হওয়ার সাথে সাথে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করার ইচ্ছা আবার ঘোষণা করেছেন। এমতাবস্থায় বিশ্বের অন্যান্য স্থানের আমাদের বন্ধু একাডেমিশিয়ানরা আমাদের কল্যাণের জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করায় আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো বড় ধরনের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা ও নিন্দা করছি।"[৮০]

এ বিবৃতিতে স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে রয়েছেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, লেখক নাট্যকার শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান এম. কবীর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধান এবং এফ. এইচ. মুসলিম হলের প্রভোস্ট ডঃ মীর ফখরুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রিডার ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সিনিয়র লেকচারার, নাট্যকার নূরুল মোমেন, কবি আহসান হাবিব, অভিনেতা, চিত্র পরিচালক ও সঙ্গীত পরিচালক খান আতাউর রহমান, গায়িকা শাহনাজ বেগম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র লেকচারার, নাট্যকার আশকার ইবনে শাইখ, গায়িকা ফরিদা ইয়াসমিন, পল্লী গীতির স্বনাম ধন্য গায়ক আবদুল আলিম, লেখক প্রযোজক চিত্র পরিচালক আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম, লেখক প্রযোজক পরিচালক ও এ এইচ চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রিডার ডঃ মোহর আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান মুনীর চৌধুরী, বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, গায়ক খোন্দকার ফারুক আহমদ, গায়ক এম এ হাদি, গায়িকা নীনা হামিদ, গায়িকা লায়লা আর্জুমান্দ বানু, শামসুল হুদা চৌধুরী (জিয়া ক্যাবিনেটের মন্ত্রী এবং এরশাদ সরকারের

---

৮০. দৈনিক পাকিস্তান (আজকের দৈনিক বাংলা), ১৭ মে, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

পার্লামেন্ট স্পীকার), শিল্পী বেদার উদ্দিন আহমদ, গায়িকা সাবিনা ইয়াসমীন, গায়িকা ফেরদৌসী রহমান, গায়ক মোস্তফা জামান আব্বাসী, ছোট গল্পকার সরদার জয়েন উদ্দীন, লেখক ও সমালোচক সৈয়দ মুর্তজা আলী, কবি তালিম হোসেন, ছোট গল্পকার শাহেদ আলী, মাহেন ও সম্পাদক কবি আবদুস সাত্তার, নাট্যকার ফররুখ শীয়র, কবি ফররুখ আহমদ, পাকিস্তান আবজারভার (আজকের বাংলাদেশ অবজারভার) সম্পাদক আবদুস সালাম, মর্নিং নিউজ সম্পাদক এস. জি. এম. বদরুদ্দীন, দৈনিক পাকিস্তান (আজকের দৈনিক বাংলা) সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অভিনেতা, চিত্র পরিচালক ফতেহ লোহানী, কবি হেমায়েত হোসেন, লেখক আকবর উদ্দীন, লেখক আকবর হোসেন, শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ এ কিউ এম আদম উদ্দিন, নাট্য শিল্পী আলী মনসুর, লেখক কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ, লেখক সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী, কবি ও লেখক শামসুল হক, লেখক সরদার ফজলুল করিম, গায়িকা ফওজিয়া খান প্রমুখ ৫৫জন নেতৃস্থানীয় কবি, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী।[৮১]

দেশের শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীদের আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিবৃতি প্রকাশিত হয় জুনের ২৭ তারিখে। এ বিবৃতিতে বিবৃতিদাতারা বলেন ঃ "আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনায় গভীর বেদনা বোধ করছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতীয় যুদ্ধবাজ যারা মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টিকে কখনো গ্রহণ করেনি প্রধানত তাদের চক্রান্তের ফলেই এটা হয়েছে। আমরা আমাদের প্রিয় স্বদেশ ভূমির সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে আমাদের সেনাবাহিনীর সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশংসা করছি। আমরা দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা বিপন্ন করার জন্য চরমপন্থীদের অপপ্রয়াসের নিন্দা করছি। বহির্বিশ্বের চোখে পাকিস্তানের মর্যাদা হ্রাস ও পাকিস্তানকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার অপচেষ্টা এবং সীমান্তে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে ভারতীয় হস্তক্ষেপের আমরা নিন্দা করছি। ভারতীয় বেতারে প্রচারিত একটি খবরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। উক্ত খবরে অভিযোগ করা হয়েছে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ধ্বংস করে দিয়েছে। আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছি, এটা একটা নির্লজ্জ মিথ্যা প্রচারণা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনের সকল ভবন অক্ষত অবস্থায় রয়েছে এবং কোনো ভবনের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন করা

৮১. দৈনিক পাকিস্তান (আজকের দৈনিক বাংলা), ১৭ মে, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

হয়নি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বর্তমান মুহূর্তে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন আমাদের সকলের মধ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে আমরা বর্তমান সংকট হতে মুক্ত হতে পারবো।"[৮২]

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর এবং আইন ফ্যাকাল্টির ডীন ইউ. এন. সিদ্দিকী, ইতিহাস বিভাগের প্রধান ও সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ আবদুল করিম, সমাজ বিজ্ঞানের ডিন ডঃ এম বদরুদ্দোজা, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের লেকচারার মোহাম্মদ ইনামুল হক, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রধান ডঃ রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের রিডার মোঃ আনিসুজ্জামান, ইংরেজী বিভাগের সিনিয়র লেকচারার খোন্দকার রেজাউর রহমান, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের লেকচারার সৈয়দ কামাল মোস্তফা, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের লেকচারার এম এ জিন্নাহ, ইতিহাসের সিনিয়র লেকচারার রফিউদ্দীন, রসায়ন বিভাগের প্রধান এ কে এম আহমদ, সমাজ বিজ্ঞানের সিনিয়র লেকচারার রুহুল আমীন, বাণিজ্য বিভাগের প্রধান মোঃ আলী ইমদাদ খান, ইতিহাসের সিনিয়র লেকচারার হোসেন মোঃ ফজলে দাইয়ান, বাংলা বিভাগের সিনিয়র লেকচারার মোঃ দিলওয়ার হোসেন, সংখ্যা তত্ত্বের সিনিয়র লেকচারার আবদুর রশিদ, ইতিহাস বিভাগের রিডার মুকাদ্দাসুর রহমান, ইতিহাসের লেকচারার আহসানুল কবীর, অর্থনীতি বিভাগের লেকচারার শাহ মোঃ হুজ্জাতুল ইসলাম, ইংরেজী বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ আলী, পদার্থ বিদ্যা বিভাগের রিডার এজাজ আহমদ, গণিতের লেকচারার এস এম হোসেন, গণিত বিভাগের রিডার জেড, এইচ. চৌধুরী, সংখ্যা তত্ত্বের লেকচারার জনাব হাতিম আলী হাওলাদার, বাংলা বিভাগের রিডার ডঃ মোঃ আবদুল আওয়াল, বাংলার সিনিয়র লেকচারার মোঃ মনিরুজ্জামান বাংলা বিভাগের সিনিয়র লেকচারার মোঃ মনিরুজ্জামান হায়াত (লেখক হায়াত মাহমুদ), ইতিহাসের গবেষণা সহকারী আবদুস সায়ীদ, অর্থনীতির লেকচারার মোহাম্মাদ মোস্তফা, ইতিহাসের লেকচারার সুলতানা নিজাম, ইতিহাসের রিডার ডঃ জাকিউদ্দীন আহমদ এবং ফাইন আর্টসের লেকচারার আবদুর রশীদ হায়দার।[৮৩]

জাতির দিক দিশারী বলে পরিচিত রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দল-সমূহের পরিচয় ও অবস্থান এবং জাতির বিবেক বলে কথিত বুদ্ধিজীবীদের

৮২. দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ জুন, ১৯৭১
৮৩. দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ জুন, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হলো। স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষ প্রশ্নে তাদের সুস্পষ্ট দ্বিধা বিভক্তির প্রাথমিক রূপও আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। এ মতবিরোধ পরবর্তীতে ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করে এবং পরস্পর জীবন দেয়া-নেয়ার সর্বনাশা খেলায় তারা মেতে ওঠে। স্ব স্ব নীতি নিয়ম, ইত্যাদি প্রশ্নে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, দলে দলে মতবিরোধ, মতভেদ এবং সংঘাত সংঘর্ষ অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাধীনতার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তর্কাতীত জাতীয় প্রশ্নে এক ঐতিহ্যবাহী জাতির এমন বিভক্ত মত, যা দেশের জনগণকেও বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করেছিলো, মোটেই স্বাভাবিক ছিলো না। স্বাধীনতার পর আজ এ মৌল প্রশ্নে আবার জাতি এক ও অখণ্ড। কিন্তু সে সময়ের ঐ বিভক্তি, পরস্পরের ঐ বৈরিতা ইতিহাসের এক যন্ত্রণাদায়ক বিষয় হিসেবে জাতিকে পীড়া দিয়েই চলবে। জাতির জন্যে এ পীড়াদায়ক পরিস্থিতি সেদিন সৃষ্টি হলো কেন ? কে কিংবা কারা ছিলো এ বিভক্তির জন্যে দায়ী ? অথবা কি সেই ঘটনাবলী যা সৃষ্টি করেছিলো এ জাতীয় দুর্ঘটনার ? উভয় পক্ষের সেদিনের কাজ ও মানবিকতার মধ্যেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে নিসন্দেহে।

দুই

প্রথমে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিচালনা পক্ষের কথাই ধরা যাক। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছে আওয়ামী লীগ। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের গোটা সময়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব বিরাজ করেছে। তারপর স্বাধীনতা যুদ্ধকালেও তারই একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কিন্তু যা জাতীয় মত বিভক্তি রোধ করতে পারতো, পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সে ধরনের সুস্পষ্টতা আওয়ামী লীগের ছিলো না এবং দল মত নির্বিশেষে সবাইকে কাছে টানার ও জাতীয় সমঝোতা সৃষ্টির সে ধরনের উদ্যোগ আওয়ামী লীগের তরফ থেকে নেয়া হয়নি। আওয়ামী লীগের এ ব্যর্থতাকে নিম্নলিখিতভাবে তুলে ধরা যায় ঃ

(ক) ১৯৭১-এর ১লা মার্চের পর আন্দোলন নতুন মোড় নিলো। এর আগে আওয়ামী লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসেবে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলো। কিন্তু ১লা মার্চে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি করলে আওয়ামী লীগ তার হাতে

www.bjilibrary.com

ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠলো। প্রবল চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে এর মুকাবিলার জন্যে আওয়ামী লীগ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলো। এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক ছাত্র আন্দোলন স্বাধীনতার শ্লোগান তুললো। অসহযোগ আন্দোলন ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠলো। প্রেসিডেন্ট হাউজ এবং ক্যান্টনমেন্টগুলো ছাড়া গোটা দেশ আওয়ামী লীগের হাতে এলো। এভাবেই এলো পঁচিশে মার্চ। গোটা অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে আন্দোলনের নেতা আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে অনেকেই দেখা করে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে তাঁর আন্দোলনের প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করেছেন, কিন্তু শেখ মুজিব সব দলকে ডেকে কোনো আলোচনা করেননি এবং তাদের আস্থায় নেননি এবং তাদের আন্দোলনে শামিল করেননি।[৮৪ক] বরং দেখা গেছে শেখ মুজিব সবদিক থেকে বেতোয়াক্কা হয়ে ক্ষমতার যে পিরামিড, তার শীর্ষে উঠে গেছেন। ছাত্র ফ্রন্টের আন্দোলনে প্রথমে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' কাজ করেছে। কিন্তু আন্দোলনের এক পর্যায়ে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বাতিল করে দিয়ে শুধুমাত্র ছাত্র লীগ কর্মীদের নিয়ে গঠিত 'স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের মাধ্যমে ছাত্র লীগ আন্দোলনকে এককভাবে হস্তগত করলো।[৮৪খ] ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের ফল একা কুক্ষিগত করে সবকে বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ যেমন একাই এগিয়ে গিয়েছিলো, ঠিক তেমনিভাবে অসহযোগ আন্দোলনের ফল ভোগে সে কাউকেই শরিক করতে চাইলো না। যেন সে নিশ্চিত ছিলো ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছে এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাচ্ছে। এ না হয়ে স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা যুদ্ধের চিন্তা যদি তাদের মাথায় থাকতো, তাহলে আসন্ন স্বাধীনতা সংগ্রাম বা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্যে আওয়ামী লীগের এ মানসিকতা ছিলো অযৌক্তিক, অনুপযুক্ত এবং ক্ষতিকর। কারণ স্বাধীনতা যুদ্ধ হয় সকলের। সে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের উচিত ছিলো সব দলকে কাছে ডাকা এবং তাদের আস্থায় নেয়া ও তাদের আস্থা অর্জন করা যাতে করে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কোনো ভুল বুঝাবুঝি থাকলে তা দূর হয় এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদেরও পাওয়া যায়। কিন্তু আওয়ামী লীগ এটা

৮৪ক. ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি হবার পর হোটেল পূর্বাণীতে তাড়াহুড়া করে আহুত সাংবাদিক সম্মেলনে "এক প্রশ্নের জবাবে শেখ সাহেব বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তিনি মাওলানা ভাসানী, জনাব নূরুল আমীন, জনাব আতাউর রহমান সহ প্রদেশের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।"-(দৈনিক সংগ্রাম, ২রা মার্চ, ১৯৭১) কিন্তু জনাব শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর এ মহৎ সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত করেছেন তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

৮৪খ. 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫', অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-৪৭৩-৪৭৪, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭০৮

www.bjilibrary.com

করেনি। আন্দোলনের নেতা হিসেবে আওয়ামী লীগের এটা একটা বড় ব্যর্থতা। যার ফলে জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি, মুসলিম লীগ, প্রভৃতি ইসলামপন্থী ও ইসলাম মনা দলগুলোর সাথে আওয়ামী লীগের আলোচনা ও আরও জানাজানির মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝি ও দূরত্ব দূর করার কোনো পথ হয়নি। এভাবে আওয়ামী লীগ বলয়ের বাইরের ঐ দলগুলো সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকা অবস্থায় এবং শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে হঠাৎ করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলো তাকে এ দলগুলো আওয়ামী লীগের সাথে ভারতের যোগসাজশপূর্ণ ষড়যন্ত্র বলে মনে করলো। সে সময়ের তাদের বক্তৃতা, বিবৃতি, শ্লোগানের মুখ্য কথাই ছিলো এটা। শান্তি কমিটির মিছিলগুলোর প্রধান শ্লোগান ছিলো ঃ "পাকিস্তানের উৎস কি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, হাতে লও মেশিনগান-দখল করো হিন্দুস্তান, বীর মুজাহিদ অস্ত্র ধরো-আসাম বাংলা দখল করো, ভারতের দালালদের-খতম করো খতম করো, ভারতের দালালী-চলবে না চলবে না, ইত্যাদি।"[৮৪গ] আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজ্ঞ, পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অবজারভার গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স-এর মালিক জনাব হামিদুল হক চৌধুরী বলেন, "ভারতীয় প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা এবং তার দ্বারা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে এ দেশের অস্তিত্ব বিলোপ করে নিজস্ব সম্প্রসারণবাদী মনোভাব চরিতার্থ করা। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে এবং বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার জন্যে তারা তাদের সকল প্রচার মাধ্যমের দ্বারা বিশ্ববাসীর নিকট হাজার হাজার নর হত্যা ও বোমা বর্ষণের ফলে শহর ধ্বংসের ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রচার করছে।"[৮৫] পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি মাওলানা আবদুল মান্নান ২৭ এপ্রিল (১৯৭১) এক বিবৃতিতে বলেন, "সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমূলে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণ আজ 'জেহাদের জোশে' আগাইয়া আসিয়াছে।"[৮৬] শাহ আজিজুর রহমান বলেন, "প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রবল উৎকণ্ঠার সাথে রাজনৈতিক দলসমূহকে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান পূর্বক দেশে পূর্ণ ও বাধাবিহীন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ এ সুযোগের ভুল অর্থ করে বলপ্রয়োগের .... মাধ্যমে নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসাবে জয়লাভ করে নিজেদের খেয়াল খুশীতে দেশ

৮৪গ. 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়', পৃষ্ঠা-৪৬

৮৫. 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়', পৃষ্ঠা-৪৮ (বিবৃতিটি ৬ এপ্রিলে দেয়া)

৮৬. 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়', পৃষ্ঠা-৮৮

www.bjilibrary.com

শাসন করার দাবী করে এবং এভাবেই অহমিকা, অধৈর্য এবং ঔদ্ধত্যের ফলে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়। আমি সাম্রাজ্যবাদী ভারতের দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।"[৮৭] পূর্ব পাক জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ৮ এপ্রিল (১৯৭১) এক বিবৃতিতে বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানীরা পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ভারতকে ছিনিমিনি খেলতে দেবে না। ....ভারতীয় পার্লামেন্ট সম্প্রতি সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাসের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং প্রস্তাবটির ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। .... পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি ভারতের তথাকথিত সহানুভূতির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের দূরভিসন্ধির গন্ধ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের শত্রুর কাছ থেকে সহানুভূতি কামনা করে না। জনগণ তাদের অধিকার চায় এবং কিভাবে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে সেটা হলো সম্পূর্ণরূপে তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। অসৎ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণের ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দুরভিসন্ধি বর্তমানে ফাঁস হয়ে গেছে। .... পূর্ব পাকিস্তানীরা কখনো হিন্দু ভারতের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। ভারতীয়রা কি মনে করেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের এতদূর অধঃপতন হয়েছে, তারা ভারতকে তাঁদের বন্ধু ভাববে?"[৮৮] পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা জনাব নূরুল আমীন বলেন, "পাকিস্তান সৃষ্টির জন্যে আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি এবং সে সংগ্রামে জয়ী হয়েছি। .... আজও পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আমাদের বিরুদ্ধ-শক্তির মুকাবিলা করতে হবে।"[৮৮ক] জনাব মৌলবী ফরিদ আহমদ এক বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তানকে খণ্ডিত করা এবং মুসলমানদের হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ফ্যাসিবাদীদের ক্রীতদাসে পরিণত করার ভারতীয় চক্রান্ত বর্তমানে নিরপেক্ষ বিশ্ববাসীর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। .... দেশদ্রোহী ও পাকিস্তানীদের মধ্য থেকে হিন্দু ভারতের সংগৃহীত ক্রীড়নকদের রক্ষা করার জন্যে হিন্দুস্তান পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক

---

৮৭. 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়', পৃষ্ঠা-৯১ (৪ঠা মে, ১৯৭১ তারিখের বিবৃতি)

৮৮. দৈনিক সংগ্রাম, ৮ এপ্রিল, ১৯৭১

৮৮ক. দৈনিক সংগ্রাম, ১৬ আগস্ট, ১৯৭১ (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭১৮-৭১৯

www.bjilibrary.com

অত্যাচারের মনগড়া ও ভিত্তিহীন কাহিনী প্রচার করছে। হিন্দু ভারতের সাথে যে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরা ষড়যন্ত্র করছে, তারাই আগ্রহভরে এ মিথ্যা সংবাদ গোপন সূত্র থেকে প্রাপ্ত বলে প্রচার করছে। .... একমাত্র ইসলামের নামেই এ দেশের সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস ভারতীয় এজেন্টরা তথাকথিত সাংস্কৃতিক বাঙালী জাতীয়তাবাদের নামে এমন জঘন্য কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয়েছে যা করতে হিটলারের ঘাকতদের বর্বরতাও লজ্জা পাবে।"[৮৮খ] কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "জাতি আজ তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সবচেয়ে 'মারাত্মক সংকটের' মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। .... পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজের ভুলের জন্যে তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। .... পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৯৬জন লোক পাকিস্তানের জন্যে ভোট দিয়েছিলো। কিন্তু গত ২৩ বছর ধরে তরুণদের অপরিপক্ক মনে যে কারণেই হোক বঞ্চনার ধারণা বদ্ধ মূল হয়েছে এবং এ বঞ্চনা ও অবহেলা মুকাবিলার জন্য সংগ্রামের মাত্রা তাদের জানা ছিলো না। ভারতীয় এজেন্টদের দ্বারা পরিচালিত তথাকথিত বাংলাদেশ বেতার থেকে দিন রাত তাঁর ও অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতার মৃত্যুদণ্ডের কথা তার স্বরে ঘোষণা করা হচ্ছে। পাকিস্তানের জন্যে সংগ্রাম করে যাব। কারণ যদি পাকিস্তানই না থাকে, তাহলে অধিকারের জন্যে সংগ্রামের অবকাশ কোথায়।"[৮৮গ] অনুরূপভাবে খান এ সবুর সহ মুসলিম লীগ নেতাগণ এবং নেজামে ইসলাম পার্টিসহ ইসলাম মনা বিভিন্ন দল ও গ্রুপের নেতাগণ ভারতীয় ষড়যন্ত্র ও আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের বিরোধিতা করে ১৬ ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত বক্তৃতা, বিবৃতি ও তৎপরতা অব্যাহত রাখেন।[৮৮ঘ]

৮৮খ. দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১ (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৬৭১-৬৭২

৮৮গ. দৈনিক পাকিস্তান, ১৮ জুলাই, '৭১ (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, পৃষ্ঠা–৬৮২-৬৮৩)

৮৮ঘ. বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের মানসিকতা সম্পর্কে তাদের এসব অভিযোগ যে অমুলক ছিলো না, স্বাধীনতা উত্তরকালে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে। The Tide এক সংবাদ নিবন্ধে বলছে ঃ "Almost all the beneficiaries of the 1975 massacres are always very vocal about the india Bangladesh Friendship Treaty signed by the Awami league government, but no one ever talks about the october, 1971, agreement the implement of which would have great by compromised the irdprendence and sovereignty of Bangladesh. According to usually infromed quarter important clauses

১৬—

www.bjilibrary.com

আওয়ামী লীগ সম্পর্কে উপরোক্ত দল ও ব্যক্তিসমূহের পূর্ব অভিজ্ঞতাই তাদের এ ভূমিকার জন্যে প্রধানত দায়ী। নির্বাচন বিজয়ী বৃহত্তর দল হিসেবে তাদের এ বিভেদের দেয়াল উপড়ে ফেলার দায়িত্ব ছিলো আওয়ামী লীগের এবং এর উৎকৃষ্ট সময় ছিলো নির্বাচনোত্তর কাল বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলনের সবচেয়ে অনুকূল সময়টি। কিন্তু আওয়ামী লীগের একক ক্ষমতা দখলের পুরানো মনোভাবই তার ব্যর্থতার জন্যে দায়ী। দুঃখের বিষয়, যে স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিলো সকলের, সেই স্বাধীনতা যুদ্ধকে আওয়ামী লীগ তার দলীয় যুদ্ধে পরিণত করেছিলো। রাশিয়ার চাপ সত্ত্বেও এবং মস্কোপন্থী ন্যাপ ও কম্যুনিস্ট পার্টি তার সহযোগী হওয়ার পরেও তাদেরকেই যেখানে সে সাথে নেয়নি, পিকিংপন্থীদের যেখানে ভারতের মাটিতে তিষ্ঠাতে দেয়া হয়নি, সেখানে সে মুসলিম লীগ ও জামায়াতের মতো ইসলাম পন্থী দল ও ব্যক্তিত্বকে তারা পাশে স্বাগত জানাবে কেমন করে এবং এরাই বা তার উপর আস্থা স্থাপন করবে কি করে? আন্দোলনের নেতা হিসবে আওয়ামী লীগের এ দুর্ভাগ্যজনক আচরণই স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা যুদ্ধ বিষয়ে সেদিন জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির পথ তৈরির কোনো সুযোগ দেয়নি। যার ফলে জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধ মুসলিম লীগ, জামায়াতসহ ইসলামপন্থী দল ও ব্যক্তিত্বের চোখে হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ভারতের যোগ-সাজশে পরিচালিত এবং বাম ষড়যন্ত্রের শিকার আওয়ামী লীগের একটি চরমপন্থী মহলের স্বাধীনতা যুদ্ধ। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের উপরে উল্লিখিত বিবৃতিগুলো একথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

(খ) জনগণের করণীয় সম্পর্কে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের কিছু না বলা বা অস্পষ্টতা রাখা মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে জাতির মত-বিভক্তির সুযোগ করে দিয়েছে। বাংলাদেশের

---

of that agreement, signed of behalf of the Provisional government by its Acting President, included, (1) replaeing the Bangladesh Army with a para military force under Supervision of Indian Army, (2) allowing Senior Indian civil servants to run the adminestation in Bangladesh, (3) Stationing Indian troops indefinitely on the soil of Bangladesh, 4) declaring a three-mille area all along the border as a free trade area .... But everything changed after shaikh Mujib's return .... one must accapt honestly that towards the end of 1971, after India had committed its troops, it did look that if Bangladesh at all emerged victorious she would wind up as an Indian protectorate only the international prestige of shaik mujib stophed that from becoming the reality." (The Tide, January, 28, 1990)

www.bjilibrary.com

মানু অসহযোগ আন্দোলন তাঁর নেতৃত্বেই করেছে। গোটা দেশ ছিলো তাঁর হাতের মুঠোয়। জনগণ তাঁর কথায় উঠেছে বসেছে।[৮৯] এ অবস্থায় ২৫ মার্চ রাতে তিনি গ্রেফতার বরণ করলেন জাতিকে কোনো কথা না বলেই। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন একথা যেমন যুক্তি ও নিরপেক্ষ বিচারে টেকে না, তেমনি শেখ মুজিব কোনো ঘোষণা দেয়ার সুযোগ করে উঠতে পারেননি, একথাও ঠিক নয়। শেখ মুজিবের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব রেহমান সোবহান ২৫ তারিখ সন্ধা ৫টা থেকে ৬ টার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করেন। সে সময় শেখ মুজিব তাঁকে পরিষ্কার ভাষায় বলেন, সেনাবাহিনী সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[৯০] বিষয়টা তিনি সুনির্দিষ্টভাবে জানার পরও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। তিনি শেষ পর্যন্তও আপোসেরই অপেক্ষা করেছেন। তিনি মনে করেছেন, জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রধান আলোচক জেনারেল পীরজাদা অবশেষে টেলিফোনে একটা আপোস করার কথা জানাবেন। শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ডঃ কামাল হোসেন লিখছেন, "I Waited for a telephone call throughout the fateful 25th. This telephone call never came, Indeed, when I finally took leave of Shaikh Mujib at about 10.30 P. M. on 25 March, Shaikh Mujib asked me whether I had received such a telephone call. I confirmed to him that I had not."[৯১] আসলে শেখ মুজিব সেই কালো রাত্রির সন্ধাতেও স্বাধীনতার কথা ভাবেননি। ২৫ তারিখ সন্ধায় শেখ মুজিব সাংবাদিকদের কাছে পরবর্তী কর্মসূচী হিসেবে ২৭ মার্চ হরতালের কথা বলেছিলেন।[৯২] ঢাকা ও চট্টগ্রামে পশ্চিম পাকিস্তানী

---

৮৯. সেই সময় এমন কোনো দল ছিলো না, যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব মেনে নেয়নি।

৯০. রেহমান সোবহানের সাক্ষাতকার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯০ (Bangbandhu told us that the army had decided for go in a crack down)

৯১. ডঃ কামাল হোসেনের সাক্ষাতকার (১৯৭৪), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ১৫শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৮

৯২. "Shaikh Mujibur Rahman today (25, March) gave a call for a general stike throughout 'Bangladesh' on March 27th as a mark of protest against 'heavy firing upon the civilian population in Saidpur, Rangpur and joydevpur. .... He said all this had happend while the president is at Dacca for the declared purpose of resolving politically the grave crisis facing the country ...." Pakistan Times, 26th March, 1971. (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৮৭) ব্যবসায়-বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার আরেকটা নির্দেশও শেখ মুজিব ২৫ মার্চ রাতে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচার করেন। এ সংক্রান্ত প্রকাশিত খবরে বলা হয় ঃ "Sheikh Mujibur Rahman, the Awami Leageue Chief, directed tonigth (25th March) that export of jute and jute goods from Bangladesh should be resumed forth with, ... He also announced tele communication links with foreign countries will function via Manila and London ...." The Dawn, 26th March, 1971 (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৮৬)

www.bjilibrary.com

বাহিনী আঘাত করার জন্যে যখন পজিশন নিচ্ছিলো, এ সময় আওয়ামী লীগের সংবাদবাহক সাংবাদিকদের নিকট শেখ মুজিবের স্বাক্ষরিত এ ইশতিহার বিলি করছিলো ঃ প্রেসিডেন্টের সহিত আমাদের আলোচনা শেষ হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যাপারে আমরা ঐকমত্যে পৌছেছি। আশা করি, প্রেসিডেন্ট এবার তাঁর ঘোষণা করবেন।[৯৩ক] শেখ মুজিবের স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণকেও স্বাধীনতা ঘোষণার চিন্তার সাথে সাংঘর্ষিক মনে করা হয়। বলা হয় সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ তিনি চাননি।[৯৩খ] এ কারণেই "২৫ মার্চ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী যখন বাংলাদেশের মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং গোটা অসহযোগ সংগ্রাম ছত্রখান হয়ে যায়, তখন অপ্রস্তুত জাতিকে প্লাবণে ডুবিয়ে শেখ মুজিব 'মধ্য যুগীয় নাইটের মতো বীরত্ব সহকারে' আত্মসমর্পণ করলেন। এর চেয়ে ব্যতিক্রমী কোনো ভূমিকা রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। যে মানুষটি অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ যুদ্ধের কথা জানেন, কিন্তু গোটা জাতিকে সে জন্যে প্রস্তুত করেননি এবং সেই ভয়াবহ লড়াইয়ের ভবিষ্যত কেবল আপন শ্রেণী স্বার্থের বিপরীতকেই দেখতে পান। তিনি কি করে সেই যুদ্ধে অংশ নেবেন।"[৯৪] শেখ মুজিবের গ্রেফতার বরণ নিয়ে খোদ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। খন্দকার মোশতাক বলেন, "ইন্দিরা গান্ধী আমাদের যখন জিজ্ঞেস করলেন আপনাদের যুদ্ধের স্টাটিজিটা আমাকে বুঝিয়ে বলুন-যুদ্ধ আরম্ভ করে সেনাপতি ধরা দিয়েছেন আর আপনাদেরকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলেছেন, এটা কোন্ ধরনের রণকৌশল !' আমরা একথার কোনো জবাব দিতে পারিনি। ২৫ তারিখ রাতে শেখ সাহেবের পাক সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের সমর্থনে আমরা কোনো যুক্তিই দেখাতে পারিনি। ইন্দিরা গান্ধি যখন বারে বারে বলছিলেন, ভু-ভারতে কে কোথায় শুনেছে যে, যুদ্ধ আরম্ভ করে সেনাপতি শত্রু পক্ষের হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দেয় ? আপনারা প্রথম প্রথম বলেছিলেন তিনি ২৫ মার্চ রাতেই গৃহত্যাগ করেছেন এবং সহসাই আপনাদের সাথে মিলিত হবেন। পরে দেখা গেল, আপনাদের সে

৯৩ক. বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত, মাহবুবুল আলম, পৃষ্ঠা-৪০

৯৩খ. "সশস্ত্র সংগ্রামে তাঁর (শেখ মুজিবের) তেমন বিশ্বাস ছিলো না। তাঁর বাসায় গেরিলাযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা হলে তাঁকে কখনো খুব উৎসাহিত হতে দেখিনি। তাঁর গুরু শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন।"-('ঢাকা আগরতলা মুজিব নগর, এম এ মোহাইমেন, পৃষ্ঠা-৬৭)

৯৪. শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রসংগ, আলী রীয়াজ, পৃষ্ঠা-২৬

www.bjilibrary.com

কথা ঠিক নয়। তিনি স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছেন, এটা যুদ্ধের কোন্ ধরনের কৌশল আমাকে বুঝিয়ে বলুন।"[৯৫] খন্দকার মোশতাক ও তাজউদ্দীন সাহেবরা ইন্দিরা গান্ধীর এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি। স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন সময়ের আওয়ামী লীগ এম. পি জনাব মোহাইমেন তার 'ঢাকা আগরতলা মুজিব নগর' গ্রন্থে ইন্দিরা গান্ধির এ বক্তব্য উদ্ধৃত করে নিজেই এর জবাবটা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "শেখ সাহেবের এভাবে সেদিন রাতে ধরা দেয়াকে আমি কোনো দিন মনের সাথে যুক্তি দিয়ে খাপ খাওয়াতে পারিনি। অন্যেরা যে যাই বলুক আমার নিজের ধারণা, আওয়ামী লীগের নেতারা তাজউদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করে এভাবে দেশ স্বাধীন করবে এটা তিনি ভাবতে পারেননি। তাঁর ধারণা ছিলো, পাকবাহিনী অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অবস্থা আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারবে। বেশ কিছু নেতা ও উপনেতাকে হত্যা করবে। দশ-বিশ হাজার কর্মীকেও হত্যা করে সাময়িকভাবে দেশের আলোন্দলন স্তব্ধ করে দিলেও শেষ পর্যন্ত রাখতে পারবে না। আগরতলা কেসের সময় তাঁকে যেভাবে দেশের মানুষ আন্দোলন করে জেল থেকে বের করে এনেছিলো, সেভাবে দু তিন বছর পরে তুমুল আন্দোলনের ফলে পাকিস্তান সরকার তাঁকে মুক্তি দিয়ে ক্ষমতা তার হাতে অর্পণ করতে বাধ্য হবে।'[৯৬] অর্থাৎ শেখ মুজিব ২৫ মার্চের রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত জেনারেল পীরজাদার টেলিফোনের অপেক্ষা করেছেন শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে এ আশায়। আবার তিনি স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণ করলেন জনগণকে অসহায় রেখে তাও একদিন তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে এ দৃঢ় আশাতেই। সুতরাং তাঁর মাথায় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের কোনো চিন্তা ছিলো না। ছিলো না বলেই তিনি কোনো প্রস্তুতি[৯৭] নেননি। ভারতের সাথে যোগাযোগ করতে গিয়েও করেননি[৯৮] এবং নেতৃবৃন্দকে ঢাকার আশেপাশেই আত্মগোপন করতে

---

৯৫. 'ঢাকা আগরতলা মুজিব নগর, এম এ মোহাইমেন, পৃষ্ঠা-৬৪)

৯৬. ঢাকা আগরতলা মুজিব নগর, এম এ মোহাইমেন, পৃষ্ঠা-৬৫

৯৭. "আওয়ামী লীগের আইন অমান্য অভিযান দর্শনীয় হলেও ওতে সাফল্যের অপরিহার্য উপাদানের অভাব ছিলো। সর্বাধিক চাপ সৃষ্টি, কিন্তু সর্বনিম্ন প্রস্তুতি এমন একটা ভুল ছিলো যার মাশুল অনেক।"-(বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম, পৃষ্ঠা-৪০)

৯৮. 'মূলধারা, '৭১, -মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা-১০

www.bjilibrary.com

করতে বলেছেন,[৯৯] ভারত যাবার নির্দেশ কাউকেই তিনি দেননি। হতে পারে ভারতের প্রতি এটা তাঁর আস্থার অভাব।[১০০] অতএব যে স্বাধীনতার

---

৯৯. তাজউদ্দীন আহমদের একান্ত সাক্ষাতকার, সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ এবং মূলধারা, '৭১, মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা-৮-৯) Bangladesh. Constitutional quest for Autonomy Moudud Ahmed, Page-248

১০০. লক্ষণীয়, স্বাধীনতার পর দেশে ফিরেও শেখ মুজিব ভারতকে আমল দেননি, ভারতের বড় ভাই গিরীকে বরদাশত করতে চাননি। মুজিবনগর সরকার ভারতের সাথে যে গোপন অপমানকর চুক্তি করে, মুজিবই দেশে ফিরে তা অগ্রাহ্য করেন। এজন্যে কেউ কেউ ১৬ ডিসেম্বরের বদলে শেখ মুজিবের দেশে ফেরার দিন ১০ জানুয়ারীকে বিজয় দিবস বলতে চান। সাংবাদিক (বর্তমানে 'মানব জমীন' সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী লিখছেন ঃ

"ভারতীয় সেনাবাহিনী যখন ১৬ ডিসেম্বরকে ইস্টার্ণ কমাণ্ড দিবস হিসেবে পালন করে, তখনই বুঝতে কষ্ট হয় না তারা কি চেয়েছিলো ? আমরা ১৬ ডিসেম্বরকে বিজয় দিবস হিসেবেই পালন করে আসছি। আমরা মনে করি এ দিনই আমরা হানাদারমুক্ত করে স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলাম। বাস্তব অবস্থাও তাই। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় আসলেই কি আমরা পুরোপুরি মুক্ত হয়েছিলাম ? .... ইতিহাস নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখা যায় ভারতের সাথে সাত দফা ভিত্তিক যে চুক্তি হয়েছিলো, তাতে বাংলাদেশকে স্বাধীন ভাবা দুষ্কর হতো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশে ফিরে না এলে কি হতো তারই আলোকপাত করছি এ প্রতিবেদনে। .... বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সবকিছু উড়িয়ে দিলেন। বললেন, এ চুক্তি আমি মানি না। কার্যত অগ্রাহ্য করলেন চুক্তিটি। একে একে সব সিদ্ধান্ত বাতিল করতে লাগলেন। ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের চলে যেতে বললেন। ভারত তাদের অফিসারদের প্রত্যাহার করে নিলো। তিন মাইলের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিলেন। রক্ষী বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত মানলেন। তবে সেনাবাহিনী রাখার পক্ষে মত দিলেন। এ নিয়ে মন্ত্রী পরিষদের এক বৈঠকে তুমুল বিতণ্ডা হয়েছিলো। এক পক্ষ বলেছিলেন অতীত অভিজ্ঞতার কারণে সেনাবাহিনী রাখার দরকার নেই। শেখ সাহেব এ যুক্তি খণ্ডন করে বললেন, তোমরা কি বলতে চাও বুঝি না। একটি স্বাধীন দেশে লেফট-রাইট শুনবো না তা হয় না। সেনাবাহিনী থাকবে। পাকিস্তান থেকে আমি আমাদের অফিসারদের ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছি। তাজউদ্দীন আহমদসহ আরও কয়েকজন বিরক্ত হলেন। দিল্লী নাখোশ হলো। ভারতীয় জেনারেলরা অনেকটা প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার নিয়ে শেখ সাহেব মিসেস গান্ধীকে এক বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলেছিলেন কলকাতার গবর্নর হাউসে। মিসেস গান্ধীর সাথে কথা হচ্ছে নানা বিষয়ে। পাশে ভারতের সমরনায়করা উপস্থিত। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিনটিতে শেখ সাহেব হঠাৎ বললেন, আমি একটি কথা বলতে চাই, ... আপনি কবে আপনার সৈন্য আমার দেশ থেকে ফিরিয়ে নিচ্ছেন। আমাকে অনেক কথা শুনতে হচ্ছে এজন্যে। মিসেস গান্ধী জেনারেল মানেকশ'র দিকে এক পলক তাকিয়ে বললেন, আপনি যেদিন বলেন সেদিনই। .... ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট জৈল সিং সম্প্রতি বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা ঠিক হয়নি। মিসেস গান্ধী শেখ সাহেবের অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তার কারণে চটজলদি সম্মতি দিয়েছিলেন। .... পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও শেখ সাহেব ভারতের চাপিয়ে দেয়া নীতি মেনে নেননি। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার লাহোর শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। ভারত চায়নি শেখ সাহেব লাহোর যান। মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে ভিন্নমতও ছিলো। শেখ বলেছিলেন, আমি লাহোর যাব এবং ও আই সি'র সদস্য পদ লাভ করবো। কে কি বললো তাতে কিছু যায়-আসে না। (দিল্লীর) সাউথ ব্লকের একজন

www.bjilibrary.com

চিন্তা শেখ মুজিব করেননি, সে স্বাধীনতার ডাক তিনি দেবেন কেমন করে? তাই স্বাধীনতার ডাক শেখ মুজিব তরফ থেকে আসেনি। তাঁর তরফ থেকে ডাক না আসা জাতিকে বিভ্রান্ত করেছে, বিভক্ত করেছে। পাকিস্তান সরকার এর সুযোগ গ্রহণ করেছে এবং ভারত সরকার দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকেছে। শেখ মুজিব পাকিস্তান সরকারের হাতে থাকায় সম্ভবত শেখ মুজিবের মনোভাব দেশের জনগণ জানার ফলে পাকিস্তান সরকার স্বাধীনতা যুদ্ধকে ভারতের ষড়যন্ত্র বলে চালোনার সুযোগ পেয়েছে বেশী যা ব্যাপকভাবে বিভ্রান্ত করেছে দেশের মানুষকে। শেখ মুজিব স্বাধীনতার প্রস্তুতি নিলে, সবাইকে আস্থায় আনার চেষ্টা করলে এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করলে, স্বাধীনতা যুদ্ধের রূপ ভিন্নতর হতো। স্বাধীনতা যুদ্ধের তখন দলীয় রূপ থাকতো না, সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হতে কম পারতো এবং জাতীয় মত-বিভক্তি এভাবে ঘটতো না।

(গ) স্বাধীনতা ঘোষণায় কম্যুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের অগ্রণী ভূমিকা ইসলামপন্থী মহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১লা মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করে।

কর্মকর্তা মন্তব্য করেছিলেন, শেখ মুজিব বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছেন। শেখ সাহেবকে যখন এ মন্তব্য অবহিত করা হলো তখন শেখ বলেছিলেন, সবে তো শুরু, ওরা কি পেয়েছে?

১০ জানুয়ারী থেকেই ভারত বিরক্ত হতে থাকে। শেখ সাহেব যেদিন নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারে থেকে মুক্তি পেয়ে ঢাকা এলেন সেদিন পাকিস্তান থেকে শেখ সাহেব প্রথমে গেলেন লন্ডন। তারপর দিল্লী হয়ে ঢাকা। দিল্লী যখন এলেন, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী খবর পাঠালেন, শেখ সাহেব যেন বৃটিশ এয়ার ফোর্সের বিমানে ঢাকা না যান। তিনি যেন ভারতীয় বিমানে যান এই ছিলো অনুরোধ। ভারত বললো, বৃটিশ সরকার যেখানে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি, সেখানে শেখ সাহেব কি করে তাদের বিমানে ঢাকা যান। আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সামাদ আজাদ শেখ সাহেবকে ভারতের এ ইচ্ছার কথা যখন জানালেন, তখন শেখ সাহেব কোনো চিন্তা-ভাবনা না করেই বললেন, আমি বৃটিশ বিমানেই যাব। ওদের বলে দিন আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। এতে কোনো হেরফের হবে না। ১০ জানুয়ারী প্রতি বছরই আসে। আওয়ামী লীগ দিবসটি পালন করে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে জনসভা করে, নেতারা নরম-গরম বক্তৃতা দেন। কিন্তু একবারও বলেন না বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন না হলে কি হতো বাংলাদেশের অবস্থা। আমার মতে ১০ জানুয়ারী হওয়া উচিত বিজয় দিবস। .... ২৫ বছরের চুক্তি নিয়ে কথা হয় যখন-তখন। আসলে এ চুক্তিতে তেমন কিছু নেই। চুক্তি ছিলো ১৯৭১ সালের অক্টোবরে। যা কার্যকর হলে বাংলাদেশ হতো আরেক সিকিম। এ চেষ্টাও যে হয়নি তা বলা যায় না। ১৯৭১ সনের ২৮ ডিসেম্বর তিনজন সংখ্যালঘু নেতা মিসেস গান্ধীর সাথে দেখা করে বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনজন হলেন মনোরঞ্জন ধর, প্রয়াত ফনিভূষন মজুমদার ও বর্তমান ভারত প্রবাসী চিত্তরঞ্জন সুতার।"-(শেখ মুজিব চুক্তিটি অগ্রাহ্য করলেন'-মতিউর রহমান চৌধুরী ঃ নঈমুল ইসলাম খান সম্পাদিত, বাড়ী ৫০ সড়ক ২ এ ধানমণ্ডি থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'কাগজ' ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১১ জানুয়ারী, ১৯৯০)

www.bjilibrary.com

এ অসহযোগ আন্দোলনের টার্গেট ছিলো নিঃশর্তভাবে নির্বাচন বিজয়ী সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর যাতে আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে দেশ শাসন করতে পারে। কিন্তু আওয়ামী লীগ যখন অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করছিলো, তখন কিছু দল ও গ্রুপ স্বাধীনতার ডাক দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছিলো। কয়েকটা দৃষ্টান্ত ঃ

১৯৭১ সালের ২ মার্চ 'পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ' শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্যে একটা খোলা চিঠি প্রচার করে। তাতে বলা হয় ঃ "পূর্ব বাংলার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করুন পূর্ব বাংলায় কৃষক শ্রমিক প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সম্বলিত স্বাধীন গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার অস্থায়ী সরকার কায়েম করুন। প্রয়োজন বোধে এ সরকারের কেন্দ্রীয় দফতর নিরপেক্ষ দেশে স্থানান্তর করুন। .... পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি বাহিনী গঠন এবং শহর ও গ্রামে জাতীয় শত্রু খতমের ও তাদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আহ্বান জানান।" তাদের শ্লোগান ছিলো ঃ "পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা-জিন্দাবাদ, পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী ও তার দালালদের খতম করুন, গ্রাম শহরে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করুন।"[১০১] ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ তার পল্টনের জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এ প্রস্তাবে বলা হয় ঃ "এ সভা পাকিস্তানী ঔপনিবেশিকদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েমের শপথ গ্রহণ করিতেছে।"[১০২] এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ' এর যে ঘোষণা ও কর্মসূচী প্রচার করে তার অংশ বিশেষ এই ঃ

"৫৪ হাজার ৫ শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের জন্যে আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ

---

১০১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৬৬৩-৬৬৫
১০২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৬৬৬

www.bjilibrary.com

রাষ্ট্রের নাম 'বাঙলাদেশ'। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

"(১) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালী জাতি সৃষ্টি ও বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক, শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে।

(৩) বাঙলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্যে নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে

(ক) বাঙলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করতে হবে।

(খ) স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে 'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি ' সংগীতটি ব্যবহৃত হবে।"[১০৩]

ইশতিহারটি প্রচারিত হয় 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' এর নামে।

স্বাধীন সার্বভৌম শোষণমুক্ত বাংলাদেশের জাগ্রত লেখক শিল্পীদের মুখপত্র বলে কথিত ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ প্রকাশিত 'প্রতিরোধ' (দ্বিতীয় সংখ্যা) এ বলা হয় : "আমরা বাংলাদেশের জাগ্রত শিল্পী-সাহিত্যিকদের জাগ্রত বিবেক থেকে আজ এ ঘোষণাই করছি, বাঙালী আর মোহাচ্ছন্ন থাকবেন না। শোষণহীন, রোদনহীন, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েম করে বাঙালী আজ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবেই করবে। সাথে সাথে আমরা বাঙলাদেশের সকল রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি এ হুশিয়ারী উচ্চারণ করছি যে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আমরা আপনাদের রূপ দেখতে চাইনে। বাঙলার স্বাধীনতার বিপক্ষে যে কোনোরূপ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে জনগণের হাত থেকে আপনাদের নিস্তার থাকবে না। .... স্বাধীন সার্বভৌম শোষণমুক্ত বাঙলাদেশ জিন্দাবাদ। পরিষদ বৈঠক বর্জন করো, বাঙলাদেশ স্বাধীন করো।"[১০৪]

---

১০৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৬৬৭-৬৬৮
১০৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৬৯৩-৬৯৪

www.bjilibrary.com

'১৯৭১ সালের ৭ মার্চ 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি' কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে গেরিলা যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে তাদের ইশতিহারে বলা হয় ঃ "পূর্ব বাংলার মাটি আজ রক্ত চায়। পূর্ব বাংলার কোটি কোটি মানুষ আজ স্বাধীনতার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা পূর্বেই বার বার বলিয়াছি যে, নির্বাচনের মাধ্যমে আপোসে বাংলার স্বাধীনতা আসিবে না-আসিবে না পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা সমগ্র জনতার মুক্তি। মুক্তির একমাত্র পথ সশস্ত্র বিপ্লব। তাই আজ এক মুহূর্তও দেরী করার সময় নাই। পূর্ব বাঙলার মাটি আজ রক্ত চায়। তাই পূর্ব বাঙলার কৃষক গ্রামে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করো। শাসক গোষ্ঠীর হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লও। গ্রামে বাংলার স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দাও। মুক্ত এলাকা গঠন করো। আস, আমরা ঘোষণা করি, হুশিয়ার ! পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে যাহারা বাধা প্রদান করিবে কিংবা যাহারা তাহাকে মাঝ পথে থামাইয়া দিতে চাহিবে তাহাদের আমরা কিছুতেই ক্ষমা করিব না বরদাশত করিব না।"[১০৫]

ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে ৮ মার্চ (১৯৭১) তাদের এক প্রচার পত্রে বলে ঃ "সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে-ঘরে ঘরে আজ উড়ছে স্বাধীন বাঙলার পতাকা। ...., বাঙলার সাড়ে সাত কোটি জাগ্রত স্বাধীনতাকামী ভাইবোনদের নিকট আমাদের আকুল আবেদন, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত বাঙলার প্রতিটি ঘরে ঘরে মাতৃভূমি বাঙলাকে স্বাধীন করার যে দুর্জয় প্রতিজ্ঞা গর্জে উঠেছে তাকে যে কোনো মূল্যে বাঁচিয়ে রেখে 'স্বাধীন সমাজ তান্ত্রিক বাঙলাদেশ' গঠন করতে হবেই। এরই প্রেক্ষিতে সর্বস্তরে 'বাঙলা মুক্তিফ্রন্ট' (Bengal Liberation Front) গঠন করুন, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে মুক্তিফৌজ গড়ে তুলুন আর স্বাধীনতা সংগ্রামকে সঠিক গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলুন।"[১০৬]

পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। তাদের প্রচারপত্রে বলা হয় ঃ "বাংলাদেশের জনগণ আজ গণতন্ত্র ও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে এখানে পৃথক ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করিতে পদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

---

১০৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৯৬
১০৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭০৫-৭০৬

www.bjilibrary.com

পূর্ব বাংলার কম্যুনিস্টরা দীর্ঘকাল হইতেই বাঙালীসহ পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জাতির বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার তথা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দাবী করিয়া আসিতেছে। ঐক্যবদ্ধ গণশক্তি ও জনতার সংগ্রামের জোরে গণ দুশমনদের ও উহাদের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া এখানে জনগণের দাবী মতে 'স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলা' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অগ্রসর করিয়া লইতে হইবে। .... এজন্য পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে, কল-কারখানায় সর্বত্র দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শক্তি নিয়া গড়িয়া তুলুন স্থানীয় সংগ্রাম কমিটি ও গণবাহিনী। ...."[১০৭]

ছাত্র ইউনিয়ন স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের আহ্বান জানায় ১৯৭১ সালের ১১ মার্চ। ছাত্র ইউনিয়ন প্রচারিত 'শোষণমুক্ত স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের সংগ্রাম আরও দুর্বার করিয়া তুলুন' শীর্ষক প্রচারপত্রে বলা হয় ঃ "অনেক ঘটনার ঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সাত কোটি জনতা আজ পূর্ব বাংলায় তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার কায়েম করিতে চাহিতেছেন, চাহিতেছেন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম করিতে। এই জন্য জনগণ আজ অকুতোভয় জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন। .... আমাদের দেশ মাতৃকার উপর হইতে বৃটিশ, আমেরিকা প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের যে কোনো শোষণ ও প্রভাব লুপ্ত হইবে, কৃষকদের উপর হইতে জোতদার মহাজনদের সামন্তবাদী শোষণ উচ্ছেদ হইবে, দেশের জনগণকে পুনরায় পুঁজিবাদী শোষেণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হইতে হইবে না। সকল প্রকার শোষণমুক্ত বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় গণতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলা কায়েমের লক্ষ্য সামনে রাখিয়া বর্তমান সংগ্রামকে অগ্রসর করিয়া লইবার আহ্বান আমরা জানাইতেছি। ...."[১০৮]

উপরোক্ত দৃষ্টান্তসমূহের গ্রুপ ও দলগুলো যারা আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলনের সমান্তরালে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলো, তারা কম্যুনিস্ট, সমাজতন্ত্রী, বামপন্থী বলে পরিচিত ছিলো। এদের মধ্যে ছাত্র লীগই একমাত্র গ্রুপ যার বামপন্থী পরিচয় ছিলো না। কিন্তু তারাও তাদের স্বাধীনতা ঘোষণার ইশতিহারে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ডাক দেয়। সুতরাং অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন

---

১০৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৭০৯-৭১১
১০৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা–৭৩৩-৭৩৪

www.bjilibrary.com

সময়ে স্বাধীনতা ঘোষণাকারী সকলেই ছিলো বাম শিবিরের। এরা ছিলো দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনতার চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী শক্তি। আর ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপগুলোর সাথে ছিলো এদের চরম বৈরিতা। ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপগুলোর কাছে এরা ছিলো বিজাতীয় আদর্শ ও বিদেশী শক্তির এজেন্ট। সুতরাং এদের উদ্দেশ্যকে সন্দেহের চোখে দেখা এবং তার বিপরীত অবস্থানে গিয়ে দাঁড়ানো ইসলামপন্থী দল ও জনতার জন্যে ছিলো স্বাভাবিক। তার উপর আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলনের সাথে বামপন্থীদের আন্দোলনের ছিলো সুস্পষ্ট পার্থক্য। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ চাচ্ছিল তাদের হাতে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতার হস্তান্তর যাতে ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা ও দেশ শাসন করা যায়। আর ওরা চাচ্ছিলো স্বাধীনতা যার আদর্শিক ভিত্তি ওরা দাবী করছিলো সমাজতন্ত্র হবে। এমনকি স্বাধীনতা ঘোষণা প্রশ্নে "ছাত্র লীগের সমাজতন্ত্র প্রভাবিত ছাত্র-তরুণদের আন্দোলনের সাথে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের আন্দোলনের সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হয় ৩রা মার্চ থেকে। জনাব কামরুদ্দীন আহমদ এ দৃশ্যটি তার গ্রন্থে সুন্দর করে ধরে রেখেছেন। তিনি লিখছেন ঃ

"শেখ সাহেবের ৩ মার্চের বক্তৃতার পর ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাঁকে তাদের মিছিলে শরিক হবার জন্যে অনুরোধ করলো। শেখ সাহেব সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে, ৭ মার্চ তারিখ তিনি রেসকোর্স ময়দানে জনসভা ডেকেছেন। ঐ জনসভায় তিনি তাঁর পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করবেন। তার আগে তাঁর পক্ষে ৩ মার্চের মিছিলে যোগ দেয়া সম্ভব হবে না। চরমপন্থী ছাত্র ও যুব নেতৃবৃন্দ তাঁর এ সিদ্ধান্তকে দুর্বলতা বলে মনে করলো। ছাত্ররা তখন ছাত্র সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে তাদের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত করলো। ফলে ঐ তারিখ থেকেই আন্দোলন দুটো ধারায় বইতে শুরু হলো। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কার্যালয় স্বাধীনতার জন্যে সর্বাত্মক লড়াই এর প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। অন্যদিকে শেখ সাহেবের নিজের বাড়ীতে অহিংসা ও অসহযোগ নীতির ভিত্তিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। অসহযোগ আন্দোলনের নির্দেশ দেয়া হতো শেখ সাহেবের ধানমণ্ডীর বাড়ী থেকে, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকগণ কাজের নির্দেশ পেতো জহুরুল হক হল থেকে। শেখ মুজিবকে যদিও ছাত্ররা বিপ্লবের প্রতীক বলে মনে করতো, কিন্তু তারা তাদের নিজস্ব কর্মপদ্ধতিই অনুসরণ করতো।"[১০৯]

---

১০৯. স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর, কামরুদ্দী- আহমদ, পৃষ্ঠা-১০৮

www.bjilibrary.com

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সেই সময়ের আন্দোলন বামপন্থী ও চরমপন্থীদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং শেখ মুজিবের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন এ দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ দুই ধারার মধ্যে দল-মত নির্বিশেষে সকলে অসহযোগ আন্দোলনের সাথেই একাত্ম হয়ে গিয়েছিলো। তারা শেখ মুজিবকেই চিনতো, শেখ মুজিবকেই মানতো এবং নির্দেশের জন্যে তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো। বিশেষ করে বামপন্থীদের বৈরী ইসলামপন্থী দল, গ্রুপ ও জনতার জন্যে একথা ছিল আরও বেশী সত্য। নিঃশর্ত ক্ষমতা হস্তান্তর ভিত্তিক অসহযোগ আন্দোলনের মোকাবিলায় বাম ও চরমপন্থীদের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণাকে তারা বিদেশ ও বিজাতীয় ষড়যন্ত্র বলেই ধরে নিয়েছিলো।[১১০ক] আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিব এ ধারণা ভাঙার কোনো চেষ্টা করেননি এবং পৃথক দুই ধারাকে এক করে গেলেন না তিনি শেষ পর্যন্তও। স্বাধীনতা ঘোষণা না করে এবং অবশেষে ক্ষমতা তাঁর হাতে হস্তান্তর হবেই—এ আশা নিয়ে তিনি স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণ করলেন। সেই সময়ের জন্যে নেতৃত্বের এটা ছিলো সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।[১১০খ] এ ব্যর্থতাই বিভ্রান্তির কুয়াশাকে ঘনীভূত

১১০ক. তাদের ঐ সময়ের এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরের বিবৃতি-বক্তব্য দ্রষ্টব্য, যাতে স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিদেশী ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

১১০খ. "জাতির জন্যে স্বাধীনতা অর্জনই যদি শেখ মুজিবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তাহলে ৭ মার্চের অমন জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদানের পরে তিনি কি করে শত্রু পক্ষের সাথে বৈঠকের আশা পোষণ করেছিলেন? পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেল সামরিক সরকার প্রধান ইয়াহিয়া খানের সাথে স্বাধীনতা ঘোষণার পরে পুনরায় শেখ মুজিব কেন বৈঠকে বসতে চেয়েছিলেন ? স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণাকারী শেখ মুজিবের কি ধরনের প্রত্যাশা ছিলো জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে ? 'যার যা আছে তাই নিয়ে জাতিকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ প্রদান করার পরে কোন্ ভরসায় জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে আপোস রফার আলোচনার টেবিলে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ? তাহলে কি শেখ মুজিব স্বাধীনতা চাননি ? তিনি কি চেয়েছিলেন পাকিস্তানী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতার মসনদে পৌঁছতে ? জাতিকে চূড়ান্ত ত্যাগের জন্য নির্দেশ দিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনো ত্যাগের প্রস্তুতি না নিয়ে ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত কেনইবা শত্রু পক্ষের সাথে বৈঠকের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এখানেই খুঁজতে হবে শেখ মুজিবের নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণ। .... 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' 'মুক্তির সংগ্রাম' এ ধরনের মন্তব্য করতে যেমন তাঁর বাধেনি, তেমনি বাধেনি মুক্তির সংগ্রাম ঘোষণা করার পরেও শত্রু পক্ষের সাথে আলোচনার টেবিলে বসার জন্যে অপেক্ষা করতে। .... তখনকার ছাত্র নেতৃত্বের চাপেই শেখ মুজিব ৭ মার্চ ভাষণে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, 'এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এ ধরনের ঘোষণা দিতেও বাধ্য হয়েছিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে এক বৈঠকে তিনি প্রকাশ্যে বলেও ফেলেছিলেন, 'আমি যদি আপনার কথামতো কাজ করি, তাহলে ছাত্র নেতারা আমাকে গুলী করবে, আর যদি আমি ছাত্র নেতাদের কথামতো চলি, তাহলে আপনি আমাকে গুলী করবেন, বলুন তো এখন আমি কি করি।' শেখ মুজিব তাঁর নেতৃত্বের অসহায় ও করুণ অবস্থায়ই ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর উপরোক্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে। .... শেখ মুজিব একদিকে ছাত্র নেতৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করে স্বাধীনতার পক্ষে যেমন কাজ করেছেন, ঠিক তেমনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন, পাকিস্তানকে রক্ষা করতে।"–(অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, মেজর (অব) এম এ জলিল, ১১-১২)

www.bjilibrary.com

করে। দেখা গেলো, শেখ মুজিব গ্রেফতার হওয়ার পর যে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলো তাকে ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপরা বিদেশ ও বিজাতীয় আদর্শের ষড়যন্ত্র হিসেবেই চিহ্নিত করছে।[১১১] ২৫ মার্চ পর্যন্ত একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি এভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লো জাতির জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক ইস্যুতে।

যারা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেয়নি তাদেরও এ সিদ্ধান্তের মূলে আওয়ামী লীগের আচরণ সম্পর্কে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা, বামপন্থীদের মতলব সম্পর্কে সন্দেহ ও ভয়, শেখ মুজিব কিছু না বলা ও তার অনুপস্থিতিসহ শুরু হওয়া স্বাধীনতা যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি এবং অন্যদের মতো স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে ভারত গমনে তাদের অসুবিধা প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করেছে যার ফলে জাতির ঐতিহাসিক এবং বেদনাদায়ক বিভক্তি আরও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। কারণগুলোর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিম্ন বিষয়সমূহ সামনে আসতে পারে ঃ

(ক) প্রথমেই তাদের আওয়ামী লীগ ও ভারতভীতি এবং পাকিস্তান প্রীতির কথা ধরা যাক। মুসলিম লীগ থেকে শুরু করে সবগুলো ইসলামপন্থী দল, গ্রুপ এবং উল্লেখযোগ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব রাজনৈতিক ও আদর্শিক মতপার্থক্যের কারণে আওয়ামী লীগকে সবসময় ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখে আসছে। জন্মের সময় থেকেই আওয়ামী লীগের সাথে মুসলিম লীগের বিরোধ। এ বিরোধের কারণ কিছুটা রাজনৈতিক, কিছুটা আদর্শিকও। আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বি হওয়া ছাড়াও কিছুটা বামঘেষা, স্বায়ত্ব শাসনের পক্ষপাতি ধর্মনিরপেক্ষ এবং কিছুটা

---

১১১. "১৯৭০-এর নির্বাচনের দীর্ঘ অভিযানে শেখ মুজিব প্রায় প্রতিটি নির্বাচনী জনসভায় জনগণকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, 'আমরা ইসলাম বিরোধী নই' এবং 'আমরা পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চাই না।' জনগণ তাকে ভোট দিয়েছিলেন তাদের অধিকার আদায়ের জন্যে। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কোনো ম্যাণ্ডেট তিনি নেননি। নির্বাচনের পরও এ জাতীয় সুস্পষ্ট কোনো ঘোষণা তিনি দেননি। তাই ১৯৭১ এ যারা বাংলাদেশে আন্দোলনে শরিক হয়নি তারা দেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলো না। ভারতের অধীন হবার ভয় এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের খপ্পরে পড়ার আশংকাই তাদেরকে ঐ আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করেছিলো। .... নিজ দেশের কল্যাণ চিন্তাই তাদেরকে এ ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছিলো।" পলাশী থেকে বাংলাদেশ, অধ্যাপক গোলাম আযম, পৃষ্ঠা-২৬।

"ভারতের সাহায্যে দেশ স্বাধীন হোক এটা এদেশের অনেকেরই কাম্য ছিলো না। .... এদেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা ছিলো যে, ভারত মনে-প্রাণে পাকিস্তান ও পাকিস্তানের মুসলমানদের মঙ্গল কোনো দিন চায়নি। শুধু পাকিস্তানকে ভাঙ্গার লক্ষ্যেই তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে এতো সাহায্য করেছিলো, এ দেশের লোকের সত্যিকার মুক্তির জন্যে সাহায্য করেনি। .... যখন বাংলাদেশ হয়, তখন দেশের অধিকাংশ লোকের মনোভাবই এরূপ ছিলো।" স্বাধীনতা উত্তর জাতীয় সংসদের আওয়ামী লীগ সদস্য জনাব মো আবদুল মোহাইমেন লিখিত 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ', পৃষ্ঠা-২৭।

www.bjilibrary.com

ভারতমুখী। অন্যদিকে মুসলিম লীগ শক্ত কেন্দ্রের নামে স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পক্ষপাতী। আর জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি প্রভৃতি ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহ আওয়ামী লীগের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো না। তাদের বিরোধ ছিলো মূলতই আদর্শিক। পঞ্চাশের দশকে জামায়াতে ইসলামী যুক্ত নির্বাচনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। আর আওয়ামী লীগ করেছে যুক্ত নির্বাচনকে সমর্থন। এখানে জামায়াতে ইসলামীর বিবেচ্য ছিলো মুসলিম স্বার্থ, আর আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক স্বার্থের দিকটাই বিবেচনা করেছে। জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি প্রভৃতি ইসলামী দল পঞ্চাশের দশকে ইসলামী শাসনতন্ত্রের জন্যে আন্দোলন করেছে। আর আওয়ামী লীগ তার উপর বাম প্রভাব এবং ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগির কারণে এ আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেছে। এভাবে ষাটের দশকে আওয়ামী লীগ ৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতের বিরুদ্ধে কথা না বলা, ছয় দফা দাবী উত্থাপন এবং সর্বশেষে '৬৯ সালের সর্বদলীয় আন্দোলনের ফলকে একা কুক্ষিগত এবং অন্যদল বিশেষ করে ইসলামপন্থী দলসমূহকে মাঠ থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা আওয়ামী লীগ সম্পর্কে ইসলামপন্থী দলসমূহের সন্দেহ ও ভয়কে সর্বোচ্চে পৌঁছায়। তারা মনে করতে থাকে, ভারতের সাথে আওয়ামী লীগের অদৃশ্য যোগসাজশ রয়েছে। আর তাদের কাছে ভারতের রাজনীতি মানেই হলো ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের গলা টিপে মারা। একদিকে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে তাদের এ সহজাত ভয় ও সন্দেহ, অন্যদিকে আওয়ামী লীগ তাদেরকে বাঙালীর শত্রু মনে করার ফলে এ দুই শক্তির পক্ষে মনের দিক দিয়ে কাছাকাছি আসা সম্ভব হয়নি। এ কারণেই ইসলামপন্থী দলগুলো অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করলেও ২৫ মার্চের পর আওয়ামী লীগ এবং অরাজনৈতিক অন্যদের মতো করে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি। তারা একে জাতির বা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধই মনে করেনি, পশ্চিমবংগ ও ভারতের মুসলমানরাও সাধারণভাবে এ আন্দোলনকে মুসলিম স্বার্থ বিরোধী পাকিস্তান ভাঙ্গার আন্দোলন বলে মনে করেছে।[১১১ক] অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ও অন্যরা

১১১ক. যে নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা কোলকাতায় ছিলাম, বরাবরই আমরা লক্ষ্য করেছি কোলকাতার বাঙালী মুসলমানরাও আমাদের এ আন্দোলনকে খুব প্রীতির চোখে দেখেনি। এ আন্দোলনকে পাকিস্তান ভাঙ্গার আন্দোলন বলেই তারা মনে করতো। তাদের ধারণা ছিলো কোলকাতায় বা পশ্চিম বংগে সাম্প্রদায়িক দাংগা আরম্ভ হলে কিছু দিনের জন্যে হলেও তারা হয়তো পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে গেলে তারা সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে .....। কোলকাতার অবাঙ্গালী মুসলমানরাও মনে প্রাণে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী ছিলো। আমাদের তারা রীতিমতো শত্রু স্থানীয় মনে করতো, বাড়ী ভাড়া করতে গিয়ে দেখেছি, যে মুহূর্তে তারা জানতে পারতো আমরা পূর্ব পাকিস্তানের লোক, তখনি তারা বাড়ী ভাড়া দিতে অস্বীকার করতো।.......... আমরা যারা সীমান্তের অপর পারে গিয়ে বাড়ী ভাড়া করে থাকবার সুযোগ পেয়েছিলাম, সেসব বাড়ী হিন্দুদেরই ছিলো।"-(ঢাকা আগরতলা মুজিব নগর', এম এ মোহাইমেন,পৃষ্ঠা-৫৭

www.bjilibrary.com

স্বাধীনতা যুদ্ধকে বাঙালী স্বার্থের জন্যে অপরিহার্য মনে করেছে। বস্তুত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অদুরদর্শিতা ও অর্বাচিনতা থেকে সৃষ্ট মুসলিম স্বার্থ ও বাঙালী স্বার্থের এ দ্বন্দ্বই সেদিন ১৯৭১ সালে জাতিকে বিভক্ত করে। অথচ দুই স্বার্থ যে একই স্বার্থ–একথা সেদিন দুই পক্ষের কেউ কাউকে বুঝাতে পারেনি। পারলে সব ইসলামপন্থী দল, গ্রুপ ও ব্যক্তিত্ব একদিকে এবং সব বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ দল ও গ্রুপ অন্যদিকে–এভাবে জাতি বিভক্ত হয়ে পড়তে পারতো না।

ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপের পাকিস্তান প্রীতিও তাদের উপরোক্ত মানসিকতার একটি কারণ। বৃটিশ আমলে পাকিস্তান দাবী ছিলো মুসলিম স্বার্থ সুরক্ষার প্রতীক। তখন হিন্দু কংগ্রেস পাকিস্তান দাবীর বিরোধিতা করেছে, কারণ তারা মুসলিম স্বার্থের সুরক্ষা চায়নি। তাদের বিরোধিতার মধ্য দিয়েই ভারত বিভক্ত হয়েছিলো ১৯৪৭ সালে, সৃষ্টি হয়েছিলো পাকিস্তান মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি হিসেবে। মুসলমানদের এ স্বতন্ত্র আবাস ভূমিটিকে হিন্দু কংগ্রেস সাময়িকভাবে মেনে নিয়েছিলো এ আশাতেই যে, পাকিস্তান টিকবে না। .... আবার জোড়া লাগবে বিভক্ত ভারত। হিন্দু কংগ্রেসের এ উচ্চাশার বিজয়ের মধ্যে ইসলামপন্থী দল, গ্রুপ ও জনতা অবলোকন করছিলো তাদের আদর্শের পরাজয় এবং মুসলিম স্বার্থের বিপন্ন অস্তিত্ব। এ কারণেই তারা পাকিস্তানের অস্তিত্বকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করছিলো এবং পাকিস্তানের অস্তিত্বের সাথে ইসলামকে এক করে ফেলেছিলো তারা। অথচ ইসলাম ও পাকিস্তান এক জিনিস ছিলো না। ভূখণ্ডের নাম ও তার বিভাগ-বিভক্তির সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। যাই হোক, তাদের মনোভাব তাদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা দুরদর্শিতাকে অনেকখানিই আচ্ছন্ন করেছিলো। যার ফলে তারা পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা বা পাকিস্তান বিভক্তির কথা চিন্তাই করতে পারেনি–পাকিস্তানের ঐক্যবদ্ধ কাঠামোর অধীনেই তাঁরা বিরাজিত সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। আওয়ামী লীগের কিছু বাহ্যিক আচরণও তাঁদের এ মনোভাবকে আরও পাকাপোক্ত করে দেয়। আওয়ামী লীগের ভারত-প্রীতির সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে এক সময় এসে যুক্ত হয় 'জিন্দাবাদ' এর স্থলে তাঁদের কণ্ঠে 'জয় বাংলা' শ্লোগান, যা ছিলো 'জয় হিন্দ' এর অনুকরণ। তাছাড়া ২৫ মার্চের আগে এবং পরে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের পক্ষে এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতীয় সরকারী ও বেসরকারী প্রচার মাধ্যমের 'নগ্ন ও আপত্তিকর' তৎপরতা আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইসলামপন্থীদের ভুল বুঝাবুঝির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। আওয়ামী লীগ ভীতি, ভারত ভীতি

www.bjilibrary.com

এবং পাকিস্তান প্রীতি তাঁদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। এসব মিলিয়েই জাতি-বিভক্তির অবাঞ্ছিত ও বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হবার পথ প্রসারিত হয়।

(খ) ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপের প্রতি ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী ও ক্ষমতাসীন হিন্দু কংগ্রেসের ঐতিহাসিক বৈরিতার কারণে ইসলামপন্থীদের ভারত গমন সম্ভব ছিলো না। এ কারণের শিকার হয়ে তাঁদের অনেককে মুক্তিযুদ্ধকালে দেশের অভ্যন্তরে উভয় সংকটের মুকাবিলায় এক বিদঘুটে ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়।[১১২] ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপের জন্যে তখন ভারতের মাটি কেমন বিপজ্জনক ছিলো তা আওয়ামী লীগের মিত্র রাজনীতিদের অবস্থা থেকেই পরিষ্কার। ছয় দফার আন্দোলন থেকে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত মস্কোপন্থী ন্যাপ ও সিপিবি ছিলো আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ মিত্র। এরপরও তারা ভারতে গিয়ে আওয়ামী লীগের কাছে বিমাতাসুলভ আচরণ পায় এবং মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের মধ্যে ছয় মাসই তারা যুদ্ধে অংশ নিতে ব্যর্থ হয়। সে সময়ের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে এক আলোচনায় বলা হয়েছে ঃ

“পাকিস্তানী আক্রমণের মুখে ‘মস্কোপন্থী’ নেতারা প্রথম সুযোগেই কোলকাতা মুজিব নগরে সমবেত হয়েছিলেন। ১৭ এপ্রিল গঠিত অস্থায়ী সরকারের প্রতি সমর্থন ঘোষণার মধ্য দিয়ে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের দলীয় সংকীর্ণতার কারণে মস্কোপন্থীদের সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়, তারা ‘বিস্তর দেন-দরবার’ চালাতে থাকেন। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিষ্ফল দেন-দরবার অব্যাহত থাকে। পরে সে পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণ ঘটিয়েছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। পরিস্থিতির চাপে ভারত শেষ

---

১১২. “ভারত বিরোধী ও ইসলামপন্থীরা উভয় সংকটে পড়ে গেলো। যদিও তারা ইয়াহিয়া সরকারের সন্ত্রাসবাদী দমন নীতিকে দেশের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেন, তবু এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করার কোনো সাধ্য তাদের ছিলো না। বিরোধিতা করতে হলে তাদের নেতৃস্থানীয়দেরকেও অন্যদের মতো ভারতে চলে যেতে হতো যা তাদের পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব ছিলো। .... তারা একদিকে দেখতে পেল যে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা আক্রমণ করে ইয়াহিয়া সরকারকে বিব্রত করার জন্যে কোনো গ্রামে রাতে আশ্রয় নিয়ে কোনো পুল বা থানায় বোমা ফেলেছে, আর সকালে পাক বাহিনী যেয়ে ঐ গ্রামটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা রাতে কোনো বাড়িতে উঠলে পরদিন ঐ বাড়িতেই সেনাবাহিনীর হামলা হয়ে যায়। এভাবে জনগণ এক চরম অসহায় অবস্থায় পড়ে গেলো। .... ভারত বিরোধী ও ইসলামপন্থীরা শান্তি কমিটি কায়েম করে সামরিক সরকার ও অসহায় জনগণের মধ্যে যোগসূত্র কায়েম করার চেষ্টা করলেন যাতে জনগণকে রক্ষা করা যায় এবং সামরিক সরকারকে যুলুম করা থেকে যথাসাধ্য ফিরিয়ে রাখা যায়। .... একথা ঠিক যে, শান্তি কমিটিতে যারা ছিলেন, তাদের সবার চারিত্রিক মান এক ছিলো না। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলো যারা সুযোগ মতো অন্যায়ভাবে বিভিন্ন স্বার্থ আদায় করেছে।”–(পলাশী থেকে বাংলাদেশ, অধ্যাপক গোলাম আযম, পৃষ্ঠা–১৮

www.bjilibrary.com

পর্যন্ত '৭১ সালের ৯ আগস্ট ২৫ বছর মেয়াদী 'ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি' স্বাক্ষর করার পর ক্রেমলিনের নায়করা প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের পরিস্থিতির মধ্যে 'জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের উপাদান' খুঁজে পান এবং ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরকালে ব্রেজনেভ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। সোভিয়েত মনোভাবের এ পরিবর্তন সার্বিকভাবে ভারত সরকারের অভ্যন্তরেও তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলেছিলো। ক্ষমতায় ডানপন্থীরা এর ফলে কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেন এবং মস্কোপন্থী কুটনীতিক ডিপি ধর বাংলাদেশ সরকারের উপর 'মস্কোপন্থী'দের সুযোগ দানের জন্যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন এবং সে কারণেই মূলত ন্যাপ, কম্যুনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা অক্টোবর থেকে অস্ত্র এবং যুদ্ধে অশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলো। (এ সময়ই সিপিবি 'পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি' নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি' নাম গ্রহণ করে)।"[১১৩]

মস্কোপন্থী ন্যাপ, কম্যুনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের মুরব্বী মস্কো ছিলো বলেই তারা ভারত যেতে পেরেছে এবং অবশেষে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পেরেছে, কিন্তু অন্য রাজনৈতিক দলের ভাগ্যে তা ঘটেনি। পিকিংপন্থী ন্যাপ ও কম্যুনিস্ট পার্টির দু একটি গ্রুপের দু একজন নেতাকে ভারত গিয়ে আবার ফিরে আসতে হয়েছে। কাজী জাফর আহমদ তাঁর এক সাক্ষাতকারে বলেছেন,

"সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুন জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণার কপি সহ আমি, রাশেদ খান মেনন এবং হায়দার আকবর খান রনো কোলকাতার অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সাথে সাক্ষাত করে স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের অংশগ্রহনের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করি। ধৈর্য ও সহনুভূতির সাথে বক্তব্য শুনলেও তিনি আমাদের উপর বিশ্বাস রাখতে অস্বীকৃতি জানান এবং সরকারের মুক্তি বাহিনীতে আমাদের কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। আমরা বলি যে, আপনি কেবল আওয়ামী লীগের সম্পাদকই নন, দেশেরও প্রধানমন্ত্রী এবং এজন্যেই জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে যে কেউকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া আপনার কর্তব্য। এ প্রসংগে জনাব তাজউদ্দীন জানান যে, তাকে সিদ্ধান্তের আগে গোয়েন্দা রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে এবং আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার অনুপস্থিতিতে নির্ভর করতে হবে ভারত সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টের উপর। .... আমরা মর্মাহত হয়ে ফিরে আসি।

১১৩. 'ন্যাপের ৩০ বছর', বিচিত্রা।

www.bjilibrary.com

দেশে ফেরার পথে জুনের মাঝামাঝি আগরতলায় আমাকে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' আটক করে নিয়ে যায় শিলং এর এক ডাক বাংলায়। সেখানে আমাকে সাত দিন রাখা হয়। .... সাত দিন ব্যাপী অবিরাম প্রশ্নের মাধ্যমে আমাকে ব্যতিব্যস্ত রাখা হয়।"[১১৪]

পিকিংপন্থী ন্যাপেরই যখন এ অবস্থা, মস্কোপন্থীদের যখন ঐ হেনস্থা এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা যেখানে মুক্তিযোদ্ধা বাছাই-এর অধিকারপ্রাপ্ত, সেখানে ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপের লোকরা ভারত গেলে তারা কি করতে পারতো, তাদের কি অবস্থা দাঁড়াতো, তা সহজেই অনুমান করা যায়। আর এ ধরনের রাজনৈতিক পরিচয়ের লোকদের জন্যে ভারত সীমান্ত অতিক্রমটাই কঠিন ছিলো। মাওলানা ভাসানীর সীমান্ত অতিক্রমের ঘটনা থেকে এর একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। মাওলানা ভাসানী আসাম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত প্রবেশের আগে তাঁর কয়েকজন সাথী সীমান্ত পার হলেন অবস্থা যাচাইয়ের জন্যে। মাওলানার মুরিদ একজন অসমীয় মুসলমান তাদেরকে একজন পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে নিয়ে গেলো। তার পরের ঘটনা এ রকম ঃ

"বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে পঞ্চায়েত প্রধান বললেন, আপনারা কি আওয়ামী লীগের লোক ?

–না

–আওয়ামী লীগের লোক ছাড়া বর্ডার পার হবার অর্ডার নাই।

–যারা রাজনীতি করেন না, তাদেরও ?

–তারা বর্ডার পেরুবেন কেন ?

–জান বাঁচানোর দায়ে।

পঞ্চায়েত প্রধান কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, ভোট দিয়েছেন কোন্ দলকে ?

–আমরা 'ন্যাপের' লোক।

আবার কিছুক্ষণ দম ধরে থেকে তিনি বললেন, আপনারা বরং ফিরে যান। জানাজানি হলে অসুবিধা হতে পারে।

অবস্থা আঁচ করে মাওলানা সাহেবের কথা পঞ্চায়েত প্রধানের কানে তুললাম না। নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েই সামাদ সাহেবের (মাওলানার অসমীয় মুরিদ) বাড়ীতে বসলাম। মন জুড়ে একটা প্রশ্ন চেপে বসলো, পাকিস্তান

১১৪. কাজী জাফর আহমদের সাক্ষাতকার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ১৫শ খণ্ড, পৃষ্ঠা–২০১-২০২

www.bjilibrary.com

দল মত নির্বিশেষে সব বাঙ্গালীকে মারছে। এমনকি সেমসাইড করে দু চারজন পাকিস্তানপন্থীও মেরেছে। অথচ ভারত কেবল আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগপন্থীদের আশ্রয় দিচ্ছে। তাহলে বাকি বাঙ্গালীরা যাবে কোথায় ?"[১১৫]

অবশেষে মাওলানা ভাসানী ভারতে প্রবেশ করতে সমর্থ হন। কিন্তু প্রবেশের আগে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর বিশেষ অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। মাওলানা ভাসানীর শিষ্য ভারতের তদানীন্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মঈনুল ইসলামের সুপারিশ ও বিশেষ অনুরোধেই ইন্দিরা গান্ধী ভাসানীর ব্যাপারে রাজী হন।[১১৬] এরপরও মাওলানা ভাসানীকে স্বাধীনতা যুদ্ধের গোটা সময়টা ভারতে বন্দী দশায় কাটাতে হয়। মাওলানা ভাসানী ভারত প্রবেশের যে বিশেষ সুযোগটা পেয়েছিলেন, ভাসানী ন্যাপের আর কোনো নেতা কিন্তু তা পাননি। বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও প্রখ্যাত সাংবাদিক ফয়েজ আহমদের অভিজ্ঞতাও এখানে তুলে ধরা যায়। তিনি তার 'মধ্যরাতের অশ্বারোহীর ট্রিলজী—তারপর' কলামে 'শেষতক পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে' শিরোনামে লিখেন, "মে মাসে (১৯৭১) আগরতলায় যাওয়ার পরও আমি জানতাম না কোথায় যাব, কোথায় প্রকৃত আশ্রয় আর কোথায় খাব। ১১মে দুপুরে একটা ২১জনের জীপ থেকে আমাকে কম্যুনিস্ট পার্টির অফিসে নামিয়ে দেয়া হয়। পার্টি আমার শহরের উপকণ্ঠে থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করলো। এক্সরে ওখানেই। আমি ২৫শে (মার্চ) রাতে প্রেস ক্লাবে ট্যাংকের গোলায় আহত হয়েছিলাম। .... আগরতলা থেকে ভারতীয় বিমানে গৌহাটি হয়ে কলকাতায় পৌঁছাই। মিথিক্যাল মুজিব নগর শহর কলকাতা যেন আমার জন্যে ছিল না। আগরতলায় যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, তারা আমাকে (মুক্তি) বাহিনীতে নিতে অনিচ্ছুক। .... আগরতলায় অনেক অভিযোগ পেয়ে এলাম, সেখানে সবাইকে মুক্তি বাহিনীতে নেয়া হচ্ছে না। ক'জন যুবক হতাশ ও আশ্চর্য হয়ে বলছিল, তারা দেশের জন্যে জীবন দিতে এসেছে। কিন্তু কোনো অভ্যন্তরীণ কারণে অনেককে বাহিনীতে নেয়া হচ্ছে না। কেন ? ব্যাপারটা রাজনৈতিক বিধায় সহজেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। একদিন সকালের দিকে আগরতলার বন্ধুরা একদল বন্ধুকে বললো, যারা সবাই যুবক ও শিক্ষার্থী, চলো, তোমাদের মুক্তিবাহিনীতে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা স্থানীয় অস্থায়ী ক্যাম্পে থাকে এরা, সবাই প্রগতিশীল ও

১১৫. 'স্বাধীনতা ভাসানী ভারত', সাইফুল ইসলাম, পৃষ্ঠা-৮
১১৬. 'স্বাধীনতা ভাসানী ভারত', সাইফুল ইসলাম, পৃষ্ঠা-১০-১১

www.bjilibrary.com

কম্যুনিস্ট মনোভাবাপন্ন। সেই যে তারা গাড়িতে গেল আর ফিরেনি। একটা গভীর জংগলে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এমন গুপ্ত হত্যার বিচার করার কোনো পন্থা নেই। একটা দলকেই কেবল অস্ত্র দেয়া হবে, তারাই ট্রেনিং পাবে। গোড়াতেই ষড়যন্ত্র ও বিভেদ সৃষ্টি করে রাখা হয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের উপায় কি ? প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের কাছে একটা স্মারকলিপি প্রদানের সিদ্ধান্ত হলো। সেই স্মারকলিপিতে প্রগতিশীল ও কম্যুনিস্টদের মুক্তিযুদ্ধে অবাধে যোগদানের সুযোগদানের দাবী জানানো হয়। কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন প্রমুখ এ স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীকে দেন। কিন্তু তিনি প্রতিনিধিদের নানা কথার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এভাবে তিনি কোনো নির্দেশ দিতে সক্ষম নন।.......... মুজিবনগর সরকারের প্রপাগাণ্ডা দফতরের সন্ধান করি। জনাব আবদুল মান্নান ছিলেন মেম্বার ইনচার্জ প্রচার দফতরের। পার্ক সার্কাসের এক গলিতে এঁদের তখন অফিস, বালু হককক লেনে, অনেক খুঁজে বের করলাম সেই গলিটা। ২৪শে মে আমি ও বাড়িতে উপস্থিত হই। সবাই আমাকে চিন্‌ল, কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে যেন সাহস পেল না। ব্যাপারটা রহস্যজনক মনে হচ্ছিল। মিনিট পাঁচেক পরে মান্নান সাহেব সবাইকে বললেন, চলুন যাই সময় হয়েছে। বন্ধু মুকুলসহ আরও অনেকে সেখানে ছিল, যারা আমাকে ফয়েজ ভাই বলে। কিন্তু সবাই আমাকে ত্যাগ করে বংশীবাদকের পেছনে কোথায় যেন ছুটল। আমি আমার সামান্য আস্তানায় গিয়ে ভাবলাম, মুক্তিযুদ্ধে যেতে হলে আওয়ামী লীগার হতে হবে। পরের দিন মুজিবনগর সরকারের সচিবালয়ে গিয়ে বন্ধুদের খুঁজলাম। সে সময় চারজন সেক্রেটারীর সবাই আমার পরিচিত। তাদের একজন বন্ধু নূরুল কাদেরকে বললাম সব কথা। .... ক'দিন পর আমি নূরুল কাদেরের অফিসে পুনরায় গেলাম। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, জে. ওসমানীর সাথে দেখা করবো, আমি তাঁকে চিনি। তিনি হেসে বললেন, তিনি তো নেই। তবে বসো, একজন তার অফিসার আছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলো। এই বলে তিনি অন্য কক্ষে গেলেন। একটু পরে একজন এলেন কাদেরের কক্ষে সামরিক ড্রেস পরা। কাদের বললেন, এর সাথে কথা বলো যুদ্ধে কিভাবে যাবে সে সম্পর্কে। সামান্য পরিচয়ে আমাদের হাসিমুখে কথা শুরু হলো। আমি বললাম, পথগুলো বন্ধ মনে হচ্ছে। তবু আমি অস্ত্র হাতেই মুক্তিযুদ্ধে যেতে চাই।

ঃ 'আপনার বয়স বাধা নয়তো ?'

www.bjilibrary.com

ঃ 'মুক্তিযুদ্ধে কোনো বয়সের বাধা নেই।'

ঃ 'আপনি কোন্ পার্টি করেন ?'

ঃ 'কোনো পার্টি আমি করি না। পার্টির কথা উঠছে কেন ? এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ নয় কি ?'

ঃ 'আপনি আওয়ামী লীগ করেন না কেন ?'

ঃ 'আমি কোনোদিন বুর্জোয়া-বর্ণবাদী পার্টির সদস্য হইনি।'

ঃ 'ছাত্রলীগে ছিলেন না কোনো দিন ?'

ঃ 'তাও ছিলাম না।'

ঃ আপনি আপনার পথে যান। আমরা বিশেষ কারণে আপনাকে রিকমেন্ড করতে পারবো না।"[১৬ক]

আমার মত অনুরূপ কারণেই ন্যাপ-সেক্রেটারী জেনারেল মশিয়ুর রহমান (যাদু মিয়া) কেও ভারত গিয়ে ওয়ারেন্ট-এর তাড়া খেয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসতে হয়।[১১৭]

পিকিংপন্থীরা ভারতের কাছে ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপের চেয়ে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য ছিলো। পিকিংপন্থীদের সাথে ভারত সরকারের বিরোধটা ছিলো রাজনৈতিক, কিন্তু ইসলামপন্থীদের সাথে তাদের বিরোধ ছিলো রাজনৈতিক ও আদর্শিক দুই-ই। এ বিরোধের জন্য ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের আগে এবং দেশ বিভাগের পরে এ বিরোধ আরও বৃদ্ধি পায় ইসলামপন্থীদের আওয়ামী লীগ বিরোধিতা ও ভারত বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। সুতরাং বর্ডার পার হওয়া কিংবা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার ক্লিয়ারেন্স ইসলামপন্থীদের ভাগ্যে কিছুতেই জুটতো না। যার ব্যবস্থা আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিদের জন্যে করেনি। দু চারজন ইসলামপন্থী যারা এভাবে কিংবা সেভাবে ওপারে গিয়েছিলো তারা সেখানে শুধু তেষ্ঠাতে পারেনি নয়, জীবন তাদের বিপন্ন হয়েছে।[১১৭ক]

১৬ক. জনকণ্ঠ, ১৯ ডিসেম্বর, ২০০৩।

১১৭. 'মাওলানা ভাসানী ঃ রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম', সম্পাদনা শাহরিয়ার কবির, পৃষ্ঠা-২৪, ২৫ অলি আহাদের মত আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ নেতারাও নিরাপত্তাহীনতার কারণে ভারত থেকে দেশে পালিয়ে আসেন। দ্রষ্টব্য ঃ জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-৫০৭

১১৭ক. "আগরতলার বাস ধরার জন্য মোস্তফাসহ বেরিয়ে পড়লাম। বাসে উঠে খানিকটা আসতেই হঠাৎ রাস্তার পাশে এক জায়গায় বেশ কিছু লোকের একটা জটলা চোখে পড়লো, দেখলাম কিছু লোক লম্বা একটি দাড়িওয়ালা লোককে মারধর করছে এবং লোকটি দু হাতে মার ঠেকিয়ে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করছে। লোকটিকে দেখে আমি চমকে উঠলাম, এ যে

www.bjilibrary.com

(গ) আগেই বলেছি, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে শুরু হওয়া স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বরূপ ইসলামপন্থীদের বিভ্রান্ত করে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সমাজতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী চরমপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে তারা ধরে নিয়েছিলো, ২৬ মার্চ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ ভারতের যোগসাজসে তারাই শুরু করেছে। এ ধারণা তাদের ঠিক ছিলো না। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, তা ছিলো আমাদের দেশপ্রেমিক বিদ্রোহী বাঙালী সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসাদের প্রতিরোধের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, এর পেছনে কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিলো না। মূলত নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর আকস্মিক হামলা ও নির্বিচার হত্যার প্রতিক্রিয়া হিসাবে স্বাধীনতার দাবী রাতারাতি সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।'[১১৮] এ অবস্থায় একটি নিরুপায় পরিস্থিতি এবং স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্বানুভূতি থেকেই স্বাধীনতা ঘোষিত হয় এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। '২৭ মার্চ সন্ধ্যায় ৮-ইবি'র বিদ্রোহী নেতা মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। মেজর জিয়া তাঁর প্রথম বেতার বক্তৃতায় নিজেকে 'রাষ্ট্রপ্রধান' হিসাবে ঘোষণা করলেও পরদিন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কথা প্রকাশ করেন। এসব ঘোষণায় বিদ্যুতের মতো লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে শেখ মুজিবের নির্দেশে সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালীরা স্বাধীনতার পক্ষে লড়াই শুরু করেছে। কিন্তু চট্টগ্রাম বেতারের এসব ঘোষণার পিছনে না ছিলো রাজনৈতিক অনুমোদন, না ছিলো কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি।'[১১৯]

এ পরিকল্পনাহীন অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাদের বাঙালী সৈনিক পুলিশ, ইপিআর ও আনসাররা স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে। এছাড়া তাদের আর

শেখ নুরুল্লাহ একজন মুসলিম লীগ নেতা। একে আমি বহুদিন ধরে চিনতাম। ঘটনাটি দেখে আমি দারুণ বিচলিত হয়ে পড়লাম। একবার ভাবলাম বাস থেকে নেমে গিয়ে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, কিন্তু কি করবো ভাবতে ভাবতে বাস অনেকটা পথ এসে গিয়েছে, বাস থেকে এখন নেমে পিছন দিকে ঘটনার স্থান পর্যন্ত যেতে যেতেই যা হবার তা হয়ে গেছে ভেবে ভারাক্রান্ত মনে গাড়ীতে চুপ করে বসে রইলাম। এ প্রভাবশালী লোকটি ফেনী কোর্টের বিখ্যাত আইনজীবী এডভোকেট শেখ অহিদুল্লাহর বড় ভাই অর্থাৎ বর্তমান এরশাদ সরকারের মন্ত্রী কর্নেল জাফর ইমামের জ্যেঠা।"–(ঢাকা-আগরতলা-মুজিবনগর', এম. এ.মোহাইমেন, পৃষ্ঠা–৪২)

১১৮. 'মূলধারা '৭১', মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা–২৫

১১৯. 'মূলধারা '৭১', মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা–৫

www.bjilibrary.com

কোনো বিকল্পই ছিলো না। কি নিরুপায় পরিস্থিতিতে এঁদের দ্বারা মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়, তা 'মূলধারা '৭১'-এ এভাবে বলা হয়েছে ঃ

"সামরিক আক্রমণের অবর্ণনীয় ভয়াবহতার ফলে সাধারণ মানুষের চোখে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও আদর্শগত অস্তিত্বের অবশিষ্ট যুক্তি রাতারাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। ....যারা আক্রান্ত অথবা বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়, তারা অচিরে জড়িয়ে পড়ে প্রতিরোধ লড়াইয়ে। মেজর জিয়ার ঘোষণা এবং বিদ্রোহী ইউনিটগুলোর মধ্যে বেতার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হবার ফলে এ স্থানীয় ও খণ্ড-বিখণ্ড বিদ্রোহ দ্রুত সংহত হতে শুরু করে। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িত হবার বিষয়টি এদের জন্যে মূলত ছিলো অপরিকল্পিত, স্বতঃস্ফূর্ত এবং উপস্থিত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। বিদ্রোহ ঘোষণার সাথে সাথে পাকিস্তানী বাহিনী সীমান্ত পর্যন্ত এমনভাবে এদের তাড়া করে নিয়ে যায় যে, এদের জন্যে পাকিস্তানে ফিরে আসার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়। হয় 'কোর্ট মার্শাল' নতুবা স্বাধীনতা-এ দুটি ছাড়া অপর সকল পথই তাদের জন্য বন্ধ হয়ে পড়ে।"[১২০ক]

এভাবেই এক নিরুপায় পরিস্থিতিতে আমাদের অরাজনৈতিক ও দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের দ্বারা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। এঁদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলো না, এঁদের সাথে ভারতের সাথে কোনো যোগসাজশও ছিলো না। এছাড়া দেশের হাজার হাজার অরাজনৈতিক নিরুপায় তরুণ ও যুবক নানাভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। এদেরও কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলো না,[১২০খ] ছিলো না ভারতের সাথে কোনো যোগসাজশও। সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা এবং এ যুবকরাই ছিলো স্বাধীনতা যুদ্ধের মৌলশক্তি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সমাজতন্ত্রী, কম্যুনিস্ট যারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে বড় বড় বুলি কপচিয়েছিলো, ইকবাল হলকে কেন্দ্র করে যারা ৩রা মার্চ থেকেই

১২০ক. "মূলধারা, '৭১', মঈদুল হাসান, পৃষ্ঠা-৬-৭

১২০খ. "এর (ছাত্র লীগের ক্ষুদ্র অংশ ও কম্যুনিস্টদের) বাইরে যে ছাত্র সমাজ বা রাজনৈতিক সংগঠন ছিলো তাদের জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ছিলো গতানুগতিক দেশ প্রেমিকদের দায়িত্ব স্বরূপ, ... নির্দিষ্ট চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশ প্রেমিক সেনাবাহিনী, পুলিশ, ইপিআর, আনসার, অন্যান্য চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি মহলের ক্ষেত্রেও একথাই প্রযোজ্য। এদের মধ্যে আবার অনেকেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে নিতান্তই বাধ্য হয়ে-প্রাণ বাঁচানোর তাকিদে, কেউ কেউ করেছে সুবিধা অর্জনের লোভ-লালসায়, কেউ করেছে পদ-যশ অর্জনের সুযোগ হিসেবে, কেউ করেছে তারুণ্যের অন্ধ আবেগ এবং উল্লাসে এবং কতিপয় লোক অংশগ্রহণ করেছে 'এডভ্যানচারইজম'-এর বশে। এ সকল ক্ষেত্রে দেশ প্রেম, নিষ্ঠা এবং সততারও তীব্র তারতম্য ছিলো।"-(অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, মেজর (অব) এম এ জলিল, পৃষ্ঠা-১৫

www.bjilibrary.com

স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিলো, যারা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যে[১২০গ] স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলছিলো, স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রকৃতই তাদের কোনো ভূমিকা ছিলো না। ইকবাল হল-গ্রুপের মুজিব বাহিনী তৈরী হয়ে মাঠে নামার আগেই মুক্তিযুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের এ রূপ তখন ইসলামপন্থী দলগুলোর সামনে আসেনি, আসা সম্ভবও ছিল না। তাদের নজর ছিলো স্বাধীনতা যুদ্ধকে রাজনৈতিক নেতৃত্বদানকারী ভারতপন্থী আওয়ামী লীগের 'বাংলাদেশ সরকার' এবং ভারতের প্রতি। ভারতভিত্তিক বাংলাদেশ সরকার ও ভারতীয় আচরণের মানদণ্ডেই তারা গোটা স্বাধীনতা যুদ্ধকে বিচার করে। এভাবে তাদের দৃষ্টি মুজিব নগরস্থ বাংলাদেশ সরকার ও ভারতের প্রতি নিবদ্ধ থাকার কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হাজার হাজার নিবেদিতপ্রাণ যুবকের (যাদের সামনে দেশের মুক্তি বিধান ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলো না) ত্যাগ ও কুরবানী এবং অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম তাদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। এ পরিস্থিতিতেই তারা হয় সবচেয়ে বড় ভুলের শিকার। যার ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধকে তারা বাম ও আওয়ামী লীগের চরমপন্থীদের সাথে ভারতের এক যোগ-সাজশপূর্ণ ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেনি।

সব কারণ মিলিয়ে স্বাধীনতা প্রশ্নে সেদিন যে বেদনাদায়ক মত-বিভক্তি ঘটলো, তার জন্যে আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিব এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগই মূলত দায়ী। দলীয় স্বার্থেই তারা জাতীয় ঐক্য চাননি, কিংবা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কোনো উদ্যোগ তারা নেননি। মার্চের পয়লা তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত জামায়াত, মুসলিম লীগসহ সব দলই শেখ মুজিবের পাশে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু শেখ মুজিব পাশে ডাকেননি কাউকে। এক থেকে পঁচিশ তারিখ সংকটকালীন এ দীর্ঘ সময়ে তিনি কোনো নেতাকে 'হ্যালো' পর্যন্ত বলেননি। তিনি কি করছেন, কি করবেন

১২০গ. "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র নির্দিষ্ট রূপ যে ছিলো না তা নয়, তবে সে চেতনা সীমাবদ্ধ ছিলো একটা মহল বিশেষের মধ্যে এবং তারা হচ্ছে তৎকালীন ছাত্র সমাজের সর্বাধিক সচেতন মহলেরও একটা ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ-বিশেষ করে বাংলাদেশ ছাত্র লীগের সেই অংশটি যার নেতৃত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরিফ প্রমুখ। এ অংশটির চিন্তা-চেতনার সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানী চক্র থেকে মুক্ত করে এ অঞ্চলকে বাঙালীর জন্য একটি স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলাই ছিলো তাদের লক্ষ্য।. এর বাইরে যারা এ অঞ্চলকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্ত করে স্বাধীন, সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তারা হচ্ছেন 'কম্যুনিস্ট পার্টি (মণি সিং), ন্যাপ (মোজাফফর) ন্যাপ ভাসানীর একটা অংশ, মরহুম সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।"-(অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, মেজর (অব) এম এ জলিল, পৃষ্ঠা-১৫

www.bjilibrary.com

তা কাউকে না জানিয়েই পাকিস্তানীদের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। অন্যদিকে ভারত ও ভারতে যাওয়া আওয়ামী লীগ ছিল ইসলামপন্থী দলগুলোর জন্যে যমদূত সমতুল্য। যার ফলে ইসলামপন্থী দল ও ব্যক্তিত্ব মুক্তিযুদ্ধকে মুক্তিযুদ্ধ বলে মনে করার সুযোগ পায়নি এবং আওয়ামী লীগ এ মতপার্থক্য দূর করার বদলে মুক্তিযুদ্ধকে দলীয়করণ করে ও নন আওয়ামী লীগারদের জন্যে ভারত গমনকে বিপজ্জনক করে তুলে সন্দেহ-সংশয়কে আরও বাড়িয়ে তোলে। এ অবস্থায় জাতীয় মত-বিভক্তি ছিল অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং জাতির মত-বিভক্তি একটা যন্ত্রণাদায়ক বাস্তবতা এবং এর কড়া মাসুল জাতিকে দিতে হয়েছে। সব ভুল ও অন্যায়ের দুর্বহ বোঝা জাতিকেই বহন করতে হয়েছে তার সহস্র, লাখো সোনালী সন্তানকে কুরবানী দেয়ার মাধ্যমে, তাদের বুকের তাজা-তপ্ত রক্ত মাটিতে ঢেলে।

তিন

এ কুরবানীর শুরু ১৯৭১ সালের মার্চ থেকেই। এ মার্চ থেকে নির্যাতিত-নিষ্পেষিত জাতির বুকে শুরু হয় রক্তশোষণকারী এক মহা ঘূর্ণিঝড়। এ ঘূর্ণিঝড়কে উস্কে দিবার জন্য ছিলো ভুট্টো নিয়ন্ত্রিত এক সামরিক কোটারী–কুক্ষিগত পাকিস্তান সরকার এবং সুযোগ-সন্ধানী ও প্রতিশোধকামী ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত সরকার। তাদের কারসাজি ও কুমন্ত্রণায় এক ভাই আরেক ভাইয়ের বুকে ছুরি মারার যে আত্মবিনাশী কাজ '৭১ এর মার্চ থেকে শুরু হয় তা চলে স্বাধীনতার পরও অনেকদিন পর্যন্ত। আত্মবিনাশী এ ঘূর্ণিঝড়ের চক্রে পড়ে বিহারী মুসলমান মেরেছে তার বাঙালী মুসলমান ভাইকে, বাঙালী মুসলমান মেরেছে তার বিহারী মুসলমান ভাইকে, রাজাকার মেরেছে মুক্তিযোদ্ধা ভাইকে, মুক্তিযোদ্ধা মেরেছে রাজাকার ভাইকে। তারপর সরকার বিরোধী বামপন্থী মেরেছে ক্ষমতাসীন ভাইদের, আর ক্ষমতাসীনরা মেরেছে তাদের বিরোধী বামপন্থী ভাইদের। যে যেখানেই মরুক, যেভাবেই মরুক, বুক খালি হয়েছে জাতির, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশ। লাভবান হয়েছে জাতির দেশের শত্রুরা।

প্রথমেই আসে মার্চের অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন এবং ২৫ মার্চ রাত থেকে পাক বাহিনী হামলা-অভিযান শুরু হবার পর তারা বিভিন্ন শহর বন্দরে পৌছার সময় পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের কথা। এ সময়ের হত্যাকাণ্ড প্রধানত ছিলো ১লা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা এবং ২৫ মার্চ পাক-সেনাবাহিনীর হামলা-অভিযান শুরুর প্রতিক্রিয়া। অবাঙালীরাই এ হত্যাকাণ্ডের শিকার হলো। পহেলা মার্চ যেন ছিলো নিঃসীম এক কাল দেয়াল। এ দেয়াল ভাগ করে দিলো বাংলাদেশের

www.bjilibrary.com

বাঙালী-অবাঙালীদের। ক্ষুব্ধ বাঙালীদের সমস্ত রোগ যেন মূর্তিমান আজরাঈলের মতো গিয়ে আপতিত হলো অবাঙালীদের উপর। আন্দোলনের নেতা এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ২রা মার্চ ('৭১) রাতেই শেখ মুজিব দেশবাসীর উদ্দেশে বললেন, "জনসাধারণকে বিশেষ করে উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে এবং মনে রাখতে হবে, ভাষা ও জন্মস্থান নির্বিশেষে বাংলাদেশে বসবাসকারী সকলেই আমাদের কাছে বাংগালী। তাদের জান, মাল ও সম্মান আমাদের কাছে পবিত্র আমানত এবং আমাদেরকে তা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।"[১২১] একথার তিনি পুনরাবৃত্তি করেন ৩রা মার্চ। পল্টনের শোক সভায় তিনি গুণ্ডামি ও লটতরাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, "বাঙালী অবাঙালী, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষই দেশ মাতৃকার সন্তান। তাদের সবাইর জানমাল রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবাইর।"[১২২] কিন্তু আন্দোলনের নেতার এ উদাত্ত আহ্বান সেদিন কোনো কাজে আসেনি। অবাঙালী হত্যার এক পশলা কাল ঝড় যেন বয়ে যায় দেশের উপর দিয়ে।

এ হত্যার কাল ঝড় কত জীবনকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে তার সত্যিকার হিসেব কোনো দিনই পাওয়া যায়নি, কোনো দিনই পাওয়া যাবে না। সে সংখ্যাতত্ত্বের দিকে না গিয়ে সে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতার কিছু দৃশ্য এখানে তুলে ধরছি, যা থেকে অবস্থার কিছুটা আঁচ করা যাবে। একটি পাকিস্তানী দলিল সে সময়ের হত্যাকাণ্ডের একটা সাধারণ বিবরণ দিয়েছে। তার একটা অংশ এই ঃ "আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অশুভ ইচ্ছার যারা বিরোধিতা করেছে, তারাই তাদের হত্যার শিকারে পরিণত হয়। অবর্ণনীয় বর্বরোচিত কাজ সংঘটিত হয়। বগুড়া জেলার শান্তাহারের একটি এলাকায় ১৫ হাজারেরও বেশী লোককে ঘেরাও করা হয় এবং তাদেরকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। মহিলাদের উলংগ করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হয় এবং মাকে তার নিজ সন্তানের রক্তপান করতে বাধ্য করা হয়। চট্টগ্রামে ১০ হাজারেরও বেশী লোককে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে ছোট একটা এলাকাতেই আড়াইশো মহিলা ও শিশুকে বেয়নেট দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সিরাজ গঞ্জে সাড়ে তিনশো মহিলা ও শিশুকে একটি হল ঘরে তালাবদ্ধ করে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়, ফলে তারা জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়।

---

১২১. দৈনিক সংগ্রাম, ৩রা মার্চ, ১৯৭১
১২২. দৈনিক সংগ্রাম, ৩রা মার্চ, ১৯৭১

www.bjilibrary.com

ময়মনসিংহে সানকিপাড়া এলাকায় দু হাজার পরিবারের একটি কলোনীকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা হয়। পুরুষদেরকে ঘর থেকে টেনে বের করে গুলী করে মারা হয়। এবং মহিলাদের দিয়ে কবর খোঁড়ানো হয় ও তাদের ধর্ষণ করা হয়। তারপর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদেরকে হত্যা করা হয়। .... ১৯৭১ সালের ৩রা ও ৪ঠা মার্চ রাতে .... চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের অতর্কিত আক্রমণকারীদের দ্বারা পরিচালিত বিক্ষুব্ধ জনতা Wireless Colony এবং শহরের অন্যান্য এলাকা আক্রমণ করে যথেচ্ছা লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা এবং ধর্ষণ করেছিলো। ফিরোজশাহ কলোনীতে ৭০০ ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সেখানকার অধিবাসী পুরুষ, মেয়ে ও শিশুদের পুড়িয়ে মারা হয়। যারা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলো তাদের হত্যা কিংবা গুরুত্বর রূপে আহত করা হয়। ৩ ও ৪ মার্চে যারা জীবন্ত দগ্ধ হয়েছিলো এবং যাদের ভস্মীভূত দেহ পরে পাওয়া যায়, তারা ছাড়াও, ৩শর বেশী লোক হত্যা ও আহত হয়।"[১২৩]

পাকিস্তানী দলিলে হত্যাকাণ্ডের জন্যে আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করা হয়েছে, কিন্তু যারা নিহত হয়েছে তাদের পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। মনে হবে বাঙালী বাঙালীদের মেরেছে। কিন্তু তা নয়। এ নিহতরা সবাই[১২৪] অবাঙালী। বিদেশী পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট থেকে এ বিষয়টা পরিষ্কারভাবে জানা যায়।

নয়া দিল্লীর 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা ৪ এপ্রিল ('৭১) বললো, "পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে আটকা পড়া অবাঙালী মুসলমান সবসময় পূর্ব-পশ্চিম উত্তেজনার শিকারে পরিণত হয়েছে। এখন ভয় করা হচ্ছে বাঙালীরা সেখানে প্রতিরোধস্পৃহায় সংখ্যালঘুদের উপর আপতিত হয়েছে।"[১২৫] আর ৬ এপ্রিল লণ্ডনের 'দি টাইমস' জানাল, "দেশ বিভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানে বসতি স্থাপনকারী হাজার হাজার অসহায় মুসলমান ক্রুদ্ধ বাঙালীদের গণ হত্যার শিকার হয়েছে।"[১২৬] আটাশে এপ্রিল ('৭১) তারিখে 'নিউইয়র্ক টাইমস' লিখলো, "৩৫ হাজার বিহারী এবং কয়েক সহস্র পাঠান ও অন্যান্য অবাঙালী (পূর্ব পাকিস্তানে) নিহত হয়েছে।"[১২৭] কানাডার ' অটোয়া জার্নাল' এবং 'টরেন্টো ডেইলি স্টার'

১২৩. 'East Pakistan Documentation Seires', বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৪২০, ৪৩০, ৪৩১

১২৪. অসহযোগ আন্দোলনকালে সংঘর্ষে পাক সৈন্যদের গুলী বর্ষণে নিহত বাঙালীরা এর মধ্যে শামিল নয়। ২৫ মার্চ পর্যন্ত এদের সংখ্যা কয়েকশ' হবে।

১২৫, ১২৬, ১২৭ . 'East Pakistan Documentation Seires', বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৩১৯, ৩২১, ৩২২।

www.bjilibrary.com

মে মাসের ৮ তারিখে বললো, "দায়িত্বশীল সরকারী ও অন্যান্য সূত্র হিসেব দিয়েছে পহেলা মার্চ থেকে সাম্প্রদায়িক সংঘাতে পূর্ব পাকিস্তানে ৩০ হাজার লোক মারা গেছে।"[১২৮] আত্মবিনাশী সেই সংঘাতের দৃশ্য পত্র-পত্রিকা এভাবে এঁকেছিলো ঃ

"সে এক মহা আতংকের খবর শোনা। হত্যা, ধর্ষণ, ধ্বংস, ব্যাপক লুটতরাজ–এসব ঘটনা এতো বেশী যে আতংকে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। অসহায় বিহারীরাই এর প্রধান শিকার। .... কিন্তু কত সংখ্যায় বিহারীরা নিহত হয়েছে সেটা প্রকৃত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার নয়, তাদেরকে কত বিচিত্র কায়দায় মারা হয়েছে সেটাই আসল। .... বিহারীদের হত্যাখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ছুরি দিয়ে ধীরে ধীরে তাদের হত্যা করা হয়েছে। .... একজন গর্ভবতী মহিলাকে রাস্তায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পেট কেটে ছেলেকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়। মহিলাটি বেঁচে আছে, কিন্তু বাঁচার কোনো ইচ্ছা তার নেই। .... একজন মহিলাকে মেরে ফেলা হয়, কিন্তু তার ৩ মাসের শিশুকে একটা হাত কেটে ফেলে বাঁচিয়ে রাখা হয়। একজন ডাক্তার সিরিঞ্জ দিয়ে লোকদের দেহ থেকে সব রক্ত শুষে নিয়ে তাদের মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়।
ময়মনসিংহের অবশিষ্ট বিহারীদের আশ্রয় দেয়া একটি ক্যাম্পে একজন লোক তার কাহিনী বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো। সেখানে উপস্থিত সেই ক্যাম্পের দায়িত্বশীল একজন সেনা অফিসার দেখলাম তার কান্না ঢাকার জন্যে তার মুখ ঘুরিয়ে নিলো।"[১২৯]

"যখন পাক-বাহিনী ময়মনসিংহে পৌছলো, তারা এক মসজিদে ১৫০০ বিধবা ও এতিমকে পেল।..................... এ্যাসিস্টেন্ট পোস্ট মাস্টার বলে পরিচয়দানকারী তার সাক্ষাতকারে বললো, সে 'শান্তি' নামের এক কলোনীতে বাস করতো। সেখানকার ৫ হাজার অবাঙালীর মধ্যে মাত্র ২৫জন জীবিত আছে। সাক্ষাতকার বন্ধ হয়ে গেলো। তার পরিবারের হত্যাকাহিনী বলতে গিয়ে কান্নায় ভেংগে পড়লো–তার বাকস্ফূরণ হলো না।"[১৩০]

---

১২৮. 'East Pakistan Documentation Seires', বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৩১৯, ৩২১, ৩২২।

১২৯. গার্ডিয়ান, লন্ডন, ১০ মে ১৯৭১ ঃ 'East Pakistan Documentation Seires', বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলির পত্র, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৩২৩-৩২৪

১৩০. সান, সিংগাপুর, ৯ মে, ১৯৭১ ঃ 'East Pakistan Documentation Seires', বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিল পত্র, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৩২৩

www.bjilibrary.com

"নির্যাতন করার পর হাজার হাজার অবাঙালীকে খুলনায় হত্যা করা হয়। বিহারীদের রাখা বন্দীখানা সাংবাদিকদের দেখানো হয়। রক্ত মাখা কাপড়-চোপড়, মেয়েদের চুল ইতস্তত ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।"[১৩১]

"চট্টগ্রামে পাক-সৈন্য পৌঁছার আগ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ এবং তাদের সহযোগী বাঙালী শ্রমিকরা, যারা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল বিহারীদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলো, বিহারীদের বিপুল পরিমাণে হত্যা করে। .... একটি স্থানীয় ব্যাংকের ইউরোপীয় ম্যানেজার বললেন, প্রত্যেক ইউরোপীয়র এটা সৌভাগ্য, সৈন্যরা ঠিক সময় এসে গিয়েছিলো, তা না হলে এ কাহিনী বলার জন্যে আমি জীবিত থাকতাম না। (New York Times, May 11, 1971) .... বন্দর নগরী চট্টগ্রাম সফরকারী সাংবাদিকরা ব্যাপক বেসামরিক লোক হত্যার চিহ্ন দেখতে পায়। ইস্পাহানী জুট মিলের বিনোদন ক্লাবে ১৫২জন অবাঙালী নারী-শিশুকে হত্যা করা হয়। বুলেটে ক্ষত-বিক্ষত করে রক্তমাখা কাপড়ের স্তুপ, শিশুদের খেলনা তখনও পড়ে থাকতে দেখা যায়। .... অধিবাসীরা একটা পোড়া বাড়ি দেখিয়ে বলে ৩শ পাঠানকে সেখানে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। (Washington Post, May 12, 1971) .... প্রত্যক্ষদর্শীর ৮০টি সাক্ষাতকার থেকে ধর্ষণ, নির্যাতন, চক্ষু উৎপাটন, মেয়েদের স্তন কেটে ফেলা, হত্যার আগে হাত-পা কাটার মত লোমহর্ষক কাহিনী পাওয়া গেছে।...............পাঞ্জাবী সৈনিক ও বেসামরিক অফিসার এবং পরিবারদেরকে বিশেষ নৃশংসতা চালানোর জন্যে আলাদা করে নেয়া হয়। চট্টগ্রাম মিলিটারী একাডেমীর কর্নেল কমাণ্ডিং অফিসারের স্ত্রী ধর্ষিতা ও নিহত হন এবং তাকেও হত্যা করা হয়। চিটাগাং এর অন্য অংশে একজন ইপিআর অফিসারের শরীরের চামড়া জীবন্ত তুলে ফেলা হয়। তার দুই ছেলের শিরচ্ছেদ করা হয় এবং স্ত্রীর পেটে বেয়নেট চালানো হয়। এরপর দুই ছেলের মাথা তার নগ্নদেহে তুলে দিয়ে মৃত্যুর জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়।...........অনেক তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া যায় যাদের পেটে বাংলাদেশের পতাকা দণ্ড পোঁতা ছিলো। সরকারী হিসেব অনুসারে চট্টগ্রামে ৯ হাজার মারা যায়। খুলনার সংখ্যাও অনুরূপ। হত্যাকাণ্ড অন্যান্য জায়গাতেও ঘটেছে। ঠাকুরগাঁওয়ে ৩ হাজার নারী-শিশু নিহত হয়। এভাবে নিহত হয় ঈশ্বরদিতে ২ হাজার, ভৈরব বাজারে ৫শ, কালুরঘাট জুটমিল শেডে ২৫৩জন। ....

১৩১. নিউইয়র্ক টাইমস, ১০ মে ১৯৭১ ঃ 'East Pakistan Documentation Seires', বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলির পত্র, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৩২২

www.bjilibrary.com

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গুলী করে হত্যা করা ৮২টি শিশুর একটা লাইন দেখি। আর ৩শ'টি লাশ দেখি জেলের আশেপাশে, যাদেরকে বাঙালী বন্দীরা মুক্ত হবার পর জেলে আটকে রাখা হয়েছিলো। পাক-সৈন্যরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসার আগে এদের হত্যা করা হয়। (Anthony Mascarenhas' এর রিপোর্ট, The Sunday Times, London, May 2, 1971)"[১৩২]

বাঙালী ভাইয়ের হাতে অবাঙালী ভাই হত্যার আত্মবিনাশী কয়েকটা দৃষ্টান্ত উপরে তুলে ধরা হলো। এ থেকে সেদিন আমরা কি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম তার কিছুটা আঁচ করা যাবে। নেতার আহ্বান-আবেদনও আমাদের তখন শান্ত করতে পারেনি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে গোটা একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধা, আওয়ামী লীগ, হিন্দু এবং নিরীহ জনগণের উপর যে ব্যাপক হত্যা কাণ্ড চালানো হয়, সেই কাহিনী। এ হত্যাকাণ্ড চালায় পাক সৈন্য এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত লোকজন। শহর-নগরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনগণকে নির্যাতন ও অসুবিধা থেকে বাঁচানোর জন্যেই তাদের মতে, শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছিলো।[১৩৩] কিন্তু সংঘাতময় পরিবেশে তৃতীয় পক্ষের কোনো ভূমিকা পালন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তারা পাকিস্তান সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবেই কাজ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে পাক-সৈন্যরা হত্যা-নির্যাতনের কাজে তাদেরকে ব্যবহার করেছে যেমন ব্যবহৃত হয়েছে বাঙালী পুলিশ, বাঙালী কর্মচারী, এমনকি কিছু বাঙালী সৈন্যও। আর রাজাকাররা তো পাক-প্রশাসন ও পাক-সেনাবাহিনীরই রিক্রুট। তারাই তাদের ট্রেনিং ও বেতনের ব্যবস্থা করতো।[১৩৪] রাজাকাররা মজুরীর বিনিময়ে সংগৃহীত জনগোষ্ঠী।

---

১৩২. 'East Pakistan Documentation Seires', বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলির পত্র, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৩১৯, ৩২১-৩২৪ এবং ৩২৮।

১৩৩. দৈনিক পূর্বদেশ, ১১ এপ্রিল, ১৯৭১, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিল পত্র, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৭১০

১৩৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৭৩৬-৭৩৭-এর নিম্নলিখিত দলিলগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

"To deputy commissoner, jesore ....

Sub : Pay of Razakars

Please confirm that the Pay of Razakars are being regularly Paid.

Sd/Mohammad Amin

Major, ASMLA

"Tp HQ 18 Punjab, oc 'B' Coy

www.bjilibrary.com

সাধারণভাবে সব দল, (যাতে আওয়ামী লীগও শামিল ছিলো) সব মতের লোক, যারা ভারত যায়নি, প্রয়োজন ও অবস্থার চাপে এর মধ্যে শামিল হয়েছিলো।[১৩৫] অনেক হিন্দু রাজাকার বাহিনীতে শামিল হয়। তারা পাক বাহিনীর অধীনে তাদের সব কাজেই সহায়কের ভূমিকা পালন করতো। হত্যা-নির্যাতনের কাজেও তারা ব্যবহৃত হয়েছে।

Sub : Fresh Trg, Razakars

Copy of HQ 9 Div. ltr no G/15242/Trg, of 23 Oct 71 and copy of HQ Eastern Command ltr No 418/48/Gs (T) of 19 oct. 71 Alongwith Gen. Instr block syllabus and Trq. Programme (Am 'A' 'B' & 'C') for the Sec Comds. Cadre Razakars are Fwd Herewith For you info and nec action please.

Sd/Major ASMAL

(Zain-ul-Malook)"

১৩৫. "বাঙালীদের রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি হবার কতকগুলো কারণ ছিলো। তাহলো ঃ (ক) দেশে তখন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিলো। সরকার সে দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে ঘোষণা করলো, যারা রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেবে, তাদের দৈনিক নগদ তিন টাকা ও তিন সের চাউল দেয়া হবে। এর ফলে বেশ কিছু সংখ্যক লোক, যারা এতোদিন পশ্চিমা সেনার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত দিন কাটাচ্ছিল, তাদের এক অংশ ঐ বাহিনীতে যোগদান করলো। (খ) এতদিন পাক সেনার ভয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, আত্মরক্ষার একটি মোক্ষম উপায় হিসেবে তারা রাজাকারের দলে যোগ দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। (গ) এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী জোর করে মানুষের সম্পত্তি দখল করা এবং পৈতৃক আমলের শত্রুতার প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ গ্রহণের জন্যেও এ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো।

রাজাকারদের দায়িত্ব ছিলো মুক্তিবাহিনীর লোক খোঁজ করা এবং লোকের দেহ ও মালামাল অনুসন্ধান বা সার্চ করে দেখা যে কেউ আগ্নেয়াস্ত্র বহন করছে কিনা ; তারা মেয়ে-পুরুষ সবাইকে সার্চ করার নামে তাদের টাকা-পয়সা, অলংকার ছিনিয়ে নেয়ার সুযোগ পেল।

কিন্তু রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি হবার পরে তাদের বুঝানো হলো যে, যুদ্ধে পাক সেনারা হারলে, পাক সেনাদের সাথে সহযোগিতা করার অপরাধে মুক্তিবাহিনী তাদের সকলকে হত্যা করবে। সুতরাং জীবন রক্ষা করার জন্য মুক্তিবাহিনীর গুপ্ত আশ্রয় স্থলের সংবাদ তারা পাক সেনাদের জানিয়ে দিতে শুরু করলো।"-(স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয়', কামরুদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা-১২৫

"আমার কিছু গ্রামের খবর জানা আছে, যেখানে '৭১-এর ত্রিমুখী বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্যে গ্রামের মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আমাদের কিছু ছেলে রাজাকারে আর কিছু ছেলে মুক্তিফৌজে দিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, আমাদের ইউনিয়নের বড়গলই ও কলাইভাঙ্গা (যশোর জিলা) গ্রামের গ্রাম্য প্রধানগণ মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেন যে, দু দিকেই ছেলেদের ভাগ করে দিয়ে বাঁচার ব্যবস্থা করতে হবে। এ সিদ্ধান্ত মুতাবিক যে গ্রামের শতকরা ১০০জন লোকই ছিলেন নৌকার ভোটার, তাদেরই বেশ কিছু সংখ্যক ছেলেদের দেয় রাজাকারে। যেমন কলাইভাঙ্গা গ্রামের একই মায়ের দুই ছেলের সাদেক আহমদ যায় রাজাকারে, আর তার ছোট ভাই ইজহার যায় মুক্তিফৌজে। .... এটাই ছিলো অধিকাংশ গ্রামের অবস্থা।"-('সওয়াল জওয়াব' খন্দকার আবুল খায়ের, পৃষ্ঠা-৪৫।

www.bjilibrary.com

পঁচিশে মার্চের পর এই যে হত্যাকাণ্ডের ঝড় শুরু হয় তাতে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতাকামী মানুষ এবং নিরীহ অরাজনৈতিক এমনকি পাকিস্তান সমর্থন লোকরাও।[১৩৫ক] সেই সাথে মারা যায় রাজাকার এবং শান্তি কমিটির অনেক লোকও। সবচেয়ে দুঃখজ নক হলো, এ হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ চিত্র আমাদের কাছে নেই। এক হিসেবে নিহত রাজাকারের সংখ্যা বলা হয়েছে ৫ হাজারের মতো।[১৩৬ক] আর মুক্তিযুদ্ধে মোট শহীদের সংখ্যা বলা হয়েছে ৩০ লাখ। কিন্তু কোনোটাই তথ্য নির্ভর নয়। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ' পঞ্চদশ খণ্ডে গণহত্যার একটা বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। কিন্তু তথ্যাবলীর অধিকাংশই অস্পস্ট, অগোছালো এবং বহু ক্ষেত্রে অনুমান ভিত্তিক। এসব তথ্যের ভিত্তিতে দেশ ব্যাপী অনুসন্ধান চালিয়ে একটি সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছা হয়নি। বিনা পরিশ্রমেই সরকার তার কাজটা সারতে চেয়েছেন। ৩০ লাখের একটা কথা কোন মহল থেকে উঠলো, আর তাকেই অবলম্বন করা হলো সরকারীভাবেও।[১৩৬খ] ১৯৭৮ সালে একটি সাপ্তাহিক সরকারী এ মনোভাবের উপর কটাক্ষ করতে গিয়ে '৩০ লাখ' সংখ্যাটির ইতিবৃত্ত এভাবে লিখেছে ঃ

"দৈনিক পূর্ব দেশের জনাব এরশাদ মজুমদারের একটি প্রতিবেদন ১৯৭১ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখে পূর্ব দেশেই প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি তথ্য ভিত্তিক কোনো আলোচনা বা সমালোচনা ছিলো না। বরং তা ছিলো

১৩৫ক. "মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের খবর পেয়ে মিলিটারীরা ভবানীগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করে। .... সমস্ত ভবানীগঞ্জ 'বাজার লুটপাট করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ভবানীগঞ্জ গ্রামের বেশ কিছু মহিলার উপর নির্যাতন চালায়। বলা প্রয়োজন উক্ত গ্রাম ধর্মভীরু গোঁড়া মুসলিম বসতিপূর্ণ। তারা প্রায় সকলেই পাকিস্তান সমর্থক ছিলো। তবুও খান সেনারা তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে।"–বাগমারা উপজিলার বাজে গোয়ালকান্দীর মোঃ আনিসুর রহমানের দেয়া বিবরণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–১০৫

১৩৬ক. 'স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয়', কামরুদ্দীন আহমদ, পৃষ্ঠা–১২৬

১৩৬খ. দৈনিক জনপদের সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট জনাব আবদুল গফফার চৌধুরী নিজস্ব কলামে লিখেন, "আমরা এখন বলছি মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ বাঙালী শহীদ হয়েছে। কোনো পরিসংখ্যান ছাড়াই বলছি। আমরা বলছি ৩০ লাখ বাঙ্গালী মরেছে। কিন্তু যে ১ কোটি বাঙ্গালী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলো তাদের ৪ লাখ শিশু, দেড় লাখ নারী এবং দু লাখের মতো বৃদ্ধের মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্যে দায়ী আমরা যারা মুজিব নগর গিয়ে প্রশাসনের দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলাম।"–(দৈনিক জনপদ, ২০ মে, ১৯৭৩

১৮—

www.bjilibrary.com

সংগ্রামকালীন সময়ে যারা প্রাণ হারিয়েছিলো তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন এবং হত্যাযজ্ঞের জন্য যারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলো তাদের তীব্র সমালোচনা। প্রসঙ্গত জনাব এরশাদ মজুমদার সংগ্রামের ন' মাসে কত লোক নিহত হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা নিরূপণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন মহলের এবং ব্যক্তির অনুমান ভিত্তিক সংখ্যা প্রকাশের তীব্র সমালোচনাও করেছিলেন। জনাব মজুমদার তাঁর রিপোর্টে ন' মাসে আহত, নিহত, সতিত্বহানি, ঘরবাড়ী ভস্ম এবং অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিসংখ্যানের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ২১ বা ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী সরকার ছিলো না। বাংলাদেশ মন্ত্রি সভার সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও জনাব কামরুজ্জামান সহ অন্যান্য নেতৃবর্গ ২২ ডিসেম্বর বুধবার ভারত থেকে ঢাকা আগমন করেন। সুতরাং কোনো ইতস্তত না করেই আমরা বলতে পারি যে, ২২ ডিসেম্বর বুধবার পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো প্রতিষ্ঠিত সরকার হয়নি। শুধু তাই নয়, সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরিসংখ্যান সংগ্রহের কাজটায় হাত দেয়া খুব সহজ ছিলো না। গোটা দেশে তখন চরম অরাজকতা চলছিলো। যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় ছিলো না বললেই চলে। তাছাড়া এ পথে আরো বহু বাধা ছিলো যা তৎক্ষণাৎ দূর করা সম্ভব ছিলো না। এ অবস্থার মধ্যে নিহতদের সঠিক সংখ্যা নিরূপন করা কোনো পক্ষে তো সম্ভব ছিলোই না, এমনকি কোনো সংস্থা বা সরকারের বেলায় একই কথা বলা চলে। কিন্তু তেলেসমাতি কাণ্ড দেখালেন পূর্বদেশের সম্পাদক জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী। ভারত থেকে আগত বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার সদস্যদের খেদমতে ২২ ডিসেম্বর তিনি 'ইয়াহিয়া জান্তার ফাঁসি দাও' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ পেশ করেন। এ নিবন্ধে তিনি কোনো ইতস্তত না করেই পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেন যে, ন' মাসের মুক্তি সংগ্রামে ৩০ লক্ষ লোক নিহত হয়েছে।

জানি না কোন্ দৈব বলে তিনি এ তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। হাতী ঘোড়ার যেখানে ঠাঁই নেই, বকের নাকি সেখানে মাত্র হাঁটু পানি হয়ে থাকে। কিন্তু সত্যিই কি তাই ? বকের হাঁটুই যদি পানির গভীরতার মাপকাঠি হয়ে থাকে, তাহলে ওয়াপদার পানি জরিপ বিভাগের কোনো প্রয়োজন বাংলাদেশে আছে বলে মনে হয় না।

www.bjilibrary.com

পূর্বদেশের সম্পাদকের এ যদি দৈব জ্ঞান হয়ে থাকে, তাহলে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ দেখলাম, গোটা ব্যাপারটা যেন একটা ভোজবাজির খেলা মাত্র। রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদার' ঢাকাস্থ সংবাদদাতা পূর্বদেশ সম্পাদকের প্রাপ্ত দৈব জ্ঞানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। প্রাভদা ৩০ লক্ষ নিহতের সংবাদ ফলাও করে প্রচার করে। এ সংবাদ দ্রুত ঢাকায় এসে পৌছে। ৫ জানুয়ারী (১৯৭২) ঢাকার সকল কাগজে প্রাভদার বরাত দিয়ে ৩০ লক্ষ নিহত হওয়ার সংবাদ প্রচার করা হয়। এ যেন বাংলার ডালের বস্তা বিলেত ঘুরে এসে 'বিলেত ফেরত' মর্যাদা পাওয়া।

আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলো এবং বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তাদের স্ব স্ব সংস্থা বা কাগজে পূর্বদেশের আবিষ্কারকে রাশিয়ার প্রাভদা দ্বারা সত্যায়িত করে প্রেরণ করেন। এমনিভাবে বিশ্বময় সংবাদটি প্রচার হয়ে পড়ে।

পূর্বদেশ সম্পাদকের কাল্পনিক আবিষ্কারের পাশাপাশি কতকগুলো বিপরীত চিত্র আমরা পাই। তদানীন্তন যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব শেখ আবদুল আজিজ ৭ জানুয়ারী (১৯৭২) কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিহতদের সংখ্যা ১০ লক্ষের বেশী হবে বলে মত প্রকাশ করেন। (১০ লক্ষের বেশীর অর্থ ৩০ লক্ষকে বুঝায় না তা অবশ্য সবাই স্বীকার করবেন)। মন্ত্রী মহোদয় তাঁর নিজ গ্রামে ১০৭জনের প্রাণহানির কথাও উল্লেখ করেন। নিজ গ্রামের নিহতের হিসাবের সাথে ৬৪,৪৯৯টি গ্রামের গড়পড়তা হিসাব করেই গোটা দেশে ১০ লক্ষাধিক লোক নিহত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

এ ব্যাপারে আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অলক্ষ্যে জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরীর দৈব জ্ঞানকেই সত্যায়িত করেন। প্রধানমন্ত্রী (শেখ মুজিবুর রহমান) পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন ৭ জানুয়ারী (১৯৭২) বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪ ঘটিকায়। অতপর তিনি বিলেত যান, বিলেত থেকে ১০ জানুয়ারী দিল্লী হয়ে ঢাকা আসেন এবং ঐ দিনই তিনি রমনা ময়দানে যে ভাষণ দেন তাতে নিহতের সংখ্যা ৩০ লক্ষই উল্লেখ করেছিলেন। এ তথ্যের মূল সূত্র যে কোথায় তা বোধ হয় আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। ১০ জানুয়ারীতে তিনি ৩০ লক্ষের উল্লেখ করলেও ১৫ জানুয়ারীতে দলীয় কর্মী ও এম সি'দের সমাবেশে অন্য কথা বলেন। ঐদিন তিনি তাদেরকে হত্যা, লুটতরাজ এবং অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির হিসাব

www.bjilibrary.com

১৫ দিনের মধ্যে আওয়ামী লীগ অফিসে পেশ করার নির্দেশ দেন। এছাড়াও মুক্তি সংগ্রাম কালে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগের কথা ২৯ জানুয়ারী (১৯৭২) শনিবারেই ঘোষণা করা হয়। ১৯৭২ সালের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে কমিটিকে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশের অনুরোধ জানানো হয়।

সুতরাং ১৯৭১ সনের সেই ন' মাসের সংগ্রামে কত লোক যে নিহত হয়েছিলো তার সঠিক সংখ্যা আজো নিরূপিত হয়নি। মৃতের সংখ্যা নিয়ে ভেজাল রাজনীতি .... সংক্রমিত হয়ে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিলো। সত্য আজও উদঘাটিত হলো না, মিথ্যা এখনো সত্যের স্থান দখল করে আছে। কবি যথার্থই বলেছেন, 'দ্বার বন্ধ করে ভ্রম করে রাখি, সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি।"[১৩৭]

স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা নিয়ে অনেকেই কথা বলেছেন। একথাগুলো যতই সামনে আনা যায়, বিভ্রান্তির পরিধি ততই বাড়ে। বাংলাদেশ যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর অধিনায়ক ভারতীয় জেনারেল বলেন, "পাকিস্তান আর্মি ৩০ লাখ বাঙালীকে হত্যা করেছে, এটা একেবারেই অসম্ভব।" তার মতে পাকিস্তান আর্মি দশ লাখ বাঙালীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।[১৩৭ক] অন্যদিকে আওয়ামী নেতা, মুজিব নগর সরকারের এম. পি. স্বাধীনতা উত্তর জাতীয় সংসদের পার্লামেন্ট সদস্য এ সম্পর্কিত বক্তব্য খুবই মজার। তিনি ১৯৯০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে এক বক্তৃতায় কিছু কথা বলেন। একথাগুলোই আবার বলেন এ সালেরই ২৩শে ফেব্রুয়ারী সাপ্তাহিক তারকালোককে দেয়া এক সাক্ষাতকারে। তিনি বলেন, "আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা দশ লাখ বলে ঘোষণা দিয়েছি। এ হিসাবটি আমরা তখন কলকাতায় বসে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে খবরাখবর নিয়ে একটা আনুমানিক সংখ্যা দাঁড় করিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে নিহতের সঠিক সংখ্যা নিরুপণ করতে প্রয়াস পাই। তখন বৃহত্তর নোয়াখালীর মৃতদের সংখ্যা বের করার দায়িত্ব গণপরিষদের সদস্য হিসাবে আমাকে দেয়া হয়েছিল। আমি বিভিন্ন থানা ও ইউনিয়নের সাথে যোগাযোগ করে যে সংখ্যা পেয়েছিলাম, সেটা সাত হাজারের কম। নিহত রাজাকারদের

১৩৭. সাপ্তাহিক বাংলার ডাক, ৬ আগস্ট, ১৯৭৮।

১৩৭খ. 'তিরিশ লাখের তেলেসমাত,' সালেহ উদ্দিন আহমদ, জহুরী, পৃষ্ঠা-২৭ ('আশা প্রকাশন, বড় মগবাজার, ১৯৯৩।

www.bjilibrary.com

সংখ্যা ধরেও সাড়ে সাত হাজারের বেশী দাঁড়ায়নি। তখন বাংলাদেশে ১৯টি জেলা ছিল। সব কয়টি জেলাতেই যুদ্ধ সমভাবে হয়নি। যেসব জেলায় যুদ্ধের প্রকোপ বেশী হয়েছিল, তার মধ্যে নোয়াখালী একটি। তাই নোয়াখালী জেলায় মৃতের সংখ্যা যা দাঁড়িয়েছিল, গড়ে ঐ সংখ্যাও যদি সব জেলাতে ধরা যায়, তাতেও লাখ সোয়া লাখের বেশী মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় না।" জনাব মোহাইমেন ঐ সাক্ষাতকারেই আরও বলেন, "৩০ লাখ যে মরেনি, তার আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৭২ সালে সরকারের তরফ থেকে প্রতি নিহতের জন্য দু' হাজার টাকা করে ঘোষণা করা হয়েছিল। মাত্র ৭২ হাজার দরখাস্ত পড়েছিল। তার মধ্যে (বাছাই এর পর) ৫০ হাজার নিহতের আত্মীয়দের ঘোষিত অর্থ দেয়া হয়। ঐ ৭২ হাজারের মধ্যে বহু ভূয়া দরখাস্তও ছিল। এমনকি অনেক রাজাকারও ছিল।" মুক্তিযুদ্ধে নিহত হওয়ার সংখ্যা সম্পর্কিত 'ভুলটি শোধরালেন না কেন'-এমন প্রশ্নের জবাবে মোহাইমেন সাহেব বলেন, 'কেউ শোধরায়নি কিংবা প্রতিবাদ করেননি মুজিব বাহিনী ও রক্ষী বাহিনীর ভয়ে। শেখ মুজিব ভুলটি নিজে জেনেও সংশোধন করতে এগিয়ে আসেননি।"[১৩৭খ]

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে কেউ কোথাও কোনো দেশে এ ধরনের দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে বলে জানা নেই। তবু 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ' শিরোনামে ১৬ খণ্ডে স্বাধীনতা যুদ্ধের যে বিপুল দলিলপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে, তার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলে ধন্যবাদ পাবেন জাতির কাছে। এ দলিল-দস্তাবেজ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে যে বর্বোরোচিত গণহত্যা ও নির্যাতনের মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিলো, তার কিছু নজীর এখানে উদ্ধৃত করছি যা আমাদের বিভেদও আত্মবিনাশী ভূমিকার আরও কিছুটা পরিচয় তুলে ধরবে ঃ

কারাকাসের SUMMA MAGAZINE ১৯৭১ সালের অক্টোবরে তার একটি রিপোর্টে বললো ঃ "নাজীদের হাতে ইহুদী নিধনযজ্ঞ, হিরোশিমা ও নাগাসাকির আণবিক অপরাধ, বাইফ্রায় হত্যালীলা, ভিয়েতনামের নাপাম ধ্বংসলীলা প্রভৃতি বড় বড় গণহত্যা আজ তাদের এক সাথী খুঁজে পেল পূর্ব পাকিস্তানে একটি মাত্র রাতেই হানাদার বাহিনী ঢাকা শহরে ৫০ হাজার লোক হত্যা করেছে।"[১৩৮] সেপ্টেম্বর মাসে ইক্যুয়েডরের

১৩৭খ. সাপ্তাহিক তারকালোক, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০।

১৩৮. 'A Country full of corpses', Summa Magazine, caracas, oct, 1971. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৬৩

www.bjilibrary.com

'EL Commercio' লিখলো, "বাংলাদেশে লাখ মানুষের হত্যালীলাকে শুধু এক নামেই ডাকা যায়, সেটা হলো ঃ গণহত্যা। টিক্কা খানের নির্দেশে পাক-আর্মিরা এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে। এ হত্যার সংখ্যাটা, যা ইউ এস এইডের ডাইরেক্টর লিওন এফ হেসার দিয়েছেন, বৃটিশ হিসেবে ৩ লাখে উত্তীর্ণ হয়েছে।"[১৩৯] আর ঢাকা থেকে ২৯ মার্চের ডেটলাইনে লণ্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকার মিকাইল লরেন্ট লিখছেন, "দুই দিন ও রাতের গোলা ও গুলীবর্ষণে একমাত্র ঢাকা শহরেই ৭ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে। .... জ্বলন্ত শহর পরিদর্শন থেকে একথা পরিষ্কার হয়েছে, কোনো প্রকার হুশিয়ারী ছাড়াই ঢাকার উপর অভিযান চালানো হয়। প্রজ্জ্বলিত বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু ছাত্রের লাশ এখনও তাদের ঘরে পড়ে আছে। জগন্নাথ হলে তাড়াহুড়া করে একটা গণ কবর তৈরি করা হয় এবং দুশ ছাত্রকে হত্যা করা হয় ইকবাল হলে।"[১৪০]

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ কৌশলের অধ্যাপক ডঃ নূরুল উল্লাহ, যিনি জগন্নাথ হলের ২৬ মার্চের হত্যাকাণ্ডের মর্মান্তিক দৃশ্য তার মুভি ক্যামেরায় ধরে রাখেন, এক সাক্ষাতকারে বলেন, "যাদেরকে আমার চোখের সামনে মারা হয়েছে ও যাদের মারার ছবি আমার ক্যামেরায় রয়েছে তাদের দিয়ে প্রথমে হলের ভেতর থেকে মৃতদেহ বের করে আনা হচ্ছিল। মৃতদেহগুলো এনে সব এক জায়গায় জমা করা হচ্ছিল। এবং ওদেরকে দিয়ে লেবারের কাজ করারবার পর আবার ওদেরকেই লাইনে দাঁড় করিয়ে এক সারিতে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। মনে হচ্ছিল একটা একটা করে পড়ে যাচ্ছিল। .... আমার মনে হয় প্রায় ৭০/৮০জনের মৃত দেহ এক জায়গায় জমা করা হয়েছিলো। .... আমার মনে হয় ছাত্র ছাড়াও হলের মালি, দারোয়ান, বাবুর্চি এদেরকেও একই সাথে গুলী করা হয়েছে। তবে অনেক ভালো কাপড়-চোপড় পরা বয়সী লোকদেরও ওখানে লাইনে দাঁড় করিয়ে মারা হচ্ছিল। এদের দেখে আমার মনে হয় তারা ছাত্রদের গেস্ট হিসাবে হলে থাকছিলো।"[১৪১] পঁচিশে মার্চ পরবর্তী কালো দিনে ঢাকা নগরীর একটা জীবন চিত্র পাওয়া যায় ১৮নং তাঁতী বাজার লেনের শ্রী পূর্ণচন্দ্র বসাক বাবুর বিবরণীতে। তিনি বলেন ঃ

---

১৩৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৬১
১৪০. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৪৭
১৪১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২৫

www.bjilibrary.com

"আমি ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ রাতে আমার ১৮, তাঁতী বাজারস্থিত বাসায় ছিলাম। রাত ১২টায় উত্তর দিক থেকে অকস্মাৎ কামানের আকাশ ফাটা গর্জন শুনে আমি তেতলার ছাদের উপর উঠে দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসসমূহে আগুনের ফুলকি ও লক্ষ লক্ষ গুলীর আগুনের ফুলকি আকাশ ভরে গেছে। অনবরত কামানের ভয়াল ও ভয়ংকর আওয়াজ আসছে। .... কিছুক্ষণ পরই সদরঘাট খৃস্টানদের গীর্জার সম্মুখে সামরিক গাড়ী ও ট্যাংকের ঘরঘর আওয়াজ শুনলাম। এ সময় শত কণ্ঠের 'মাগো, বাবাগো, বাঁচাও বাঁচাও, আর্তনাদ শুনলাম। শাঁখারী বাজারের সকল হিন্দু জনতা যার যার ছাদে দাঁড়িয়ে এ বীভৎস কাণ্ড দেখছিলো। ২৭ মার্চ সন্ধ্য আইন তুলে নেয়ার পর শুনলাম শাঁখারী বাজারের কোর্টের প্রবেশ পথের একটি বাড়ীতে দশজন হিন্দুকে একই ঘরে গুলীবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে এবং ডঃ শৈলেন সেনকে গ্রেফতার করে জগন্নাথ কলেজের পাক সেনাদের ছাউনিতে আটক রাখা হয়েছে। ইংলিশ রোড দিয়ে অগ্রসর হয়ে দেখলাম ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চ রোডের দুই পাশের কোটি কোটি টাকার কাঠের কারখানা ও মেশিনপত্র ভস্ম হয়ে পাক সেনাদের বীভৎসতার স্বাক্ষর হয়ে পড়ে আছে–দুই পাশের বাণিজ্য এলাকার সকল দোকান ও বাণিজ্য কেন্দ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে আছে। রাস্তাঘাট শূন্য, কোথাও কোনো মানুষ নেই। আমি কাজী আলাউদ্দীন রোড হয়ে বাবুপুরা ফাঁড়িতে দেখলাম আটজন পুলিশী পোশাক পরা লাশ গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে ফাঁড়ির বারান্দায় ও রাস্তায় বিকৃতভাবে পড়ে আছে। রেল লাইনের দুই পাশের বস্তি এলাকা ভস্ম ছাই হয়ে পড়ে আছে, দেখলাম চারদিক জনমানবশূন্য। আমি দ্রুত আমার বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক জি কে নাথ, সংস্কৃতের অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর, সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রী পরেশচন্দ্র মণ্ডলের খোঁজে জগন্নাথ হলে ইঞ্জিনিয়ারং বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক দিয়ে প্রবেশ করে দেখলাম, জগন্নাথ হলের চারদিকের দেয়াল লক্ষ লক্ষ গুলীর আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে আছে। হলের কাঁচের জানালাসমূহ ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে আছে। হলের পুকুর পাড় দিয়ে আমি অগ্রসর হওয়ার সময় দেখলাম হঠাৎ পুকুরের মধ্য হতে একজন মানুষের মাথা উপরের দিকে উঠার চেষ্টা করছে। ভীত-সন্ত্রস্ত, দিশেহারা উন্মাদের মতো হয়ে পানি থেকে মাথা তুলে ক্রন্দন ও বুকে চপেটাঘাত করতে করতে বলতে লাগলেন, 'দাদা ওদিকে যাবেন না, ওরা আমাদের সব মেরে ফেলেছে।' আমি লোকটিকে উন্মাদ মনে করে তার কথায় কান দেইনি। আমি আরও অগ্রসর হয়ে হলের কেন্টিনের

www.bjilibrary.com

দিকে এগিয়ে দেখলাম একটি প্রাণীও নাই। নীরব, নিস্তব্ধ, জনমানবশূন্য। কেন্টিনের মধ্য দিয়ে হলের নর্থ হাউসে প্রবেশ করে সিঁড়ির নিকটে দেখলাম একজন হিন্দু যুবকের লাশ পড়ে আছে-মাথার চুল আগুনে পোড়া, সারা দেহ গুলীতে ঝাঁঝরা। আমি দোতলায় না উঠে সোজা রাস্তায় নেমে পড়ে হলের শহীদ মিনারের সামনে এসে দেখলাম-শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে আছে। শহীদ মিনারের পেছনেই সদ্য মাটি তোলা এতশত ফুট লম্বা এক বিরাট গর্ত দেখলাম -গর্তটি কিছুক্ষণ পূর্বেই মাটি দিয়ে ভরাট করে রাখা হয়েছে। আমি আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে .... শামসুন্নাহার হলের দিকে অগ্রসর হয়ে জগন্নাথ হলের হাউস টিউটর মিঃ জি কে নাথ, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর এবং পরেশ মণ্ডলের কোয়ার্টারের প্রবেশ পথে গিয়ে দেখলাম-কোয়ার্টারের দরজা-জানালা সব খোলা, জনমানবশূন্য। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে দেখলাম-দোতালা থেকে পচা দুর্গন্ধ ভেসে আসছে, সিঁড়ির উপর থেকে নিচ পর্যন্ত রক্তের চিহ্ন জমাট হয়ে আছে। .... আমার উপরে উঠতে সাহস হলো না .... ভীত-সন্ত্রস্তভাবে যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সেই পথ দিয়ে দ্রুত ফিরে গেলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তা ধরে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজের ভেতরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ পথে জগন্নাথ হলের একজন চাপরাশির সাক্ষাত পেলাম। সে বললো, আমাদের হলের প্রভোষ্ট ডঃ জ্যোতির্ময় গূহ ঠাকুরতা গুলীবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালের দোতালায় ৯নং কক্ষে আছেন।

.... আমি হাসপাতালের দোতালার ৯নং কামরায় প্রবেশ করতেই হাতে ব্যাণ্ডেজ বাধা আহত (জগন্নাথ) হলের একজন যুবক ছাত্র আমাকে জড়িয়ে ধরে ক্রন্দন করতে করতে বলতে থাকলেন, দাদা আমি কি বেঁচে আছি। ....

আহত গুলীবিদ্ধ ছাত্রটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি করে বাঁচলে?' সে বলতে লাগলো, 'খান সেনারা ভারী অস্ত্র নিয়ে রাত ১২টার দিকে আমাদের হলের গেট ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে প্রত্যেক কামরা ও কক্ষে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। হল বন্ধ থাকলেও কতিপয় অনার্স পরীক্ষার্থী ও এম এ পরীক্ষার্থী প্রতিভাবান বিশ-পঁচিশজন ছাত্র হলে অবস্থান করছিলো। প্রত্যেক কক্ষে প্রবেশ করে যাকে যেখানে যেখানে পেয়েছে তাকে সেখানেই গুলীবিদ্ধ করে হত্যা করেছে, আমি সে সময় হলের বাথরুমে পালিয়েছিলাম। তারা আমাকে বাথরুমেই ধরে ফেলে। আমাকে ওরা ধরে বললো, 'তুমকো কুচ নেহি বলেগা, এবং দোতলা থেকে আরও

www.bjilibrary.com

তিনজন ছাত্রকে নামিয়ে নিয়ে এসে আবার বললো, 'ইয়ে দেখ তোমলোগ কো কুচ নাহি করেগা। উপরে যেতনা লাশ হায়, সবকো নীচে লে আও।' আমরা চারজন তাদের নির্দেশ মতো উপর থেকে সদ্য গুলীবিদ্ধ ক্ষত-বিক্ষত শহীদদের লাশ নীচে নিয়ে আসলাম। বীর শহীদদের সব লাশ আমরা শহীদ মিনারের গর্তের সামনে নিয়ে এসে দেখলাম–পাক সেনারা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। লাশগুলো ওরা গর্তের ভেতরে ফেলে মাটি চাপা দিলো। হত্যাযজ্ঞ শেষে আরেকদল সৈন্য উপরে গিয়ে আবার তল্লাশি চালিয়ে ফিরে আসলো আমাদের চারজনকে লাইন করে দাঁড়াবার নির্দেশ দিলো। আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম লাইন করে, এরপর আমাদের উপর গুলীবর্ষণ করতে লাগলো। আমাদের উপর গুলীর শব্দ হওয়া মাত্র আমি মৃত ভান করে পড়ে গেলাম। বীর শহীদদের সেই লাশের মধ্যে পড়ে থেকে দেখলাম–পাক সৈন্যরা আর্মি ট্রাক নিয়ে চলে গেল লাশের মধ্য থেকে উঠে এক দৌড়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চলে এসেছি।'

আমি বাড়ীতে চলে এসে দেখলাম, চারদিকে শাঁখারী বাজারে থমথমে ভাব–শাঁখারী বাজারের হিন্দু অধিবাসিগণ মনে করেছিলো আর কোনো হত্যাকাণ্ড হবে না–আমরা আমাদের এলাকায় ২৭ ও ২৮ মার্চ দিনের বেলায় রাস্তায় কোনো পাক সেনা দেখনি। কিন্তু কার্ফু আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে পাক সেনারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে হত্যাকাণ্ড চালায় এবং বাড়ী ঘরে অগ্নিসংযোগ করে। আমরা কয়েকদিন ছাদের উপর বসে থেকে ঢাকার চারদিকে শুধু গুলীবর্ষণের শব্দ শুনেছি এবং অগ্নি সংযোগ দেখেছি।
১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ গুজব ছড়িয়ে পড়ে ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিহারী জনতা হিন্দু মহল্লা হামলা করার জন্য এগিয়ে আসছে। এ সংবাদ পাওয়া মাত্র আমরা তাঁতিবাজার থেকে সকল হিন্দু পরিবার আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে পল্লী এলাকায় চলে যাই।"[১৪২]

ঘোড়াশালের মোহাম্মদ মাহমুদুল আশরাফ এক জবানবন্দীতে বলেন, "নবেম্বর মাসের ১৭ তারিখ ঘোড়াশাল স্টেশন মিলিটারী ক্যাম্প থেকে ৫০/৫৫জনের একটি দল ভোর ৬টায় স্টেশনের দক্ষিণ দিকের দু তিনটা পথ দিয়ে খিলপাড়া ও আটিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। .... খিলপাড়া গ্রামের জনৈক দোকানদার ইসলামের সাথে পাক বাহিনী সাক্ষাত করে। .... পাক বাহিনী ইসলামকে সাহায্য করতে বলে। উপায়ন্তর না দেখে ইসলাম বাধ্য হলো পাক বাহিনীর সাহায্য করতে।

---

১৪২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯-২২

www.bjilibrary.com

এরপর শুরু হয় পাক বাহিনীর ধ্বংসলীলা। একের পর এক বাড়ী ধ্বংস করতে থাকে এবং লোকজনকেও এক এক করে গুলী করে হত্যা করে। প্রকাশ, ইসলাম ধর্মভীরু লোক। তিনি কুরআন শরীফ পাঠ করছিলেন। .... এমনকি শিশু, নারী, পুরুষ কেউই তাদের নৃশংস হত্যা হতে নিস্তার পায়নি। দু গ্রামের প্রায় ২০০ নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করে। পাক বাহিনীর সাহায্যকারী ইসলাম তাদের এ অপকার্যে সাহায্য করেছিলো। যখন পাক বাহিনী দেখলো তাদের সাহায্যের আর প্রয়োজন নেই, পাক দস্যুরা ইসলামকেও হত্যা করে। .... দৈনন্দিন খাওয়ার যাবতীয় জিনিসপত্র গ্রামের নিরীহ লোকদের নিকট থেকে জোর করে নিয়ে যেত। পাক পশুরা গ্রামের যুবতী মেয়েদের উপর মাঝে মাঝে পাশবিক অত্যাচার চালাত। হঠাৎ একদিন পাক বাহিনী আমাকে এবং আরও অনেককে ধরে ফেলে। মুসলমান ছিলাম বলে বেঁচে যাই।"[১৪৩] ঘোড়াশাল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলী নূর চৌধুরী তাঁর দেয়া জবানবন্দীতে বলেন, "১লা ডিসেম্বর। ১৯৭১। সকাল ৫টায় রেলগাড়ীতে করে প্রায় ৫০/৬০জন সৈনিক সাথে একজন মেজর সহ ন্যাশনাল জুটমিল ঘিরে ফেলে। .... ঘোড়াশাল সেতুর পশ্চিম পাশে গাড়ী থামিয়ে মিছিল সহকারে প্রথমত গুলী করতে করতে পাক বাহিনী প্রবেশ করে। গুলীর শব্দ শুনে মিলের আশেপাশের লোকজন দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। কিন্তু পাক বাহিনী ওদিকে কোনো দৃষ্টিপাত করেনি। রাস্তার পাশে যেসব বাড়ীঘর ছিলো সেগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে মাত্র। অনুমান (মিলের) স্টাফের সংখ্যা দেড় শত জন ছিলো এবং তাদের পরিবার পরিজন সহ ৫০০ লোক। মেজর সবাইকে ডেকে শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম পাড়ে নিয়ে যায়। চক্ষু লাল করে ম্যানেজার সাহেবকে জিজ্ঞেসাবাদ করে এখানে মুক্তিবাহিনী আছে কিনা ? এবং স্টাফের সবাইকে মুক্তিবাহিনী বলে মেজর আখ্যায়িত করে। সহকারী ম্যানেজার সাহেব মেজরকে নানাভাবে তার স্টাফ মুক্তিবাহিনী নয় তা বুঝাতে চেষ্টা করেন এবং তার প্রমাণ দেন। ভোর ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে এসব কথা কাটাকাটি হয়। শেষ পর্যন্ত মেজর ব্যাপারটা বুঝতে সক্ষম হন। সহকারী ম্যানেজার সবাইকে তাদের স্ব স্ব কাজে লিপ্ত হতে আদেশ দেন। স্টাফের সবাই নিজ নিজ কাজে চলে যায়। মেজর ও তার সৈন্যরা মিল প্রদক্ষিণ করতে থাকে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো মুক্তিবাহিনীর অনুসন্ধান করা। অবশেষে আবার তারা গাড়ী করে রওয়ানা হয়। যখন তারা গাড়ীর দিকে ধাবমান

---

১৪৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৬২

www.bjilibrary.com

ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা হতে কে যেন দুটি গুলী করে। গুলীর শব্দ শুনে মেজর ও অন্যান্য সৈনিকরা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে এবং পুনরায় মিলের দিকে রওয়ানা হয়। আর কালবিলম্ব না করে অফিসার-স্টাফের প্রত্যেকের বাসায় উঠে যাকে যেভাবে দেখেছে সেভাবেই নৃশংসভাবে হত্যা করে।

গেটকিপার সহ অফিসার স্টাফের দু একজন ছাড়া সবাইকে হত্যা করে।"[১৪৪] রাজশাহী চারঘাটের আনসার কমাণ্ডার মোঃ আবদুর রাজ্জাক তার বক্তব্যে বলেন, "১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল পাক সৈন্যরা ৬০/৭০ খানা গাড়ী যোগে সারদা আসে। এবং অবশেষে সারদার পতন ঘটে। তারা এসেছে এ খবরে এবং তাদের দেখে সারদা এলাকার লোকজন আবাল বৃদ্ধ-বনিতা প্রাণের ভয়ে আত্মরক্ষার্থে চরে আশ্রয় নেয়। .... তারা চরে আশ্রয় নেয়া লোকদের একত্রিত করে। তাদের সংখ্যা ছিলো অন্যূন ১০০০/১৫০০। এদের মধ্যে আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ এবং সাধারণ মানুষ ছিলো। একত্রিত করা লোকগুলোকে জমা করা হলে তারা সারি করে সকলকে গুলী করে হত্যা করে। এক একটা দলকে ধরে এনে তারা গুলী করে হত্যা করে। ইতিমধ্যে আর একটি দল জমা হয়। তাদেরকে দিয়ে মৃত লাশগুলো জমা করে। অতপর তাদেরকে গুলী করে হত্যা করে। .... শেষাবধি দেহগুলোকে পেট্রল দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

তের দিন বন্দী অবস্থায় ছিলাম। এবং সে সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে, সারাদিন ধরে লোক জমা হতো এবং রাতে অস্ত্রশস্ত্র সহকারে একজন হাবিলদার এবং তিনজন সেপাই আসতো। তাদের সাথে মোটা দড়ি থাকতো। কাগজে নাম লিখা থাকতো। নাম ধরে ডাকতো এবং বলতো 'তোম খাড়া হো যাও'। খাড়া হয়ে গেলে পেছনে এ দড়ি দিয়ে কষে হাত বাঁধত এবং টেনে মাঠের মধ্যে নিয়ে যেত। .... তারপর শোনা যেত গুলীর আওয়াজ। যতগুলো লোক ধরে নিয়ে যেত ঠিক ততটি গুলী হতো।

বেত পেটানো তো নিয়মিতই ছিলো। প্রত্যেক দিন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ১৬২জন ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, মাস্টার সহ বিভিন্ন ধরনের লোককে অত্যাচার করতো। .... নামায পড়তে চাইলে তারা বলতো 'তোম লোগ কাফের হ্যায়, নামায কিউ পড়তা হ্যায় '? .... ৫ই সেপ্টেম্বরের সপ্তাহ খানেক আগে সামরিক আইনের ১৮ ধারা মতে চার্জশিট দাখিল করে। বিচার শুরু হওয়ার আগেই ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমায় ছাড়া পেয়ে যাই।"[১৪৫] বাগেরহাট বৈতপুর গ্রামের 'তাহমীনা বেগম (দিপালী) এর

---

১৪৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিল পত্র, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৬০

১৪৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিল পত্র, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–১০০-১০২

www.bjilibrary.com

সাক্ষ্য ঃ "২৪শে এপ্রিল পাক সেনারা কাড়াপাড়া হয়ে বাগেরহাট আসে। এসেই কাড়াপাড়া এলাকাতেই ১ শতের উপর লোককে হত্যা করে। .... শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে বাগেরহাট শহর এলাকাতে যত হিন্দু ছিলো কিছু হত্যা বাদে সবাইকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে। এরপর গ্রামের দিকে হাত বাড়ায়। গ্রামকে গ্রাম ধরে সবাইকে মুসলমান করতে থাকে। আমি আমার স্বামী, ছেলেমেয়ে, মা-বাবা, কাকা, কাকীমা তাদের ছেলেমেয়ে সবাই ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেই। কিন্তু রাজাকাররা এরপরেও অত্যাচার করতে ছাড়েনি। এরপরও অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে। ২২শে আশ্বিন রাত তিনটার দিকে ৫০/৬০জন রাজাকার আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেলে। প্রথমে তারা মুক্তি বাহিনী পরিচয় দিয়ে থাকতে চায় রাতের মত। ..... প্রথমে আমার ভাই প্রদীপ গুহ দেখেই চিনেছিল তারা রাজাকার। তাই সে ছাদ দিয়ে গাছ বেয়ে পেছনে নামার চেষ্টা করেছে। উপর থেকে নিচে নামলেই রাজাকাররা ধরে ফেলে। ওকে কিছুদূর নিয়ে গিয়ে বেয়নেট দিয়ে গলা কেটে হত্যা করে। তারপর বাবা, কাকা এবং পাশের তিনজনকে কিছুদূর নিয়ে গিয়ে গুলী করে মাথা উড়িয়ে দেয়। হত্যা করে বাড়ীঘর লুট করে চলে যায়। আমরা যারা বেঁচে ছিলাম বাগের হাট শহরে চলে আসি। বাড়ীতে কেবল একজন কৃষাণ এবং আমার ৭০ বছরের বৃদ্ধা দিদিমাকে রেখে আসি। ...."[১৪৬] যশোর জেলার কচুয়াবিল গ্রামের আইনুল হক বলেন, "কচুয়াবিলে পাক মিলিটারী ক্যাম্প ছিল। সেখানে প্রায় ১০০জন লোককে জ্যান্ত কবর দেয়া হয়। যে ১০০জন লোককে জ্যান্ত কবর দেয়া হয়, প্রথমে তাদেরকে দুপা এবং দুহাত রশি বা দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা আম গাছের ডালে পা উপর দিকে ঝুলিয়ে রেখে লাঠি দিয়ে ও বন্দুকের বাঁট দিয়ে শুধু শরীরের বিভিন্ন জোড়ায় মারতে থাকে। তাদের উপর দৈহিক পীড়ন করার পর একটা গর্তের মধ্যে নিয়ে ফেলে রেখে মাটি চাপা দিয়ে চলে আসতো। ...... এভাবে ১৫/২০টা গর্তে ১০০ জনকে জ্যান্ত কবর দিয়েছে।"[১৪৭] ঝালকাঠির ছাচলেপুর গ্রামের সুধারাণী বসু বলেছেন, "১৩৭৮ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ঝালকাঠি থানার ১৪জন বাঙালী পুলিশ স্থানীয় শান্তি কমিটির দালালসহ ছাচলেপুর গ্রামে অপারেশনে যায়। সকাল বেলা পুলিশগণ আমার পিতার বাড়ী আক্রমণ করে এবং জ্বালিয়ে দেয়। আমরা সবাই নিকটস্থ জংগলে পালিয়ে যাই। আমি আমার বড় মেয়ে রমাবতি বসুকে নিরাপত্তার জন্যে মোতাহার

---

১৪৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৪০।
১৪৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৬।

www.bjilibrary.com

গোমস্তার বাড়ীতে রেখে দিই। পুলিশরা পরে উক্ত বাড়ীতে গিয়ে মোতাহারের সাহায্যে আমার মেয়ে এবং অপর দুজন মেয়ে কমলা রাণী দাস (১৭) ও কল্পনা রাণী দাস (১৮)-কে ধরে নিয়ে যায়। পরে মেয়েদের খুঁজতে গিয়ে দেখি কমলা ও কল্পনাকে গুলী করে বিষখালী নদীর পাড়ে হত্যা করেছে এবং রমাকে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করেছে। এছাড়া আমার আত্মীয় দুর্গা শংকর দাসকেও গুলী করে হত্যা করে। উক্ত মেয়েদের নৃশংসভাবে হত্যা করে এই পুলিশ বাহিনী। থানা হতে পুলিশরা বিভিন্ন গ্রামে অপারেশন চালিয়ে নিরীহ লোকদের ধরে নিয়ে গিয়েছে এবং রাত তিনটের দিকে তাদের হাত বেঁধে দলবদ্ধভাবে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। .... আমি থানা হতে বহু মানুষের চিৎকার ও করুণ আর্তনাদ শুনেছি। কাউকেই রক্ষা করেনি। .... একদিন প্রায় ৯৫জন নিরীহ মানুষকে ধরে নিয়ে এসে হত্যা করে। প্রত্যেক দিন ধৃত ব্যক্তিদের নাম জিজ্ঞেস করতো, কিন্তু সেই দিন তাদের সবাইকে নিয়ে গিয়ে লাইন করে হত্যা করেছে। সকালে একজন পুলিশ এসে তৎকালীন সি. আই (পুলিশ)-কে জানায় যে, ৯৫জনের মধ্যে একজন জীবিত আছে। তখন উক্ত সিআই উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। ....”[১৪৮] এ পর্যায়ে সর্বশেষ যে কাহিনীর উল্লেখ করবো, সেটা ফটিকছড়ির কাঞ্চন নগর গ্রামের। ঐ গ্রামের মোঃ সফিকুর রহমান বলেছেন ঃ

“২১/১১/’৭১ তারিখে প্রায় ২০০জন পাক বাহিনী আমাদের এলাকায় প্রবেশ করে। তার ভেতর ১০/১৫জন পাক বাহিনী এসে আমাকে সহ আরো ৪০০ লোককে ডেকে জমায়েত করে। প্রথম অবস্থায় তারা আরো কয়েকবার আমাদের এলাকায় আসে, তখন তারা কাউকে কিছু বলেনি। সেই জন্যে তাদের ডাকে সবাই জমায়েত হয়। তারপর সেখান হতে বেছে বেছে প্রায় ২০০ জোয়ানকে লাইন করে। তারপর আমাদের কলেমা পড়ার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়। তারা আমাদের একথাই বার বার জিজ্ঞেস করেছে যে, তোমাদের ভিতর কোনো মুক্তি বাহিনী বা হিন্দু আছে কিনা। এ সময় আমাদের লাইন হতে একটি ছেলে হিন্দু বলে স্বীকার করে। তখন তাকে বেয়নেট দিয়ে নানা জায়গায় কেটে হত্যা করা হয়। এমন সময় উত্তর দিক হতে পাক বাহিনী আরো নয়জনকে ধরে আনে। তাদেরকে আমাদের পাশে ২০ গজ দূরে গুলী করে হত্যা করে। তারপর আমাদের গুলী করার জন্যে প্রস্তুত হতে বলে। এমন সময় ৭নং ইউনিয়নের

১৪৮। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৩১৮-৩১৯।

www.bjilibrary.com

রাজাকার কমাণ্ডার আমাদের ভাল প্রমাণ করাতে পাক বাহিনী আমাদের গুলী না করে চলে যায়।"[১৪৯]

তৃতীয় পর্যায়ে আসছে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পরবর্তী হত্যাকাণ্ডের কথা। এ হত্যা কাণ্ড ব্যাপকতা ও বৈচিত্রের দিক দিয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ছিল। আত্মবিনাশী এ হত্যাকাণ্ডে বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধারা মেরেছে পরাজিত বিহারী, রাজাকার ও শান্তি কমিটি এবং ক্ষেত্র বিশেষে নিরপরাধ ইসলামপন্থীদের। এরপর আওয়ামী লীগ বিরোধী বামপন্থীদের মেরেছে আওয়ামী লীগপন্থী মুক্তি যোদ্ধাদের এবং সরকার মেরেছে বিরোধী বামপন্থীদের। বিহারী, রেজাকার ও শান্তি কমিটির লোক হত্যার কোনো প্রকাশিত বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। তাদের হত্যা তখন কোনো নিউজ ছিল না, তাই সেগুলো কোনো সংবাদপত্রে আসেনি। কোনোভাবে কোনো লেখায় এগুলো কেউ সংরক্ষণও করেনি, অন্তত তা এখনও প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং জাতীয় ইতিহাসের এ হত্যাকাণ্ডের অংশটা ভাবী প্রজন্মের কাছে অনুদ্‌ঘাতি, অজানাই থেকে যাবে। জাতীয় ইতিহাসের ধারাবাহিকতার স্বার্থেই এ অন্ধকার অধ্যায় দিনের আলোতে আসা প্রয়োজন। জাতির জানা প্রয়োজন, স্বাধীনতা যুদ্ধের হত্যা, ধ্বংস ও লুটে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত জাতি কিভাবে স্বাধীনতা পরবর্তী দিনগুলোতে আরেক হত্যা, ধ্বংস ও লুটের মুখোমুখি হলো। এ ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হলে দেখা যেত এ হত্যাকাণ্ডেও দেশপ্রেম খুব অল্প ক্ষেত্রেই আছে, ব্যক্তিগত ঈর্ষা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, লোভ ইত্যাদিই এ ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের কারণ হিসেবে কাজ করেছে।[১৫০] আওয়ামী লীগ বিরোধী বামপন্থী ও মুক্তিযোদ্ধারা আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগপন্থী মুক্তিযোদ্ধাদের উপর যে হত্যাকাণ্ড চালায়, তার খবর সে সময়ের পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে।[১৫১] এ হত্যাকাণ্ড যে উদ্বেগজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, তা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের বক্তব্য থেকেও সুস্পষ্ট হয়ে যায়। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারীতে জাতীয় সংসদে শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনী উত্থাপন সম্পর্কিত বক্তৃতায় শেখ মুজিব বলেন ঃ

---

১৪৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৩৩৮

১৫০. "১৯৭২ সন হতে ১৯৭৪ সনের শেষ পর্যন্ত সারাদেশ ব্যাপী যুবকদের মধ্যে যে হানাহানি, গুপ্ত হত্যা প্রভৃতি চলেছিল তার অধিকাংশই হলো লুটলব্ধ অর্থের ভাগাভাগি ও ঘরের দখল নিয়ে।"–বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ, মোঃ আবদুল মোহাইমেন, পৃষ্ঠা–২২।

১৫১. এই ব্যাপক রাজনৈতিক হত্যার কাহিনীও সংগৃহীত আকারে জাতির সামনে আসেনি।

www.bjilibrary.com

"মাননীয় স্পীকার...................দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আপনার এ এসেম্বলি বা সংসদের চারজন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের আগে হত্যা করা হয়েছে-যাঁরা কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলির মেম্বার ছিলেন। হত্যা করা হয়েছে গাজী ফজলুর রহমানকে, হত্যা করা হয়েছে নূরুল হককে, হত্যা করা হয়েছে মোতাহের মাস্টারকে। এমনকি নামাযে-ঈদের জামাতে নামায পড়তে গেলে সেই নামাযের সময়ে একজনকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। যা কোনো দিন আমাদের দেশে শুনিনি। হাজার হাজার কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের হত্যা করা হয়েছে যাঁরা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাঁদের হত্যা করা হয়েছে যাঁরা স্বাধীনতার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের হত্যা করা হয়েছে যাঁরা ২৫ বছর এ বাংলাদেশে পাকিস্তানী শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন। অত্যাচার সহ্য করেছেন।......গোপনে গোপনে তারা অস্ত্র জোগাড় করেছেন এসব অস্ত্র দিয়ে-যাদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়েছি আমরা, যারা অস্ত্র দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করেছে, তাদের হত্যা করেছেন ঘরের মধ্যে যেয়ে।"[১৫২]

আওয়ামী লীগের সাথে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণেই এ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটে। এর বীজ বপিত হয় স্বাধীনতা যুদ্ধকালে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতমুখী আওয়ামী লীগের নীতি অবস্থানকে সিরাজ সিকদার, তোয়াহা-হক প্রভৃতি গ্রুপরা সহ পিকিংপন্থী ন্যাপ সাধারণভাবেই গ্রহণ করতে পারেনি এবং আওয়ামী নেতৃত্বে আনা স্বাধীনতাকেও তারা স্বাধীনতা মনে করেনি। এ মনোভাবেরই ফল ছিল স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের সাথে তাদের সংঘাত। তারই এক রূপ ছিল প্রতিপক্ষ ও শ্রেণী শত্রু নির্মূলের মত রাজনৈতিক হত্যা।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মতপার্থক্যজনিত বিরোধের উত্তর ফল হিসেবেই আওয়ামী লীগ বিরোধী মুক্তিযোদ্ধা ও বামপন্থীরা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক হত্যার শিকারে পরিণত হয়। এ হত্যা কাণ্ড রাষ্ট্রশক্তি এবং আওয়ামী লীগের দলীয় শক্তি ব্যবহার করা হয়। "আওয়ামী লীগ শাসনামলে যেসব প্রকাশ্য ও গোপন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সরকার ও তার নীতির বিরোধিতা করেছে, সেসব দলের মতে সে আমলে ২৫ হাজার ভিন্ন মতাবলম্বীকে হত্যা করেছে আওয়ামী লীগ। এ হতভাগাদের হত্যা করা হয়েছে চরম নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার মধ্য দিয়ে—যে নৃশংসতা অনেক ক্ষেত্রে পাকিস্তানী সৈন্যদেরও

১৫২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য, গাজী শামছুর রহমান, পৃষ্ঠা-৬২২-৬২৩।

www.bjilibrary.com

ছাড়িয়ে গেছে। খুন, সন্ত্রাস, নির্যাতন, হয়রানি, নারী ধর্ষণ, লুণ্ঠন কোনো কিছুই বাদ রাখা হয়নি।"[১৫৩] এ হত্যা কাণ্ডের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাওলানা ভাসানীর পত্রিকা 'হক কথা' লিখে ঃ "একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা বিশেষ প্রোগ্রামে এ দেশে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের হিসেব হলো, বাংলাদেশে সোয়া লক্ষ বামপন্থী কর্মীকে হত্যা করতে হবে। তা না হলে শোষণের হাতিয়ার মজবুত করা যাবে না।"[১৫৪] সেই সময়ের পরিস্থিতির কয়েকটা দৃষ্টান্ত ঃ

"পুরো কিশোরগঞ্জ জেলায়ই ব্যাপক হত্যা কাণ্ড ও সন্ত্রাস হয়েছে, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী হয়েছে বাজিতপুরে। বাজিতপুরে ১২৬জনকে রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাদীরা হত্যা করেছে। .... চুয়াত্তরের প্রথম থেকে পঁচাত্তরের আগস্ট পর্যন্ত ছয়চিড়া, দীঘির গাঁও, বালিয়ার গাঁও, দুলালপুর, গুরুই প্রভৃতি এলাকা ছিল বিরান ভূমি। দল বেঁধে রক্ষীবাহিনী ও মুজিববাদীরা গ্রামে আসতো। লোকজনকে দাঁড় করিয়ে অকথ্য নির্যাতন করতো। হাত পা বেঁধে উল্টো করে নাকে গরম পানি ঢেলেছে বহু লোককে। মহিলাদেরও রেহাই দেয়নি।

পিরোজপুরের আমিনার সারা গায়ে কম্বল জড়িয়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। বালিগাঁয়ে আকবরকে ধরতে না পেরে তার মা'র উপর নারকীয় অত্যাচার করেছে। রাজনীতি করতো না এমন বহু লোককেও তারা হত্যা এবং অত্যাচার করেছে। সবারচরে 'টাইগার হোল' নামক একটি নির্যাতন ক্যাম্প করেছিল তারা। আলো-বাতাসহীন সেই গর্তে দিনের পর দিন লোকজনকে আটক রেখে নির্যাতন করতো। ইকোরাটিয়ার রশিদকে তার বাপের সামনে গুলী করে হত্যা করে। তার বাবা আবদুল আলীর হাতে কুঠার দিয়ে বলেছে তার ছেলের মাথা কেটে দিতে। নির্যাতনের এক পর্যায়ে আবদুল আলী বাধ্য হয়েছে ছেলের মাথা কেটে দিতে। সেই মাথা দিয়ে ফুটবল খেলেছে মুজিববাদীরা। ইউসুফকে হত্যা করার পর তার লাশ গাছে তিন দিন টানিয়ে রেখেছে। ফারুক ধরা পড়েছিল খাগড়ায়। সেখানকার মুজিববাদীরা তাকে বাজিতপুর মুজিববাদীদের হাতে তুলে দেয়। আওয়ামী লীগ অফিসে তাকে নিমর্মভাবে পিটাতে পিটাতে হত্যা করা হয়েছে। ...... মাহবুবকে হত্যা করা হয় থানা থেকে নিয়ে। মাহবুবের এক একটি করে অংশ কেটে

১৫৩. ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ, আহমদ মূসা, পৃষ্ঠা-৫
১৫৪. হক কথা, ২৬শে মে, ১৯৭২ (ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ, পৃষ্ঠা-৩৭।

www.bjilibrary.com

লবণ-মরিচ মাখিয়ে ধীরে ধীরে হত্যা করেছে। তার কাটা হাত পা ও মাথা তার আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়ে বলেছে মুজিববাদের বিরুদ্ধে রাজনীতি করলে এ অবস্থা হবে। হেমায়েতপুরের নূরুল ইসলামকে ধরে বুকে মই দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে নারকীয়ভাবে হত্যা করেছে মুজিববাদীরা।"[১৫৫]

"১৯৭৩ সালের আগস্ট মাস হবে। উত্তর রামভদ্রপুর (শরিয়তপুর জেলা) গ্রামে রক্ষীবাহিনী এলো। মুক্তিবাহিনীর ফজলু ও আমাদের দলের সমর্থক কৃষ্ণ ধরা পড়লো তাদের হাতে। প্রথমে খুব মারলো তাদের। কৃষ্ণ ছিল স্কুল শিক্ষক। রক্ষী বাহিনীর কাছে পানি খেতে চেয়েছিল কৃষ্ণ, রক্ষীরা তাকে প্রস্রাব খেতে দিয়েছে। কাহিল ও বিধ্বস্ত কৃষ্ণ উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। একজন রক্ষীবাহিনী বললো, 'আমার সোনার বাংলা' গাইতে জান ? কৃষ্ণ বললো, হাঁ জানি। 'গাও তাহলে'। কৃষ্ণ কাঁদতে কাঁদতে গাইল। ..... ধরে নিয়ে গেল তাদের। আর ফিরে আসেনি তারা। পরে আমি যখন রক্ষী বাহিনীর হাতে ধরা পড়লাম, তখন তাদের মুখেই শুনলাম, ধরে আনার সময়ই তাদের এমন মার দিয়েছে যে, পথেই মরে গেছে। ৬ই ফেব্রুয়ারী ('৭৪) রাত্রি ভোর না হতেই রক্ষীবাহিনী আমাকে ঘুম থেকে তুললো। আমাকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে এলে দেখলাম রীণাও রয়েছে। আমাদের নিয়ে তারা রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওনা হলো। রাস্তায় রীণার প্রতি তারা অশ্লীল উক্তি করছিল। আমরা ক্যাম্পে আসতেই অনেক রক্ষীবাহিনী এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো। কেউ অশ্লীল মন্তব্য করে, কেউ চুল ধরে টানে, কেউ চড় মারে। কেউ খোঁচা দেয়, এমনি সব বর্বরতা। কিছুক্ষণ পর আমাদের রৌদ্রের মধ্যে বসিয়ে রেখে তারা চলে গেল। সন্ধ্যায় আমাদের একটি কামরায় ঢুকালো। অনেক রাত রীণাকে তারা উপরে দোতলায় নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরই শুনলাম রীণার হৃদয়বিদারী চিৎকার। প্রায় আধ ঘণ্টা পর আর্তনাদ স্তিমিত হয়ে গেল। নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকার ভেদ করে ভেসে আসছিল শুধু বেতের ক্ষীণ সপাং সপাং শব্দ আর পাশবিক গর্জন। আমাকে ও রীণাকে এক সাথে ঝুলিয়ে দিয়ে রীণার বস্ত্র খুলে নেয়। তারপর দুজনকে চাবুক মারতে থাকে। জ্ঞান হলে দেখি, আমরা উভয়ই মেঝেতে পড়ে আছি। রীণার সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে। আমার গায়ে কাপড় থাকায় অপেক্ষাকৃত কম আহত হয়েছি।

১৫৫. 'বাজিতপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাম্যবাদী দলের নেতা সাইফুল ইসলামের জবানবন্দী, 'ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ', আহমেদ মুসা, পৃষ্ঠা-৫৬, ৬৫, ৬৬।

www.bjilibrary.com

নয় তারিখ দুপুরের অল্প পরে তারা হনুফা, রীণা ও আমাকে নিয়ে গেল পুকুরের ধারে। সেখানে আমাদের এক দফা বেত দিয়ে পিটিয়ে চুবানোর জন্যে পানিতে নামাল। প্রথম আমাদেরকে ওরাই সাঁতরাতে বাধ্য করলো। আমরা শ্রান্ত হয়ে কিনারায় উঠেতে চেষ্টা করি, ওরা আমাদের বাঁশ দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়। পরিশ্রান্ত হয়ে যখন আমরা আর সাঁতরাতে পারছিলাম না, তখন পানি থেকে তুলে আবার বেত মারতে থাকে। শেষের দিকে আমরা আর সাঁতরাতে পারছিলাম না। তখন তারা আমাদের পানিতে ডুবিয়ে আমাদের দেহের উপর দুপা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। এভাবে তিন দফা আমাদের চুবানো ও পেটানো হয়। কিছুক্ষণ আগেই করিম মারের চোটে মরে গেছে। আমাদের সাথে আর একটি অল্প বয়স্ক যুবককে চুবিয়ে অচেতন করে ফেলেছিল। তাকে ঘাটলার উপর ফেলে রাখে। আমার আঁচল দিয়ে গা মুছাবার সময় ছেলেটি চোখ মেলে তাকায়। 'মা, আপনি কে' বলে করুণ কণ্ঠে ডেকে ওঠে। আমি চোখের জল রাখতে পারলাম না। রক্ষীরা তাকে সরিয়ে নিয়ে যায়, পরে শুনেছি, ছেলেটিকে নাকি মেরে ফেলেছে।............"[১৫৬]

"............. কেদারপুরে ঘটে আরো মর্মন্তুদ ঘটনা। ....

.... রক্ষী বাহিনী এসে বিপ্লবকে প্রথম খুব মারধোর করলো। .... খুব মেরে বিপ্লবের মা ও বাবাকে ডাকিয়ে আনলো। তারপর বিপ্লবকে বললো, 'কলেমা পড়'। বাধ্য হয়ে বিপ্লব হিন্দু হয়েও কলেমা পড়লো। এরপর বললো, 'সেজদা দাও পশ্চিম মুখী হয়ে।' ভয়ে বিপ্লব তাই করলো। যখন সেজদা দিল, পেছন থেকে বেয়োনেট চার্জ করে বাবা-মা ও অনেক লোকের সামনে হত্যা করলো তাকে। বেয়োনেট চার্জ করার সময় রক্ষীদের একজন বললো, মুসলমান হয়েছো, এবার বেহেশতে চলে যাও।' ...... আমার সাথে যে ৪০জনের মতো ছেলে রাজনীতি করতো তারা সবাই ছিল ব্রিলিয়ান্ট, ফার্স্টক্লাশ পাবার মতো ছেলে। শুধু বেঁচে আছি আমি ও আরেকজন। বাকি সবাই রক্ষী বাহিনী, মুজিব বাহিনী ও মুজিবের অন্যান্য বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে গৌতম দত্তকে গ্রেফতার করা হয় ঢাকায় এবং হত্যা করা হয় ঝাটুবুলিতে তার নিজের বাড়ীতে নিয়ে। ...... রশীদকে হত্যা করা হয় রামভদ্রপুরে নিয়ে।

ডামুড্যার আতিক হালদার, ধনুই গ্রামের মোতালেব এদেরকেও

---

১৫৬. প্রখ্যাত বামপন্থী নেতা শান্তি সেনের স্ত্রী অরুণা সেনের বিবৃতি, ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ, আহমদে মূসা, পৃষ্ঠা-৭০, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭।

www.bjilibrary.com

তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আত্মীয়স্বজনের সামনে হত্যা করা হয়। পঁচাত্তরের প্রথম দিকে মোহর আলীকে ধরেছিল পুলিশে। শিবচর থেকে তাকে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তার শরীরের চামড়া খুলে লবণ মাখিয়ে তাকে হত্যা করা হয় এবং তার লাশ ডামুড্যা বাজারে টানিয়ে রাখা হয় কয়েকদিন।.....আঘাত এলো সিরাজ সরদারের উপর। তিনি পালিয়ে গিয়ে সিরাজ সিকদারের বাহিনীতে আশ্রয় নিলেন। সিরাজ সিকদার তাকে চারজন গার্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। একদিন শওকত আলীর বাহিনী বিনোদপুর (শরিয়তপুর) এক বৈঠকের নাম করে তাকে ডেকে নিয়ে এলো। এরপর ঘেরাও করে প্রথমে তারা সিরাজ সিকদারের দেয়া চারজন গার্ডকে হত্যা করলো। আর সিরাজ সরদারকে নিয়ে এলো নদীতে। নৌকার মাঝির বর্ণনা মতে, প্রথমে তারা সিরাজ সরদারের হাতের কবজি কাটল, তারপর পা ও অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ কেটে এবং শরীরের মাংস কেটে টুকরো টুকরো করে নদীতে ফেলে দিলো।"[১৫৭]

"কালিগঞ্জ থেকে সাত মাইল দূরে কালা বাজারের কাছে রক্ষী বাহিনীর যে ক্যাম্প ছিল সেখানে শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর গণ কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। বহু ছেলেকে ধরে এনে এখানে হত্যা করা হয়েছে। বামপন্থীদের হত্যা করার জন্যে রক্ষী বাহিনী এখানে চাতুরীর আশ্রয় নিতো। তারা লোক মারফত বামপন্থী ছেলেদের বল খেলার জন্যে আহ্বান জানাত। খেলা শেষে চায়ের নিমন্ত্রণ করতো। এরপর চোখ বেঁধে নিয়ে যেত বধ্যভূমিতে। ...."[১৫৮] "সিরাজগঞ্জ শহরেই মুজিববাদীদের নির্যাতন ক্যাম্প ছিল ৪টি। লোক হত্যার জন্য মুজিবাদীদের বাঁধা জল্লাদ ছিল সমর ও শংকর।......মুজিববাদীরা প্রথম ধাক্কায় হত্যা করে শ্রমিক নেতা মোকাদ্দেস, তোয়াহা গ্রুপের মনিরুজ্জামান এবং জাসদের নজরুলও বদরুলকে। ..... মুক্তিযোদ্ধা সেলিম ও সালামকে পাবনায় নিয়ে গিয়ে এসিড দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। শাহজাদপুরে হেলাল, কুরবান, ছগির, দীলিপ, প্রভৃতিকে হত্যা করা হয় গুলী করে। ছলিম ও মতিনকে একইভাবে ....। কারো কারো মাথা ইট দিয়ে ছেঁচে গুড়িয়ে দিয়েছে। .... সিরাজগঞ্জে ১৯৭৩ সালেই শ' পাঁচেক বামপন্থী ও জাসদ কর্মী মুজিব বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিল বলে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছিল। পুরো মুজিব আমলে এখানে নিহতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে। .... এলাকার মানুষ এক

১৫৭. বামপন্থী নেতা শান্তি সেনের বর্ণনা, ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ, আহমদে মূসা, পৃষ্ঠা-৮৩, ৮৫, ৯১।

১৫৮. কালিগঞ্জের কম্যুনিস্ট নেতা ওয়াজেদ আলীর ছোট ভাই মনিরুল হকের বর্ণনা, ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ, পৃষ্ঠা-৯৩।

www.bjilibrary.com

ভয়ানক দুঃস্বপ্নময় সময় অতিবাহিত করেছেন তখন। প্রভাবশালী আওয়ামী নেতার ভাই নিজে ক্যাম্প চালাত। সেখানে মানুষ হত্যা ছাড়াও যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে স্ফূর্তি করতো। কোনো সুন্দরী মেয়ে তাদের চোখে পড়লে তার বাপকে নির্দেশ দেয়া হতো মেয়েকে রাতে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিতে। নির্দেশ অমান্য করলে মৃত্যু ছিল অবধারিত। .... যুবকরা ছিল তাদের বন্দুকের খোরাক এবং যুবতীরা লালসার।"[১৫৯] ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনসিংহ জেলার মধ্যখানে অবস্থিত। ....আওয়ামী লীগ আমলে থানা সদরে একটি মাত্র কলেজ ছিল। ......এ কলেজের শতকরা ৩৩জন শিক্ষার্থী আওয়ামী লীগ আমলে নিহত হয়। এ আমলে এ থানার একটি মাত্র বালিকা বিদ্যালয়, ১টি উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের অভাবে প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল। .... ছেলেরা স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। অভিভাবকরা জানান, ভয়ে তাদের ছেলেদের বইপত্র মাটির নীচে গর্ত করে লুকিয়ে রেখে ছাত্র পরিচয় গোপন করা হতো। .... বৃদ্ধ বাপ খুব ভোরে উঠে চোখ কচলে তার উঠানে দেখলেন, কয়েকদিন আগে রক্ষী বাহিনী কর্তৃক ধৃত ছেলের বিকৃত লাশ। অথবা একটা গাঁয়ের মানুষ অবাক হয়ে দেখল, তাদের চৌরাস্তার মোড়ে পাঁচটা বীভৎস অপরিচিত লাশ পড়ে আছে। অথবা তারা দেখলো, স্কুলের সামনে জাম গাছে পা বাঁধা অবস্থায় উল্টাভাবে ঝুলছে এক তরুণের লাশ। তৎকালে এটা ঈশ্বরগঞ্জ থানার জনবহুল এলাকাগুলোর একটা প্রাত্যহিক দৃশ্য। .... চলতি ট্রাকের পেছনে বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে হত্যা করার মতো মারাত্মক ঘটনাও ঘটেছে। অনেক জায়গায় রক্ষী বাহিনী লাশ ফেলে সাদা কাগজে 'স্বাক্ষর বিহীন আদেশনামা লাশের পাশে রেখে আসতো। ইসলামপুর মাদ্রাসার কাছে এক জায়গায় তিনটা লাশের পাশে এ রকম স্বাক্ষর বিহীন আদেশনামা পাওয়া যায়। এ আদেশে স্থানীয় জনগণের উদ্দেশ্যে লাশগুলো পুঁতে ফেলার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছিল

রাজীবপুরের হাশেমকে মারার দিন মধুপুর বাজারের আশেপাশের গ্রামের প্রতিটি বাড়ীতে তাকে ঘুরিয়েছে। প্রতিটি বাড়ীর সামনে হাশেমকে দিয়ে বলিয়েছে, "আমাকে মধুপুর স্কুলের মাঠে আজ বিকেল পাঁচটায় গুলী করে মারা হবে–আপনারা সবাই আসবেন।" নিজের মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে হতভাগ্য হাশেম। তবুও সে রক্ষী বাহিনীর বেয়োনেটের খোঁচা সহ্য করতে না পেরে তাদের শেখানো বুলি তোতা

১৫৯. বামপন্থী ছাত্র নেতা মোহন রায়হানের বর্ণনা, ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ, পৃষ্ঠা–১০৭-১০৮।

www.bjilibrary.com

পাখির মতো আউড়ে গেছে। এ দিন পাঁচটায় হাশেমকে মধুপুর স্কুলের মাঠে গুলী করে হত্যা করা হয়েছিল। রক্ষী বাহিনীরা ছাড়াও সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের সদস্যরা অনেককে প্রকাশ্যে হত্যা করেছে। ...... সন্ত্রাস তারা সৃষ্টি করতে পেরেছিলও। মানুষ কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল। সন্ধ্যার সাথে সাথে জনপদ হয়ে যেতো মৃতপুরীর মতো নীরব। সবাই আতংকে থাকতো কে কখন লাশ হয়ে যায়।"[১৬০]

সেই সময়ের ভয়াবহ অবস্থার চিত্র বিদেশী পত্র-পত্রিকাতেও প্রতিফলিত হয়। কোলকাতার 'ফ্রন্টিয়ার (Vol-B No-2) লিখে ঃ "বাংলাদেশের রাজনীতি এতটা একদলীয় হয়ে গেছে যে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টের অভিযানের অস্ত্র হচ্ছে তার গুপ্ত পুলিশ ও আধা সামরিক মিলিশিয়া রক্ষীবাহিনী। তারা গ্রাম বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে।...... ময়মনসিংহ জেলার একটি থানাতেই (নান্দাইল) শত শত তরুণ চাষী ও ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে।...... প্রত্যক্ষদর্শীর হিসাব মতে, রক্ষীবাহিনী গত জানুয়ারীতে এক ময়মনসিংহ জেলাতেই অন্তত এক হাজার ৫শ' কিশোরকে হত্যা করে।...... এমনকি, অনেক বাঙালী যুবক যারা রাজনীতিতে ততটা সক্রিয় ছিল না, তারাও এ সন্ত্রাসের অভিযানে প্রাণ হারিয়েছে।" 'শিকাগো ডেইলী নিউজে' জো গাণ্ডেলম্যান পাঠানো রিপোর্ট ঃ 'জাতির পিতা'র নামে রক্ষীবাহিনী ব্যাপক উৎপীড়ন ও হত্যা কাণ্ড চালিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়।......বাঙালীরা বলেন, গোপনে সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপক অভিযান চালানো হচ্ছে। পাকিস্তানী আমলে যা করা হতো তা এ থেকে আদৌ তফাৎ নয়। একমাত্র রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে লোকজন মুখ খুলে কথা বলে। ঢাকায় অবস্থানরত জনৈক ভারতীয় সাংবাদিক যেমন বলেছেন, 'ঢাকায় বিখ্যাত প্রেস ক্লাবে যারা সব রকম বিষয়ে কথা বলতেন এখন তারা শুধু আবহাওয়া, কানাডা এ ধরনের বিষয়ে কথা বলেন।"[১৬১] নিউজ উইক বলে, "রক্ষী বাহিনী নামক একটি আধা সামরিক বাহিনী পুনরায় নির্যাতন এবং হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে। বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বলতে যেয়ে আজো পাকিস্তানী আমলের মতই জনগণ ভয়ে কেঁপে ওঠে। ....[১৬২] দৃষ্টান্তের এখানেই শেষ নয়। এ রকম শত শত দৃষ্টান্ত, বর্ণনা, বিবরণ, কাহিনী সেই সময়ের দেশীয় সংবাদপত্রেও

---

১৬০. ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ, আহমেদ মূসা, পৃষ্ঠা-১১১, ১১৪, ১১৫, ১১৬।
১৬১. শিকাগো ডেইলি নিউজ, ২৩শে জুন, ১৯৭৫।
১৬২. নিউজ উইক, ১৫ই জুলাই, ১৯৭৫।

www.bjilibrary.com

ছড়িয়ে আছে। সে সবের একটা অংশকেও এখানের স্বল্প পরিসরে সামনে আনা সম্ভব নয়। কি ঘটেছিল তার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য যা এখানে তুলে ধরা হলো তা-ই যথেষ্ট।

চার

স্বাধীনতা উত্তরকালের এ বিভিন্নমুখী হত্যা কাণ্ড, স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ন' মাসের গণ হত্যা এবং পঁচিশে মার্চ পূর্ববর্তী হত্যা কাণ্ডের সূচনা পর্বে আমাদের আত্মবিনাশী যে রূপ আমরা দেখি তার চরিত্র একই। সংকীর্ণ স্বার্থ, প্রচণ্ড রাজনৈতিক ঈর্ষা ও বিদ্বেষই এসব ঘটনার পেছনে শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। বিহারীরা বাঙালীদের উপর চড়াও হওয়া এবং বাঙালীরা বিহারীদের উপর হত্যা কাণ্ড চালানো, জনগণের রায় উপেক্ষা করে বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে উল্টো তাদের উপরই গণ হত্যা চালানো, যুদ্ধোত্তরকালে যুদ্ধ বিজয়ী ক্ষমতাসীন শক্তি পরাজিত ও প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির উপর হত্যা সন্ত্রাসের স্টীমরোলার চালানো, ক্ষমতাসীন বিজয়ী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী বামশক্তির অসম-অসমীচীন যুদ্ধ ঘোষণা এবং আওয়ামী লীগ দুঃশাসনের প্রতিবাদকারী জাসদ ও বামশক্তির উপর দেশ ব্যাপি হত্যাযজ্ঞ চালালো—এসব কিছুর মূলে ঐ সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তা এবং রাজনৈতিক ঈর্ষা বিদ্বেষই সক্রিয় ছিল, কোনো জাতি প্রেম নয়, দেশ প্রেম নয়। এই চরিত্র সেদিন এমনভাবে এমন সব ঘটনার জন্ম দেয় যা জাতিকে বিভ্রান্তি, বিতর্ক, পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতা এবং দেশ ত্যাগ ও শত্রুর উপর নির্ভরশীলতার এমন এক অন্ধকার গলিতে ঠেলে দিল, যখন জাতির স্বাধীনতার মত প্রশ্নেও জাতির মত-বিভক্তি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। এ মত-বিভক্তি স্বাধীনতার পরেও রক্ত ঝরায়, হাজার হাজার মানুষ মর্মান্তিক হত্যা কাণ্ডের শিকার হয় বিদেশী হানাদারমুক্ত স্বাধীন পরিবেশেও। যদিও সেই প্রবল বিভ্রান্তি-বিতর্কের এখন অবসান ঘটেছে। তবু কিন্তু ঐ মত-বিভক্তির একটা বিকৃত প্রচ্ছায়া জাতিকে এখনও তাড়া করে ফিরছে, যন্ত্রনা দিচ্ছে। এ বিকৃত প্রচ্ছায়াকে যে চেতনার নামে যারাই বয়ে বেড়ান না কেন, এর মূলেও জাতি-প্রেমহীন, দেশ-প্রেমহীন এবং সংকীর্ণ স্বার্থ ও রাজনৈতিক ঈর্ষা বিদ্বেষ জাত সেই আত্মবিনাশী প্রবণতাই শক্তি হিসেবে সক্রিয় রয়েছে। যার বিনাশের মধ্যে জাতির ঐক্য, সমাজের শান্তি ও স্বস্তি এবং এমনকি দেশের স্বাধীনতাও নির্ভর করছে।

www.bjilibrary.com

পরিশিষ্ট

১. আইন কাঠামো আদেশ, ১৯৭০

২. ইয়াহিয়ার পয়লা মার্চের বিবৃতি

৩. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত সম্পর্কে শেখ মুজিবের পয়লা মার্চের প্রেস স্টেটমেন্ট

৪. পল্টনে শেখ মুজিবের ৩রা মার্চের ভাষণ

৫. ইয়াহিয়ার ৬ই মার্চের বেতার ভাষণ

৬. ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা কমিটির নিকট পেশকৃত আওয়ামী লীগের খসড়া শাসনতন্ত্র

৭. ইয়াহিয়ার ২৬শে মার্চের বেতার ভাষণ

৮. ভারতীয় পার্লামেন্টে ২৭ মার্চ বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি

৯. ৩১শে মার্চ বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতীয় পার্লামেন্টের সর্বসম্মত প্রস্তাব

১০. ১০ই এপ্রিলের স্বাধীনতা ঘোষণা অধ্যাদেশ

১১. স্বাধীন সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ

১২. ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনার উপর ডঃ কামাল হোসেনের সাক্ষাতকার

www.bjilibrary.com

আইন কাঠামো আদেশ, ১৯৭০

LEGAL FRAMEWORK ORDER, 1970

The following is the text of the legal Framework Order, 1970 (Presidents Order No. 2 of 1970) issued here today by the President and Chief Martial Law Administrator, General A. M. Yahya Khan.

Whereas in his first address to the nation on the 26th November, 1969, the persident and Chief Martial Law Administrator pledged himself to strive to restore democratic institutions in the country.

And whereas in his address to the nation on the 28th Novemer, 1969, he reaffirmed that plege and announced that polling for a general clection to a National Assembly of pakistan will commence on the 5th October, 1970.

And whereas he has since decided that polling for elections to the provincial Assemblies shall commence not later than the 22nd October, 1970.

And whereas provision has already been made by the Electoral Rolls Order, 1969, for the preparation of electoral rolls for the purpose of election of represenatives of the people on the basis of adult franchise ;

And whereas it is necessary to provide for the constitution of a National Assembly of pakistan for the purpose of making provision as to the constiution of pakistan in accordance with this Order and provincial Assembly for each province ;

Now, therefore, in pursuance of the proclamation of the 25th day of March, 1969, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the president and chief Martial Law Adminstrator is pleased to make the following Order ;

www.bjilibrary.com

Short title and commencement

1. (a) This Order may be called the Legal Framework Order, 1970.

(b) It shall come into force on such date as the president may by notification in the official Gazette, appoint in this behalf.

Order to override other Laws

2. This Order shall have effect notwithstnding anything to the contray contained in the provisional Constitution Order, the Constitution of 1962 of the Islamic Republic of Pakistan or any other Law for the time being in force.

3. (a) In this order, unless there is anything repugnant in the subject or context.

(i) "Assembly" means the National Assembly of Pakistan or a Provincial Assembly for a province provided for in this order ;

(ii) "Commission" means the Election Commission constituted under Article 8;

(iii) "Commissioner means the Chief Election Commissioner appointed or deemed to be appointed under the Electoral Rolls Order, 1969 (P. O. No. 6 of 1969) ;

(iv) "Electoral roll" means the electoral roll prepared under the Electoral Roll Order, 1969 (P. O. No. 6 of 1969) ;

(v) "Member" means member of an Assembly ;

(vi) "Speaker" means the speaker of the National Assembly; and

(vii) "Centrally Adminiestered Tribal Areas" has the same meaning as in the province of West Pakistan (Dissolution) order, 1970,

www.bjilibrary.com

(b) In relation to the territories included at the commenceement of this order in the province of West Pakistan, references to a province and a provincial Assembly shall be construed as references respectively to a new province provided for in the Privince of West Pakistan (Dissolution) Order, 1970, and the provincial Assembly for such province.

4. Composition of the National Assembly (a) There shall be a National Assembly of Pakistan consisting of three hundred and thirteen members of whom three hundred shall be elected to fill general seats and thirteen to fill seats reserved for women.

(b) In conformity with the populaton figuers appearing in the Census of 1961, the number of seats in the National Assembly shall be distributed amongst the provinces and the administered tribal areas, as set out in Schedule 1.

(c) Clause (1) shall not be construed as preventing a women from being elected to a general seat.

5. Composition of the provincial Assemblies- (a) There shall be a Provincial Assembly for each provice consisting of the number of members elected to fill general seats and to fill seats reserved for women, as set out in schedule 11 in relation to such Province.

(b) Clause (1) shall not be contrued as preventing a woman from being elected to a general seat.

6. Principle of election. (1) Except as provided in clause (2), the members shall be elected to the general seats from territorial constituencies by direct election on the basis of adult franchisc in accordance with law.

(2) The President may, by regulation, make separate privision for election of members from the centrally administered tribal areas.

www.bjilibrary.com

(3) As soon as practicable after the general election of members of the National Assembly, the members from a Province for the seats reserved for women in that Assembly shall be elected by persons elected to the general seats from that province in accordance with law.

(4) The members for the seats reserved for women in a Provincial Assembly shall be elected by persons elected to the general seats in that Assembly in accordance with law.

(7) Casual vacancy-Where a seat in the National Assembly has become vacant, an election to fill the vacancy shall be held within three weeks from the occurrnce of the vacancy,

(8) Election Commission for conduct of elections-For the purposes of election of the members of an Assembly and matters connected there with, the President shall constitute an Election Commission consisting of the following members, namely :

(a) the Commissioner, who shall be the Chairman of the commission ; and

(b) two other members, each being a person who is permanent Judge of a High Court.

(9) Qualifications and disqualifications for being a member. (1) A person shall subject to the provision of Clause (2), be qualified to be elected as, and to be a member if;

(a) He is a citizen of Pakistan ;

(b) He has attained the age of towenty-five years ; and

(c) His name appears on the electoral roll for any constituency in the Province or centrally administere tribal areas from which he seeks election.

www.bjilibrary.com

(2) A person shall be disqualified from being elected as, and from being, a member if ;

(a) He is of unsound mind and stands so declared by a competent court ; or

(b) He is an undischarged insolvent, unless a period of ten years has elapsed since his being adjudged as insolvent ; or

(c) He has been, on conviction for any offence, sentenced to trasporation for any term or to imprisonment for a term of not less than two years, unless a period of five years, of such less period as the President may allow in any particular case, has elapsed since his release ; or

(d) He has been a member of the President's Council of Ministers at any time following 1st August, 1969. unless a period of two years, or such less period as the president may allow in any particular case, has elapsed since he ceased to be a Minister ; or

(e) He holds any office in the service of Pakistan other than an office which in not a whole office remunerated either by salary of by fee ; or

(f) He has been dismissed for misconduct from the service of Pakistan unless a period of five years, of such less period as the President may allow in any particular case, has elapsed since his dismissal ; or

(g) Such person is the spouse of a perosn in the service of Pakistan ; or

(h) He, whether by himself or by any person or body of persons in trust for him or for his benefit or on his account or as a members of a Hindu undivided family has any share or interst in a contract, not being a contract between a co-operative society and Government, for the supply of

www.bjilibrary.com

goods to, or for the executon of any contract of the performance of any services undertaken by Government ;

Provided that the disqualification under sub-clause (h) shall not apply to a person-

(i) Whather the share or interest in the contract devoles on him by inheritance or succession, or as a leagatee, executor or administrator untill the expiration of six months after it has so devolved on him or such longer preiod as the President may, in any partucular case, allow ; or

(ii) Where the contract has been entered into by or on behalf of a public company as defined in the Companies Act, 1913 (VII of 1913), of which he is a share-holder but is neither a director holding an office of profit under the company nor a managing agent ; or

(iii) where he is a member of a Hindu undivided family and the contract has been entered into by any other members of that family in the course of carrying of a separate business in which he has no share or interest.

(3) For the avoidance of doubt, it is hereby declared that a Judge of the Supreme Court or a High Court, the Comptroller and Auditor-General of Pakistan, the Attorney-General of Pakistan and an Advocate-General of a Province are persons holding offices in the Service of Pakistan.

(4) If any question arises whether a member has, after his election, become subject to any disqualification, the Commissioner shall place the question before the Election Commission and, if the opinion of the Commission be that the member has become so subject his seat shall become vacant.

10. Bar against Candidature.- (1) No person shall at the same time be member of more than one Assembly or a member ot the same Assembly for more than one consituency.

www.bjilibrary.com

(2) Nothing in clause (1) shall prevent a person from being at the same time a candidate for election from two or more constituencies, but of a person has been elected as a member for two or mor constituencies and does not, whithin fifteen days of the notification of his election by the constituency by which has been elected last, make a declaration in writing under his hand addressed to the Commissioner specifying the constituency which he wishes to reprsent, all his seats shall become vacant, but so long as he is a member for two or more constituencies be shall not sit or vote in an Assembly.

11. Resignation, etc, (1) A member may resign his seat by notice in writing under his hand addressed to the Speaker.

(2) If a member is absent from the Assembly without leave of the Speakar for fifteen consecutive sitting days. his seat shall become vacant.

(3) If a member fails ot take and subscribe an oath in accordance with Article 12 within a period of seven days form the date of the first meeting of the Assembly after his election, his seat shall become vacant :

Provided that the Speakar or, if the Speaker has not been elected, the Commissioner, may, before the expiration of the said period, for good cause shown, extend the period.

12. Oath of Members of Assembly. A person elected as a Member of an Assembly shall before entering upon the office, take and subscribe, before a person presiding at a meeting of the Assembly an oath or affirmation in the followng form, namely :

".......... do solemnly swear (or affirm) that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and that I will discharge the duties upon which I am about to enter honestly, to the best of my ability, faithfully in accordance with the provisions of the

www.bjilibrary.com

Legal Framework Order, 1970 the law and rules of the Assembly set out in that Order, and always in the interes of the solidarity, integrity, well-being and prosperity of Pakistan."

13. Date of Polling. for election to the National Assembly shall commence of the 5th October, 1970, and polling for election to the Provincial Assembles shall commence on a date not later than the 22nd Octaober, 1970.

14. Summoning of National Assembly, etc, – (1) After the close of the general election of members of the National Assembly, the President shall, for the purpose of framing a Constitution of Pakistan, summon the National Assembly to meet on such day and at such time and place as he may think ; and the National Assembly so summoned shall stand constituted on the day of its first meeting :

Provided that nothing in this clause shall be construed as prevenitiong the president form summoning the National Assembly on the ground that all the seats of the members have not been filled.

(2) After meeting as convened under clause (1) the National Assembly shall meet at such times and places as the Speaker may decide.

(3) The Nationa Assembly shall, subject to reasonable adjourments. meet from day to day to transact its business.

15. Right of address, etc. of Presiednt.-The President may address the National Assembly and send a message or messages to the Assembly-

16. Speaker and deputy Speaker.– (1) The National Assembly shall, as soon as may be, elect two of its members to be respectively the Speaker and Dpputy Speaker and shall, so often as the office of Speaker or deputy Speker becomes

www.bjilibrary.com

vacant, elect another member to be the Speaker, or as the case may be, Deputy Speaker.

(2) Until the Speaker and Deputy Speaker are elected, the Commissioner shall presid at the meetings of the National Assembly and perform the functions of Speaker.

(3) Where the office of the the Speaker is vacant, the Dputy Speaker, or, of the office of the Deputy Speaker is also vacant, the Commissionsre, shall perform the functions of Speaker.

(4) During the absence of the Speaker from any meeting of the National Assembly, the Deputy Speaker or of the Deputy Speaker is also absent, such member as may be determined by the rules of proceduer of the Assembly, shall perform the functions of Speaker.

(5) A member holding office as Speaker or Deputy Speaker shall cease to hold that office-

(a) If he ceases to be a member of the National Assembly ;

(b) If he resings his office by writing under his hand addressed to the President ; or

(c) If a resolution expressing want of confidence in him is moved in the Assembly after not less than fourteen days' notice of the intention to move it and passed by the votes of not less than two-thirds of the total number of members of the National Assembly.

17. Quoram and Rules of Procedure.- (a) If, at any time during a meeting of the National Assembly, the attention of the person presiding at the meeting is drawn to the fact that the number of persons Present in less than one hunderd, the person presiding shall either suspend the meeting until the number of members present is not less than one hunderd or adjourn the meeting.

(b) The procedure of the National Assembly shall be regulated by the rules of procedure set out in Schedule III ; in particular the National Assembly shall decide how a decision relating to the Constituion Bill is to be taken.

(c) The National Assembly may act notwithstanding any vacancy in the seat of a member and on proceedings in the Assembly shall be invalid by reson that some members whose election is subsequently held to have been void, or who, after election, had incurred a disqualification for membership voted or otherwise took part in the proceedings.

18. Privileges, etc. of the National Assembly.– (a) The validity of any proceedings in the National Assembly shall not be called in question in any court.

(b) A member or a person entitled to speak in the National Assembly shall not be liable to any proceedings in any court i respec of anything said or any vote given by him in the Assembly or in any Committee there of.

(c) The exercise by an officer of the National Assembly of the powers vested in him for the regulation of procedure, the conduct of business or the maintenance of order in or in relation to any proceeding in the Assembly, shall not be subject to the jurisdiction of any court.

(d) A person shall not be liable to any proceedings in any court in respect or the publication by, or under the authority of the National Assembly of any report, paper, vote or proceedings.

(e) No process issued by a court or other authouritu shall, except with the leave of the Speaker, be served or executed within the precincts of the olace where a meeting of the National Assembly or of any Committee thereof is being held.

www.bjilibrary.com

19. Allowances and privilleges of Memberss.- The Speaker, the Deputy Speaker and the other Members shall be entitled to such allowances and privincges as the President may, by order, prescribe,

20. Fundamental principles of the constitution.– The Constituion shall be so framed as to embody the following fundamental principles :

(a) Pakstan shall be a Fedral Republic to be known as the Islamic Republic of Pakistan in which the Provinces and other territories which are now and may hereinafter be included in Pakistan shall be so united in a Federation that the indepenednce, the territorial integrity and the national solidarity of Pakistan are ensured and that the unit of the Federation is not in any manner impaired.

(b) (i) Islamic ideology which is the basis for the creation of Pakistan shall be preserved ; and

(ii) the Head of the State shall be a Muslim.

(c) (i) Adherence to fundamental principles of democracy shall be ensured by providig direct and free periodical elections to the Federal and the Porvincial Legislatures on the basis of population and adult franchise ;

(ii) the fundamental rights the citizens shall be laid down and guaranteed ;

(iii) the independence of the judiciary in the matter of dispensation of justice and enforcement of the fundamental rights shall be secured.

(d) All powers including legislative, administrative and financial, shall be so distributed between the Federal Government and the Provinces that the Provinces shall have mximum legislative, administrative and financial

www.bjilibrary.com

powers, but the Federal Government shall also have adequatc powers including legislative, administrative and financial powers to discharge its responsibilities in relation to exteranal and internal affairs and to preserve the independence and territorial intregrity of the Country.

(e) It shall be ensured that-

(i) The people of all areas in Pakistan shall be enabled to participate fully in all froms of national activities; and

(ii) Within a specified period, economic and all other dispartities between the Provinces and between different areas in a Province are removed by the adoption of statutory and other measures.

21. Preamble of the Constitution.–The Constitution shall contain, in its Preamble, an affirmation that ;

(a) The Muslims of Pakistan shall be enabled, individually and collectively, to order their lives in accordance with the teachings of Islam as set out in the Holy Quran and sunnah ; and

(b) the minorities shall be enabled to profess and practise their religions freely and to enjoy all rights, privileges and protection due to them as citizens of Pakistan.

22. Directive Principles. – The Constitution shall set out directive principles of State policy by which the State shall be guided inhe matter of ;

(a) Promoting Islamic way of life ;

(b) Observance of Islamic moral standards ;

(c) Providing facilities for the teaching of Holy Quran and Islamiat to the Muslims of Pakistan ; and

(d) Enjoining that on law repugnant to the tachings and

www.bjilibrary.com

requirement of Islam, as set out in the Holy Quran and Sunnah, is made.

23. National and Provincial Assemblies to be the first Legislatures. – The eonstiution shall provide that-

(a) The National Assembly, constituted undr this Order, shall :

(i) be the first Legislature of Federation for the full term if the Legislature of the Federation consists of one House. and

(ii) be the first Lower House of the Legislature of the Federation for the full term if the Legislature of the Federation consists of two Houses.

(b) The Provincial Assemblies elected in accordance with this Order shall be the First Legislatures of the respective Provincies for the full term.

24. Time for froming the Constitution.– The National Assembly shall frome the Constiution in the form of a Bill to be called the Constituiton Bill within a period of one hundred and twenty days from the date of its first meeting, and on its faifure to do so shall stad dissolved.

25. Authentication of Constitution.–The Constitution Bill, as passed by the National Assembly, shall be presented to the President fot authentication. The National Assembly shall stand dissolved in the event that authentication is refused.

26. Purpose for which Assembly may meet. – (a) Save as proviede in this Order for the purpose of framing a Constitution for Pakistan, the National Assembly shall not meet in that capacity, until the Constiution Bill passed by that assembly and authenticated by the President, has come into force.

(b) A Provincial Assembly shall not be summoned to meet until after the Constituiton Bill passed by the National

www.bjilibrary.com

Assembly has been authenticated by the President, and has come into force.

27. Interpretation and Amendment of Order, etc. – (a) Any question or doubt as to the interpretation of any provision of this Order shall be resolved by a decision of the President, and such decision shall be final and not liable to be questioned in any Court.

(b) The President, and not the National Assembly, shall have the power to make any amendment in this Order.

SCHEDULEI
[Art. 4 (2)]
National Assembly of Pakistan

	General.	Women.
East Pakistan	162	7
The Punjab	82	3
The Sind	27	1
Baluchistan	4	1
The North-West Frontier Provice	18	1
Centrally Administered Tribal Areas	7	
Total	300	13

www.bjilibrary.com

SCHEDULE II
[Art. 5 (1)]
Provincial Assemblies

	General	Women
East pakistan	300	10
The Punjab	180	6
Sind	60	2
Baluchistan	20	1
The North-West Frontier Province	40	2
Total	600	21

www.bjilibrary.com

পরিশিষ্ট— ২

ইয়াহিয়ার ১লা মার্চের (১৯৭১) বক্তৃতা

Text of President Yahya Khan's statement on March 1, 1971

The following is the text of President Yahya Khan's statement :

"Today, Pakistan faces her gravest political crisis. I, therefore, consider it necessary to appraise you of the situation and the action that I propose to take to resolve our present difficulties.

But before I do that let me recount to you the steps that I took from the day that the responsibility for the odministration of this country devolved on me to transfer powere to the elected representatives of the people.

In my very first address to the nation I had indicated the need for the smooth transfer of power. Since then we have moved forward step by step towards the achievement of this aim.

In spite of there being Martial Law in the country I did not ban the political parties and in fact permitted full political activity with effct from the first of January 1970.

Later in March 1970 the Legal Framework Order under which elections wree to be held, was duly notified. All other work, including delimination of constituencies and preparation of electroal rolls, was completed with speed.

The election campaign which was long and ardus, ended up in, what we may all claim with pride one of the most peaceful and well-organized general elections on the basis of adult franchise.

www.bjilibrary.com

As you know, the elections were finally completed on 17th January 1971.

Just Prior to the elections in my address of the 3rd of December, 1970, I had suggested to the leaders of the political parties that it would be useful for them to employ the period between elections and the first session of the National Assembly in meeting each other and arriving at a consensus on the main provisions of our future constitution.

I had, at the time, indicated that to be successful these meetings would call for spirit of give and take, trust in each other and realisation of the extreme importance of this particulare juncture in our history. Appreciating the great significance of such exchanges of view between political leaders I tried to facilitate the process by giving them enough time to do so.

I, therefore, decided to fix the third of March as the date of the inaugural session of our National Assembly.

In the past few weeks certain meetings between our political leadrs have indeed taken place. But I regret to say that instead of arriving at a consensus some of our leaders have taken hard attitudes. This is most unfortunate. The political confrontation between the leaders of East Pakistan and those of the West is a most regrettable situation. This has cast a shadow of gloom over the entire nation.

The position briefly is that the major party of West Pakistan. namely, the Pakistan People's Party, as well as certain other political parties, have declared their intention not to attend the National Assembly sesion on the third of March, 1971. In addition, the general situation of tension created by India has further complicated the whole position. I have, therefore, decided to postpone the summoning of the National Assembly to a later date.

www.bjilibrary.com

I have repeatedly stated that a constitution is not an ordinary piece of legislation but it is an agreement to live together. For a healthy and viable constitution, therefroe, it is necessary that both East and West Pakistan have an adequate sense of participtation in the process of constitution making.

Needless to say I took this decissioans to postpone the date of the National Assembly with a haeavy heart. One has, however, to look at the practical aspects of such problems. I realized that with so many representatives of the people of West Pakistan keeping away from the Assembly if we were to go ahead with the inaugural session on the 3rd of March the Assembly itself could have disitegrated and the entire effort made for the smooth transfer of power that has been outlined earlier would have been wasted.

It was, therefore, imperative to give more time to the political leaders to arrive at a reasonable undrstanding on the issue of Constitution-making. Having been given this time I have every hope the they will rise to the occasion and resolve this problem. I wish to make a solemn promise to the people of Pakistan that as soon as the environments enumerated earlere become conducive to Constitution making I will have no hesitation in calling the Session of the Assembly immediately. As for myself, I Would like to assure my countrymen that I shall do everything in my powre to help the political leaders in achieving our common goal with even handed justice which I have all along been doing.

"In the end, I pray to Almighty Allah to guide us all in acting according to the dictum of the Father of the Nation, namely, faith, unity and disciplne. I appeal to the political Ieaders and all my countrymen to exercise the utmost restaint at this grave hour of our lives."

www.bjilibrary.com

১লা মার্চ (১৯৭১) হোটেল পূর্বাণীতে সাংবাদিকদের কাছে শেখ মুজিবের বিবৃতি

Talk with pressmen after the parliamentery party meeting

Talk with pressmen after the parliamentary party meeting at Hotel Purbani, on March 1, 1971.

Sheikh Mujibur Rahman, The Awami League Chief, while talking to the pressmen imediately after the parliamentary party meeting at Hotel Purbani following the announcement to the postponement of the National Assembly session, said that he would make all sacrifices for the emancipation of the 70 million Bengalees.

He further said that a united fight has to be put for ending the colonial treatment to which Bengalees have ben subjected for the last 23 years.

The Sheikh said : "Only for the sake of a minority party's disagreement, the democratic process of constitution making has been obstructed and the National Assembly session has been postponed sine die. This is most unfortunate as far as we are concerned. We are the repressentative of the majority people and we cannot allow it to go unchallenged."

Sheikh Mujibur Rahman announced a programme for the next 6 days which included observance of complete strike today in Dhaka and a country-wide strike on the 3rd March the date earlier fixed for the National Assembly to meet. On the 7th March a public meeting will be held at the Race Course Maidan in which the Awami League Chief shall announce the final programme. The Sheikh uttered a note of warning : "You will see history made if the conspratirators fail to come to their senses." In a determined voice sheikh Mujib declared :

www.bjilibrary.com

We are ready for any consequence. I have mentioned many times the fact that a conspiracy is going on in this country. There was a General Election and the people have elected us to serve them and we have a responsibility towareds them. But in spite of the clear verdict in our favour, the conspiracy has struck its root.

The majority of the elected representatives of the people are from Bangladesh and in collaboration with the elected representatives from West Pakistan with the exception of Bhutto's and Qayyum's Parties, we were quite capable of framing the Constitution. We cannot betray our people and we cannot betray the trust the people have placed on us. We shall continue our struggle until we achieve our goal. You know that there is Martial Law in the country. But the Chairman of the Pakistan People's Party has threatened the members of the National Assembly from West Pakistan who were willing to come to East Pakistan to attend the session that they would be liquidated if they come to East Pakistan to attend the National Assembly Session. Mr. Bhutto has taken the Law in his own hands. Is the Law and Order situation only meant for the poor Bengalees ?"

Sheikh Mujib continued "We want co-operation and we have told them repeatedly that they should come to the National Assembly where we will be able to discuss the framing of the constituiton for five days at a time and hold discussion for another five days. Democracy demads that the voice of the majority should be accepted. But in our case, the minority party has always had the upperhand. I suggested that 15th February be set for the opening of the National Assembly, but the Assembly was called for in the first week of March in accordanee with the wishes of the minority party.

"This is nothing but a conspiracy which has been played for long 23 years in this country and is still going on only to

www.bjilibrary.com

exploit the 70 million people of Bengal. It is intended to keep Bengal as the colonial market and we are fighting for justice and fairplay and we shall continue fighting until we achieve our goal."

In reply to a question whether he would proclaim unilateral independence, Sheikh Mujib said "You Wait". When asked by correspondent whether he was consulted before the postponement of the National Assembly, he said, "No."

To a question of another correspondent regarding the unarming of the poilce force at Rajarbahg Police Lines Sheikh Mujibur Rahman expressed his ignorance about it and requested the Press to Publish any informaation they may have in this respect.

When asked whether he apprehend arrest of his Party members, he said that they were ready for any consequences. Many times they had courted arrest before. He added, "My people are with me and let us hope for the best and prepare for the worst".

When asked whether he will oppose Censorship if imposed on the Press Sheikh Mujib replied, "I oppose everything that curbs the freedom of the people."

He informed the press that members of the Awami League Parliamentary Party renewed their pledge to fight to the end and make any sacrifices to achieve the rights of the people. He categorically declared that any sacrifice was too small for the emancipation of the people of Bangladesh. He also infirmed that he would discuss latest developments with Moulana Bhashani, Md. Nurul Amin, Mr. Ataur Rahman Khan, Professor Muzaffar Ahmed and other Leaders, as soon as possible.

Replying to a question about the fate of non-Bengalees living in Benal, the Awami League Chief said, "They are sons

www.bjilibrary.com

of the soil, they should think this soil as their own and they must join with the people here."

To a question as to what west Pakistan should do Sheikh Mujib said, "they should also rise to the occasion and protest against this conspiracy."

In course of his talk Sheikh Mujibur Rahman stated that Mr. Bhutto had always been acting in the most irresponsible manner. During the Round Table Conference called by Ayub Khan, he declined to attend. Bhutto had also refused to participate in the elections but subsequently agreed to participate. Now he has refused to attend the proceedigs of the National Assembly and in all these instances he was given preference over the leader of the majority party. Sheikh Shahib stated. "So far as I am concerned, my people have given a verdict on the six-point programme and we shall form the constitution on the basis of Six points and Eleven Points.

www.bjilibrary.com

৩ রা মার্চ পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবের ভাষণ

Sheikh Mujibur Rahman's speech in a pubilc meeting at Dhaka on March 3, 1971.

Dhaka. March 3 Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman today urged the authorities to withdraw the forces from the city and handover the power to the elected representatives of the people.

The authorities must realise that the people wated self-rule and if they were resisted by force they would not hesitate of sacrifice their life. The Awami League chief said while addressing a massive public meeting at Paltan Maidan here this afternoon.

He also issued directives to the people of Bangladesh not to pay any taxes until and unless power was transferred to the people's representatives.

The massive public meeting was organised by the Students' League as a part of the province-wide hartal call given by the Chief of the Awami League."

"By obstructing the constitutional method the authorities have virtually compelled the people to shed their innocent blood for realising their legal rights. This is absolutely intolerable. I appeal to the authorities concerned to immediately stop this wrong course by withdrawing Martial Law and transferring power to the elected representatives."

The massive public meeting was presided over by the Students' League Chief, Mr. Noure Alam Siddiqi. The meeting was also addressed among others, by the General secretary of Jatiya Sramik League Mr. Abdul Mannan, the General Secretarv of the Students League, Mr. Shahjahan Siraj, and the General Secretary of the Dhaka University Central Students Union (DUCSU) Mr. Abdul Quddus Makhan.

www.bjilibrary.com

In an emotion choked voice the Sheikh in his 30-minute speech called upon the people to continue their struggle in a peaceful and organised manner.

He urged the people to be alert against agent-provocators and to maintain complete peace and discipline, otherwsie the purpose of the movement would be spoiled.

He called upon the people from all walks of life to rise to the occasion and protect the life and protect the life and property of everyone living in this part of the country, whether Hindu or Muslim, Bengali or non-Bengali.

Reminding the authorities that he as well as the people of Bangladesh were ready to die for the realisation of people's legitimate rights, he declared in clear-cut terms that the people were ready to face all the eventualities.

He said that he would never betray the cause of the people of Bangladesh even facing death.

The Awami League chief said that the authorities had taken action against those who had been asking for peaceful transfer of power.

Anouncing his programme of action upto March 7 next, he said that he would seek help and co-operation from all shades of opinion for the success of the movement.

He said that the hartal would be observed throughout Bangladesh everyday from 6 a.m. to 2 p.m. after the hartal the vehicles should be allowed to move. He suggested and urged the people to pay a bit more to the rickshaw pullers to cover their day's earnings.

He will address a mass rally at the Race Course Maidan at 2 p.m. on Sunday. He said that hartal was to be observed in all organisations, including Government offices, Secretariat, High Court and other courts, semi-Governament and autonomous corporations, PIA, Railway and other

www.bjilibrary.com

communication services, transports, all mills, factories, industrial and commercial establishments and markets.

He said that the forces were being maintained for protecting the country, and they could not be used against the common masses. Sheikh Sahib urged the authourities to pull back the forces to their barracks without further delay.

Sheikh Mujibur Rahman said that he had no language to condemn the incidents that took place in the city last night.

Sheikh Sahib make it clear that the present situation in the country was not the creation of his or any other people of Bangaldesh, but of the conspirators who had been trying to sabotage the peaceful transfer of power to the elected representives of the people. The majority party had been even ingnored while taking important national decisions, he said.

Sheikh Sahib advised each and every person of Bangaldesh to observe the hartal according to schedule in a peaceful and disciplined manner.

He, however, siad that exemptions were to be exteneded only to ambulances, Press cars, hospitals, medicine shops, water and electricity supply.

Sheikh Sahib said that the speech at Paltan Maidan today might be his "Last Speech" and advised the people to continue their struggle in full swing even if he was absent. He said that there were a chain of leaders, among his companions, who would be able to continue the struggle without any trouble.

The Sheikh who was earlier scheduled to lead a huge procession after the meeting, announced that the procession would not be led. Instead he led a prayer for the salvation of the departed souls of the martyrs who had, he maintained, died in the struggle for democracy.

Other speakers at the meeting called upon the people to maintain peace and harmony among the poeple and desist from looting and other anti-social activities.

www.bjilibrary.com

They declared in unequivocal terms that the people of Bangaldesh could not be suppresed any more and they must achieve their goal at any cost.

The meeting in a resolution condemned the firings in different parts of the city during the last two days and prayed for the salvation of the departed souls. It expressed its deep sympathy with the members of the bereaved families.

In another resolution, the meeting called upon the people from all walks of life to take active part in the movement for the realisation of the people's fights under the dynamic leadership of sheikh Mujibur Rahman.

The meeting took a fresh vow for the establishment of a society in Bangladesh, where there would be no exploitation and people would live in peace.

Sheikh Mujib gave call for "peaceful satyagraha" movement for the realisation of the fights of the people of Bangladesh and appealed to the people to maintain peace for the success of the struggle.

Sheikh Mujib also appealed to the people to guard against looting and arson and to maintain peace at all costs. Any attempt to disrupt peaceful life must be resisted, because without strict discipline no mass movement could attain any success.

Sheikh Mujib appealed for communal peace and added the Beharis and non Muslims "are our sacred trust".

He referred to the sacrifice of lives by Bengalis during the last 23 years and during yestrday's observance of hartal in the city.

He said "I do not know how many peole died yesterday" adding that he himself heard the firing of machine-gun. He also led the prayer at the meeting for those who died. The dead bodies of a few persons, who died yesterday, were also broght to the public meeting.

www.bjilibrary.com

Sheikh Mujib said he wanted to spell out the future couse of action, and added if the attitude of the Government remained unchanged till March 7, he would give out his mind at the race course, where he is scheduled to address a public meeting. He said if he failed to turn up for any unforeseen reasons there would be others to announce the future course of acition.

He said the maintenance of discipline was the prerequisite for the success of any mass movement. Without discipline no movement could achieve any tangible results "no matter how many lives we sacrifice". He particularly reminded the Volunteers of their responsibilities in this connection.

Sheikh Mujib said "we are not responsible for the present state of affairs". He said they as the majority party in the country were in favour of the National Assembly session on February 15, but Mr. Z. A. Bhutto wanted it to be deferred to the first week of March, and when it was summoned to meet today he (Bhutto) oppose it again.

The Awami League chief regretted the stand taken by the people's Party chief on the session of the National Assembly, which was to begin tody, and added although they "were ready to attend the session the use of arms was" directed at the Bengalis. He also referred to threats of PPP chief to set a fire West pakistan if the session was not postponed.

Sheikh Mujib, in an apparent reference to west Pakistan leaders, Said "If you do not want to frame one constitution let us frame our own constitution and you frame your own. Then let us see if we can live together as brothers."

The Awami League chief said the people of Bangladesh freed him from jail at the cost of their lives and shed their blood in the last. We are ready to make further sacrifices and give more blood." He added "You cannot suppress the Bengalis by killing 70,000,000 Bengalis."

www.bjilibrary.com

Sheikh Mujib said if he died his soul would be there to be happy to find the Bengalis free and that they have two square meals a day to survive.

Sheikh Mujib said he did not have any grudge against the poor people of West Pakistan. They had been trying to live together for the last 23 years but West Pakistan now wanted to secede because they knew it well by now that they could not perpetuate their exploitation on them.

The Awami League leader also called upon the Press not to obey any restricition on them, if any, and if they failed to resist it they should refuse to attend their offices. He told the Press that "it is a national struggle", and everyone's participation was essential.

www.bjilibrary.com

ইয়াহিয়ার ৬ই মার্চের (১৯৭১) ভাষণ

TEXT OF PRESIDENT YAHYA KHAN'S BROADCAST ON MARCH 6, 1971.

"MY DEAR COUNTRYMEN,

"ASSALAM-O-ALAIKUM,

In my statement of the 1st of March I had recounted to you the steps that I took to transfer power to the elected representatives of the people. In the same statement I had also said that I, on my part, would do everything possible to help you elected leaders in moving towards the attainment of our common goal whcih was and which continuses to be, a smooth transition towards a democratic way of life.

"As you would recall, in this direction my latest step has been to call a conference of the Leaders of all parliamentary groups to meet me at Dhaka on the 10th of March. unfortunately, however, in total disregard of my genuine and sincere efforts to bridge the gap between the various points of view, the response to my call has been rather discouraging particularly from the leader of our majority party who, before the announcement from the leader of our majority party who, before the announcement over the radio, had given me the impresion that he would not be averse to the idea of such a conference. His outright rejection was, therefore, both a surpise and a disappointment. As you are aware, Mr. Nurul Amin has also refused to participate. This in effect means that there would be no representative from East Pakistan in the proposed conference.

"You will thus see taht from the time the elections were completed practically every step that I took in the process of transfer of power has in one way or another been obstructed by some of our leaders. I might also mention at this stage, that

www.bjilibrary.com

after the completion of elections on the 17th of January and after I had meet the leaders of the two major parties and the leaders had meet among themselves at Dacca I had invited them to come and discuss the situation with me on more than one occasion with a view to come and discuss the situation with me on more than one occasion with a view to working out an acceptable method of moving forward. I regret to say that the president of Awami League did not think it fit to respond to my invitations and we thus lost the opportunity of avoiding misunderstandings and of working out an amicable solution.

"As the resulting environments were not conducive to constitution making in that a very large number of West Pakistani representatives refused to attend the Assembly session on the 3rd of March, I came to the conclusion that having the inaugural session of the National Assembly on that date would be futile exercise and was likely to result in the dissolution of the Assembly itself. I, therefore, tried to save the situation by postponing the date of the session. I had thereby hope to achieve two purposes-firstly, to save the assembly and all the national effort that had gone into its birth, and secondly, allow time for passions to cool down and a fruitful dialogue to take place. But instead of accepting the decision in the spirit in which it was taken, our East Pakistan leadership reacted in manner which resulted in destructive elements coming out in the streets and destroying life and property. Needless to say, no Government could have remained a silent spectator in such a situation. It was, therefore, my moral obligation to take the minimum essential measures for protecting the lives and property of the innocent and otherwise peaceful law-abiding citizens who in the absence of any such measures would have fallen victims to extremist elements. I am, however, sorry to say that lawlessness continues to be the order of the day in East Pakistan.

www.bjilibrary.com

Misunderstand

"For some reason, the postponement of the date of the Assembly session has been completely misunderstood. Whether this is deliberate or otherwise I cannot say but one thing is certain this misunderstanding has become the rallying cry for the forces of disorder. When such forces become activated the main sufferers are the innocent citizens whose daily life is seriously disturbed and who are in constant danger of suffering bodily harm and even death. While realising that an application of adequate force can effectively bring the situation under control. I have deliberately ordered the authorities in East Pakistan to use the absolute minimum force required to stop the law-breakers from loot, arson and murder.

"It will be seen that only one of my purposes behind the postponement of the session of the Assembly-namely the preservation ot the Assembly itself, has been achieved. The other and equally important purpose of having a fruitful dialogue has, however, not been achieved. In the meanwhile innocent lives are being lost for which the bereaved families have my fullest sympathies and which in a situation that is not of my creation is the least that I can offer.

"As explained earlier, my efforts to arrive at a date for the opening of the National Assembly session in consultation with political leaders have been frustrated.

"I, therefore, in my capacity as President and Chief Martial law Administrator of this country, feel duty bound to resolve this unfortunate impasse by taking a decision myself. I cannot wait indefinitely. I have consequently decided that the inaugural session of the National Assembly will take place on 25th of March. It is my sincere hope that this decision will elicit a patriotic and constructive response form all our political leaders.

"Since my efforts to get the leaders to arrive at a broad consensus on the process of constiution making have not

www.bjilibrary.com

succeeded, to those political parties who may have doubts about viability of the future constitution of Pakistan, I would like to say that on better assurance than the provisions of the Legal Framework order is needed.

"Finally let me make it absolutely clear that no matter what happens, as long as I am in command of the Pakistan Armed Forces and Head of the state. I will ensure complete and absolute integrity of Pakistan. Let there be no doubt or mistake on this point. I have a duty towards Millions of people of East and West Pakistan to preseve this country. They expect this from me and I shall not fail them. I will not allow a handful of people to destroy the homeland of Millions of innocent Pakistanis. It is the duty of the Pakistan Armed Forces to ensure the integrity, solidarity and security of Pakistan a duty in which they have never failed.

"Let us go forth with full confidence in ourselves and faith in Almighty Allah towards the goal we hve set before us for achieving a democratic way of life and enable the elected representatives of the people to fulfil their duty which the nation expects of them.

"God bless you all."
"Pakistan Paindabad."

www.bjilibrary.com

পরিশিষ্ট—৬

আওয়ামী লীগ সংবিধান কমিটি কর্তৃক ৬ দফার ভিত্তিতে প্রণীত এবং ১৫ই মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত আলোচনায় ইয়াহিয়ার কমিটির কাছে পেশকৃত পাকিস্তানের খসড়া শাসনতন্ত্র (অংশ)

PREAMBLE

In the name of Allah, the Beneficient, the Merciful, We, the peoples of the autonomous States of Bangladesh, the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan,

Having by our common struggle against colonial rule attained the right of self determination,

In order to secure for ourselves and for our posterity the right to live in freedom and with dignity and to establish a real, living democracy, wherein equality and justice, political, economic and social, would prevail,

Having had to struggle, since independence, against successive usurpers of the power, whcih rightfully belonged to the people.

Having now attained victory, as a result of the heroic sacrifices of the martyres who laid down their lives in order to end exploitation of man by man, and region by region,

Resolving that the high ideals for which they laid down their lives shall be fundamental principles of the Constitution,

Further resolving that guarantees shall be embodied in this Constitution to enable the peoples of Pakistan, Muslims, Hindus, Buddhists, Christians, Persians and of other religions to profess and practise their religion and to enjoy all rights, privileges and protection due to them as citizens of Pakistan, and in pursuance of this object to enable the Muslims of Pakistan, individually and collectively, to order their lives in accordance with the teachings of Islam as set out in the Holy Quoran and the Sunnah.

www.bjilibrary.com

Affirming that the Constiution shall effectively guarantee supremacy of civil power, exercised through elected representatives of the people, over the armed forces and all military authorities;

Solemnly pledging that it is our sacred duty to abide by and to safeguard, protect and defend this Constitution and to maintain its supremacy, as the embodiment of the will of the people and the basis, freely determined by them, for living together in a federal State and striving together so that we may prosper and obtain our rightful place amongst the nations of the world and make our full contribution towards international peace and the progress and happiness of humanity.

In THIS ASSEMBLY, this the day of

One thousand nine—hundred and seventy-one, corresponding to the day of 1391 A.H. and the day of

1377 B.S., WE DO HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

PART 1-THE FEDERAL REPUBLIC AND ITS TERRITORIES

The Republic and its territories

1 (1) Pakstan shall be a Federal Republic under the name of Federal Republic of Pakistan, and shall be composed of the autonomus States of Bangladesh, Punjab, Sind, Pakhtaunistan and Baluchistan, and such other territories as may become included in Pakistan,whether by accession of otherwise.

(2) The territories of each of the States as are included in pakistan are specified in the First Schedule.

Alteration of territories of States

2. No Bill providing for altering the limits of a State or increasing of diminishing the area of any State shall be introduced in the Federal Parliament, unless it has earlier been

www.bjilibrary.com

approved by the Assembly of the State concerned by the votes of not less than two-thirds of the total members of that Assembly.

PART III-DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY

I. ISLAM

(1) No law shall be repugnant to the injunctions of Islam as laid dwon in the Holy Quoran and Sunnah.

(2) Facilities shall be provided for the teaching of the Holy Quoran and Islamiat to the Muslims of of pakistan.

(3) Observance of Islamic moral standard should be promoted amongst the muslims of pakistan.

II. MIGHTS OF MEMBERS OF OTHER RELIGIOUS DENOMINATIONS

Members of all other reiligious denominations shall enjoy full rights of citizenship and in addition to the constiutional orotecttion of their fundamental rithts. their legitimate rights and interests shall be duly safeguareded in all spheres.

III. ESTABLISHMENT OF A SOCLALIST EOCONOMIC SYSTEM WITH A VIEW TO ACHIEVING A SOIETY FREE FROMEXPLOITATION.

With a view to achieving a just and egalitarian society, free from exploitation of man by man, and of region by region, a socialist economic system shall be established.

IV. STATE'S RESPONSIBILITY TO ENSURE BASIC NECESSITIES OF LIFE, EMPLOYMENT, IMPROVEMENT IN THE STANDARD OF LIVING, AND SOCIAL SECURITY.

It shall be a fundamental responsibility of the State to ensure, through planned economic growths development :

(i) the Provision to all citizens of the basic necessities of

www.bjilibrary.com

life, including food, clothing, shelter, education and medical care ;

(ii) the right to work, that is, the right to guaranteed employment at a reasonable wage, having regard to the quantity and quality of work ;

(iii) the right to reasonable rest, recreation and leisure ;

(iv) the steady and sustained improvement in the standard of living, material and cultural, of the people ;

(v) the provision of social security, through, inter alia, the extensive development of compulsory social insurance of industrial, office and professional workers :

(vi) the right to maintenance in old age.

V. RIGHTS OF WORKERS AND PEASANTS

It shall be a fundamental responsibility of the State to safeguard and promote the rights and interests of workers and peasants.

IV. EMANCIPATION OF THE RURAL MASSES FROM EXPLOITATION AND IMPROVEMENT IN THEIR QUALITY OF LIFE.

The rural masses shall be emancipated from exploitation by, among other measures, the total abolition of the Jagirdari, Zamindari and Sardari systems and the re-orientation of the land system in the iterests of the actual tillers of land ....

****

XVIII. ECONOMIC BENEFITS OF FEDERAL EXPENDITURE

Every effort shall be made to ensure that the economic benefits of federal expenditure shal be equitably distributed among all the States in the Federation.

XIX. REPRESENTATION IN FEDERAL GOVERNMENT

www.bjilibrary.com

Steps shall be taken immediately to ensure that all the states in the Federation are represented, on the basis of the population of each State, in all spheres of the Federal Government.

XX. REPRESENTATION IN THE DEFENCE SERVICES

Every effort shall be made to ensure that, within the shortest possible time persons from all the States are represented, on the basis of population of each State in all branches of the Defence Services of the Federation and extraordinary measures, if necessary, shall be adopted to implement this Principle.

XXI. REGIONAL SELF-SUFFICIENCY IN DEFENCE

Having regard to the extraordinary geo-political situation of Pakistan, each of its two regions shall be made self-sufficient in man, materials, training and logistic facilities, in order to defend itself.

XXII. DEVELOPMENT OF LANGUAGES AND CULTURES

Immediate measures shall be taken to ensure that Bengali, Urdu and the languages in use in a State, where appropriate, shall replace English in all walks of life. Every effort shall be made to encourege the development of the language, literature and culture of every area in Pakistan.

XXIII. PROTECTION OF ANCIENT MONUMENTS

It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or objects of artistic or historic interest, declared by law to be of historic significance form spoilation, disfigurement, destruction, of removal, dispose or export, as the case may be.

XXIV. PROMOTION OR INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY

www.bjilibrary.com

The State shall endeavour to-

(a) promote international peace and security ;

(b) maintain just and honourable relations between nations,

(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another ; and

(d) encourage peaceful settlement of international disputes.

XXV. STRUGGLE AGAINST IMPERIALISM, COLONIALISM AND APARTHIED

Pakistan shall support the struggle of the oppressed people of the world against imperialism, colonialism and aparthied.

****

PART VI-THE FEDERAL CAPITAL TERRITORIES

96. (1) The Federal Repubilc shall have two capitals situated respecitively at Dhaka in the State of Bangladesh and at Islamabad in the State of the Punjab.

(2) The area of the federal capital territory at Dhaka (in this Constitution referred to as "the Dhaka Federal Capital Territory") and the area of the federal capital territory at Islamabad (in this Constitution referred to as "the Islamabad Federal Capital Territory") shall be determined by the Federal Parliament.

(3) The principal seat of the Federal Perliament shall be located in the Dhaka Federal Capital Territory and the proincilpal seat of the Federal Court shall be located in the Islamabad Federal Capital Territory.

Provided, however, that a another seat of the federal Parliament shall be located at Islamabad and a second seat of the Federal Court, including a permanent Division consisting of not less than three Judges shall be located at Dhaka and the Federal Parliament and Federal Court shall function for not

www.bjilibrary.com

less than four months at the place where its second seat is located.

(4) The executive organs of the Federal Government shall maintain parallel estabilshments of equivalent strength in the Dhaka Federal Capital Territory and Islamabad Federal Capital Territory.

(5) The Federal Government shall function during winter with its headquarters in the Dhaka Federal Capital Territory and during summer with its headquarters inthe Islamabad Federal Capital Territory.

(6) The Federal Parliment, by law, shall make provision for the government and administration of the Federal Capital Terriories.

PART VII-RELATIONS BETWEEN THE FEDERATION AND THE STATES

CHAPTER 1-LEGISLATIVE POWERS.

Federal and State Law Making Powers

97. (1) Subject to the provisions of the Constitution the Federal Parliament shall have exclusive power to make laws for the whole or any part of Pakistan with respect to any matter ensumerated in the Fifth Schedule and each State Assembly shall have exclusive power to make laws for the whole or part of that State in respect of any matter not enumerated in the Fifth Schedule including in particular those matters which are set out in the Sixth Schedule.

(2) The federal Parliament may make laws for the whole or any part of Pakistan in respect of matters not enumerated in the Fifth Schedule for the purpose of implementing any treaty, convention or agreement between Pakistan and any other country or of any arangement with of decision of an international organisation of which Pakistan is a member :

www.bjilibrary.com

Provided that any provision of law enacted in pursuance of this clause shall not come into operation in a State unless the State Covernment has, by Order, signified its consent to such law having effect within the State.

(3) No law made by the Federal Parliament or a State Assembly shall be invalid or otherwitse in operative only on the ground that it would have extraterritorial operation.

(4) Subject to the provisions of the Constitution, the Federal Parliament have power (but not exclusive power) to make laws for the Dhaka Federal Capital territory and the Islmabad Capital territory with respect to any matter not enumerated in the Fifth. Schedule ; in the event of any inconsistency between a Federal law or a State law applicable to Federal Capital territories, the Federal law shall prevail.

(5) If the State Assembly of two or more States propose that an Act of Parliament should be enacted to give effect to any agreement or scheme between the States concerned and if resolutions to that effect are passed by the State Assemblies concerned, it shall be lawful for the Federal Parliament to pass such an Act even if it relates to a matter not enumerated in the fifth Schedule.

(6) For avoidance of doubt, it is declared that Federal Parliament shall only have such powers to make laws as have been expressly conferred upon it by this Constitution and all other legislative powers, including the powers of residing legislation, shall vest in each Sate Assembly.

98. Any enactment made by a legislature in respect of a matter which is not within its law-making power shall be void.

CHAPTER II-ADMINISTRATIVE RELATIONS BETWEEN THE FEDERATION AND THE STATES

Extent of Executive Authority of the Federation

99. The executive authority of the Federation extends to all

www.bjilibrary.com

matters with respect to which the Federal Legislature has exclusive power to make laws.

Extent of Executive Authority of the States

100. The executive authorit of a State extends fo all matters with respe to which its Legislative has power to make laws.

Federal Regulatory Board for International and Inter-regional communication

101. (1) There shall be a federal Regulatory Board for International and Inter-Regional Communications charged with the duty of regulating, subject to clause (4) of this Article, the functioning of the agencies both under private or public ownership, engaged in the international or inter-regional communications, more particularly enumerated in the Seventh Schedule, for the purpose of coordination and rendering of uniform services to every State.

(2) The composition, powers, duties, administration and management of the Board referred to in Clause (1) shall .... be regulated by an Act fo parliament.

(3) The different agencies engaged in the field of international and inter-regional communications owned till the commencement day of the Central Covernment shall cease to be owned by the Federal Government and the assets and liabilities of such agencies shall be apportioned between the States of Bangladesh of the One Part and the four States of the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan of the Other Part, but any two or more State may by agreement establish agencies for joint ownership, administration and management in respect of maters previously dealt with or owned by the Central Governmment.

(4) The regulatory functions of the Board feferred to in Clause (1) of this Article shall be confined.

(a) In the case of International and inter-regional air

www.bjilibrary.com

communication and inter-regional shipping, to ensuring the maintenance of regular services, fixing uniform fares and freight rates, providing safety measures and ensuring compliance with the relevant internaional conventions to whcih Pakistan is a party ;

(b) In the case of international and inter-regional postal, telegraph and telephone communications, to ensuring adequate services, determination of unifrom rates and charges, and ensuring compliance with releveant international conventions to which Pakistan is a party ;

(c) In the case of wireless, broadcasting and television, to the allocation of wave lengths for transmission and ensuring compliance with relevant international conventions to which pakistan is a party.

Settlement of Disputes

102. Any disputes between States inter semay be referred by agreement to arbitration.

CHAPTER III-FINANCIAL PROVISIONS

Federal levy

103. (1) A "federal levy" shall be payable to the Federal Government by each State Government being the propoition stipulated in clause (2) of this Article of the total sum, comprising both local and foreign currency, required to meet the expenditures charged upon the federal Consolidated Fund and other expenditures in respect of which demands for grants having been submitted to the Federal Parliament have been assented to by the Federal Parliament.

(2) The proportions referred to in Clause (1) shall be :

(a) Bangladesh 27%

(b) Punjab 43%

(c) Sind 21%

www.bjilibrary.com

(d) Pakhtunistan 7.4%

(e) Baluchistan................. 1.6%

(3) Each State shall under a fundamental constitutional obligation to pay to the Federal Government the federal levy whcih shall be the first charge upon the State Consolidated fund of each State.

Federal Finance Commission

104. (1) There shall be a Federal Finance Commission which shall be constituted by an Act of Parliament which shall, subject to the provisions of the Constitution, define the powers and functions of the commission.

(2) The Federal Finance Comission shall once in five years, and for the first time at the expiry of five years from the commencement day, review the proportions stipulated by Clause (2) of Article 103 by way of "federal evy" payable to the Federal Government by the State Governments and, upon such review. maintain or alter proportions having regard to the principles of federal equity and, in particular having regard to the ability to pay by each State, the participation of persons of each State in the different spheres of the Federal Government and the pattern of location of the Federal expenditure.

Borrowing by the Federal Government

105. (1) The executive authority of the Federal Government shall extend to borrowing on the security of the Federal Consolidated Fund within the limits imposed by this Constitution and within such further limits, if any, as may be determined by Act of Parliament, and to giving of guarantees within such limits.

(2) The borrowing of the Federal Government shall be limited to borrowing form the public except in the case of ways and means advances within a financial year which advances may be obtained form the Reserve Banks of the States.

www.bjilibrary.com

(3) The Fedaral Government securities issued for any borrowing under this Article shall not be eligible as reserves of the commercial banking system.

(4) All liabilities incurred by the Federal Government in respect of foreign loans during the relevant period shall be dealt with in the following manner :

(a) Fareign loans incurred for central expenditure which are not allocable between the eastern region and the western region shall be charged to the Federal Consolidated Fund.

(b) The liability to service foreign loans which have been utilised in the eastern region during the relevant period shall be borne by the State of Bangladesh :

Provided that such liability shall be reduced by an amount equivalent to the amount transferred during the relevant period to the eastern region out of the total foreign exchange earned by the State of Bangladesh.

Explanation : The amount of foreign exchange deemed to be transferrred during the relevant period from the State of Bangladesh to the western region shall be the amount by which the foreign exchange earned by the State Bangladesh but utilised during the relevant period in the weastern region exceeds the deficit of the State of Bangladesh in the inter regional trade during the relevant period.

(c) The liability to service foreign loan which remains after the assumption by the State of Bangladesh of such part of the total liability as is referred to in sub-clause (b) of this Clause shall be borne by the States of the western region, namely, the States of punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan, and further apportionment, if so desired by the States of western region, between the States of the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan shall be effected (in such manner and on such basis as shall be provided after consultation with the representatives of the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan).

www.bjilibrary.com

Loans to and borrowing by state.

106. (1) The executive authority of a State Government shall extend to borrowing, including borrowing upon the security of the State Consolidated Fund within such limits, if any, as may be determined by an Act of the State Assembly, and to giving a guarantee within such limits, if any, as may be so determined.

(2) All domestic debt obligations outstanding on the commencement date from the State Covernment to the Federal Government shall be written off.

Federal Reserve System.

107. (1) The State Bank of Pakistan shall be replaced by a Federal Reserve System. so that a Reserve Bank is established for the State of Bangladesh and one or more Reserve Banks are extablished for the States of the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan (whether there is to be one or more Reserve Bank in the western region is to be determined in consultation with the representatives of the States concerned).

(2) The Regional Reserve Bank for Bangladesh shall be incorporated under and regulated by the law of the State of Bangladesh and the other Region Reserve Bank or Banks shall be incorporated and regulated by the law (of such legislative organ as shall be determined in consultation with the representatives of the States concerned), and shall, subject to the powers vested in the Federal Reserve Board under clause 3 hereunder, exercised all the powers, functions and duties in respect of the area within its jurisdiction as are now exercised by the Stete Bank of Pakistan in respect of the whole of Pakistan including in particular the following powers and functions :

(a) Acting as Bankers' Bank and Banker to the State Government ;

www.bjilibrary.com

(b) Custody of the foreign exchange earnings and reserves and gold reserves of the State ;

(c) Formulation and implementation of monetary policy ;

(d) Implementation of measures to prevent flight of capital from one State to another.

(3) The Fedral Reserve Board shall have the powers enumerated hereunder and such other powers as the Reserve Banks may be agreement confer upon the Board :

(a) To recommend the external exchange rate of the rupee to the Federal Government ;

(b) To issue currency notes and mint coins at the request of the Reserve Bank against assets as provided by the Reserve Bank concerned for circulation in the area within the jurisdiction of that Reserve Bank.

(c) To maintain and regulate mints and security presses :

(d) To perfrom in relation to international financial institutions such functions as were upon the commencement day being performed by the State Bank of Pakistan, which functions shall be performed in accordance with the directions of the Reserve Banks, in respect of matters affecting such Reserve Banks and the area falling within jurisdiction ;

(4) The constitution, powers, functions and duties of the Federal Reserve Board, subject to the provisions of this constitution, shall be determined by an Act of Parliament, and until such time as an Act of Parliament is enacted by the federal Government by Order.

Inter State Trade

108. (1) Subject to clause (2) of this Article an Assembly of a State shall not have power to make any law prohibiting or restriciting :

(i) the entry from another State into the State of indigenous goods of any class or description ;

www.bjilibrary.com

(ii) The export from the State to any other State of indigenous goods of class or description.

(2) No State Law which imposes any reasonalble restrictions in the interest of public health, public order of morality or for the purpose of protecting animals or plants from disease of preventing or alleviating any serious shortage in the State of any essential commodity, of developing within the State of industries producing any shall be invalid by reason of this Article.

109. (1) There shall be a Regional Co-ordination Board, consisting of the representatives of the Governments of the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan for the purpose of joint administration, management, co-ordination or co-operation in respect of matters of common concern. (The composition of the Board shall be determined after consultation with the representatives of the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan).

(2) The matters whcih in the first instance are deemed to be matters of common concern for the purpose of clause (1) of this Article are enumerated in the Eighth Schedule, (the items to be included in the Eighth Schedule shall be enumerated after consultation with the representatives of the States concerned) ; additional items may be added to the eighth Schedule by Act of Parliament if the State Governments concerned make a joint proposal in that behalf to the Federal Parliament, supported by resolutions of the State Assemblies concerned.

(3) The powers, duties, functions, administration and management of the Board referred to in clause (1) shall be regulated (by such legislative organ as shall be determined after consultation with the representatives of the States concerned.)

Ownerless Property

110. Any ownerless property that has no rightful onwer shall vest in the State in which it is located.

****

www.bjilibrary.com

ইয়াহিয়ার ২৬ শে মার্চ (১৯৭১) তারিখের ভাষণ

TEXT OF YAHYA'S BROADCAST
(On March 26, 1971)
My dear countrymen,
Assalam-o-Alaikum.

On the 6th of this month I announced the 25th of March as the new date for the inaugural session of the National Assembly hoping that conditions would permit the holding of the session on the appointed date. Events have, however, not justified that hope. The nation continued to face a grave crisis.

In East pakistan a non-co-operation and disobedience movement was launched by the Awami League and matters took a very serious turn. Events were moving very fast and it became absolutely imperative that the situation was brought under control as soon as possible. With this aim in view, I had a series of discussions with political leaders in West Pakistan and subsequently on the 15th of March I went to Dacca.

As you are aware I had a number of meetings with Sheikh Mujibur Rahman in order to resolve the political impasse. Having consulted West pakistan leaders it was necessary for me to do the same there so that arcas of aggreement could be identified and an amicable settlement arrived at.

As has been reported in the press and other news media from time to time, my talks with Sheikh Mujibur Rahaman showed some progress. Having reached a certain stage in my negotiations with Sheikh Mujibur Rahaman I considered it necessary to have another round of talks with West Pakistani leders in Dhaka.

Mr. Z.A. Bhutto reached there on 21st March and I had a number of meeting with him.

As you are aware the leader of the Awami League had asked for the withdrawal of Martial Law and transfer of power

www.bjilibrary.com

to the meeting Public are living in a state of panic, and a very large number had to leave that Wing out of fear for their lives.

The Armed Forces, located in East Pakistan, have been subjected to taunts and insults of all kinds, I wish to complement them on the tremendous restraint that they have shown in the face of grave provocation. Their sense of discipline is indeed praiseworthy. I am proud of them.

Reasonable Solution

I should have taken action against Mujibur Rahman and his collaborators weeks ago but I had to try my utmost to handle the situation in such a manner as not to jeopardise my plan of peaceful transfer of power. In my keenness to achieve this aim I kept on tolerating one illegal act after another, And at the same time I explored every possible avenue for arriving at some reasonable solution. I have already mentioned the efforts made by me and by various political leaders in getting Sheikh Mujibjur Rahaman to see reason. We have left on stone unturned. But he has failed to respond in any constructive manner ; on the other hand, he and his followers kept on flouting the authority of the Government even during my presence in Dacca. The proclamation that the proposed was nothing but a trap. He knew that it would not have been worth the paper it was written on and in the vacuum created by the lifting of Martial Law he could have done anything with impunity. His obstinacy, obduracy and absolute refusal to talk sence can lead to but one conclusion-the man and his party are enemies of Pakistan and they want East Pakistan to break away completely from the country. He has attacked the solidarity and integrity of this country- this crime will not go unpunished.

We will not allow some power hungry and unpatriotic people to destroy this country and play with the destiny 120 million People.

www.bjilibrary.com

In my address to the nation of 6th March I had told you that it is the duty of the Pakistan Armed Forces to ensure the integrity, solidarity and security of Pakistan. I have ordered them to do their duty and fully restore the authority of the Government.

In view of the grave situation that exists in the country today I have decided to ban all political activities throughout the country, as for the Awami League it is completely banned as a political party. I have also decided to impose complete Press censorship. Martial Law regulations will very shortly be issued in pursuance of these decisions.

Aim Remains Same

In the end let me assure you that my main aim remains the same, namely, transfer of power to the elected representatives of the people. As soon as situation permits I will take fresh steps towareds the achievement of this objective.

It is my hope that the law and order situation will soon return to normal in East Pakistan and we can again move fowared towards our cherished goal.

I appeal to my countrymen to appreciate the gravity of the situation for which the blame rests entirely on the anti-Pakistan and secessionist elements and to act as reasonable citizens of the country because therein lies the security and salvation of Pakistan.

God be with you God bless you.

Pakistan Paindabad.

On the National Assembly, in our discussions he proposed that this interim peried could be covered by a proclamation by me whereby Martial Law would be withdrawn, Provincial Governments set up and the National Assembly would sit in two committees-one composed of members from East Pakistan and the other composed of members from West Pakistan.

www.bjilibrary.com

One Condition

Despite some serious flaws in the scheme in its legal as well as other aspects, I was prepared to agree in principle to his plan in the interest of peaceful transfer of power but on one condition. The condition which I clearly explained to Sheikh Mujibur Rahman was that I must fiust have unequivocal agreement of all political leaders to the scheme.

I thereupon disceussed the proposal with other political leaders. I found them unanimously of the view that the proposed proclamation by me would have no legal sanction. It will neither have the cover of Martial Law nor could it claim to be based on the will of the people. Thus a vacuum would be created and chaotic conditions will arise. They also considered that splitting of the National Assembly into two parts through a proclamation would encourage divisive tendencies that may exist. They therefore expressed the opinion that if it is intended to lift Martial Law and transfer power in the interim Constitution Bill and present it for my assent. I entirely agreed with view and requested them to tell Sheikh Mujibur Rahman to take a resonable attitued on this issue.

I told the leaders to explain their views to him that a scheme whereby, on the one hand, you exstingusih all source of power namely Martial Law and on the other fail to replace it by the will of the people through a proper session of the nationalAssembly, will merely result in chaos, they agreed to meet Sheikh Mujibur Rahman, explain the position and try to obtain his agreement to the interim arrangement for transfer of power to emanate form the national Assembly.

The political leaders were also very much perturbed over Sheikh Mujib's idea of dividing the National Assembly into two parts right from the start. Such a move, they felt, would be totally against the interest of Pakistan's integrity.

www.bjilibrary.com

The Chairman of the Pakistan People's Party, during the meeting between myself, Sheikh Mujibur Rahman and him, had also expressed simiar views to Mujib.

On the evening of the 23rd of March the political leaders, who had gone to talk to Mujib on this issue, called on me and informed me that he was not agreeable to any changes in his scheme. All he really wanted was for me to make a proclamation whereby, I should withdraw Martial Law and transfer power.

Sheikh Mujibur Rahman's action of starting his non-co-operation movement is an act of treason. He and his party have defied the lawful authority for over three weeks. They have insulted Pakistan's flag and defiled the photograph of the Father of the Nation. They have tried to run a parallel Government. They have created turmoil, terror and insecurity.

A number of murders have been committed in the name of movement Millions of our Bengali brethren and those who have settled in East.

www.bjilibrary.com

পরিশিষ্ট—৮

২৭শে মার্চ (১৯৭১) ভারতীয় পার্লামেন্টে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি

Statement by the Minister of External Affairs of India in Parliament on 27th March regarding recent developments in Pakistan.

The Government of india cannot but be gravely concerned at the events taking place so close to our borders. We can, therefore, understand the deep emptions which have been aroused in this house and in the entire country.

Honourable Members are, I am sure, fully aware of political developments in pakistan since november 28, 1969 when the presiednt of Pakistan announced his plan for envolving a democratic Constituion and for the transfer of power to the elected representatives of the people.

The Government and people of India have always entertained the friendliest of feeling for the people of Pakistan. We had, therefore, hope that a democratic evolution in Pakistan would follow its natural course and that elected representatives would evolve a Constitution reflecting the urges of the vast majority of the people expressed through the elections held in December last year.

However, events have taken a different and tragic turn. Instead of peaceful evolution there is now a bloody confilct.

According to reports received, the Pakistan Army started taking action on the midnight of 25 th and 26 th March against units of the East Pakistan Rifles, the provincial police and the people. The reports are that casualties have been heavy. On the morning of March 26th, the Radio Station at Dhaka was seized by the Army. Thereafter the Radio Station made an announcement of 15 new Martial Law Regulations banning, among other things, all political activities, processions, meetings speeches and slogans. Complete censorship of all news Radio and Television porgramme was imposed.

www.bjilibrary.com

More than two regular Divisions of the Pakistan Army are deployed in suppression the people of East Pakistan. Our hearts go out in sympathy to the people who are undergoing great suffering.

We naturally wish and hope that even at this late stage it would be possible to resume democratic processes leading to the fulfilment of the aspisrtions of the vast majority of the people there. We cannot but take note of the fact that such a large segment of humanity is involved in a conflict and that many people are suffering in the process.

Recently, when natural disaster overtook East Pakistan, the Government and people of India alongwith other members of the international community responded to bring relief to the sufferings of the people there.

We are prepared to make our contribution once again, in concert with the members of the international community or international humanitarian organisations, concerned with bring relief to innocent victims of conflict.

পরিশিষ্ট—৯

৩১ শে মার্চ (১৯৭১) ভারতীয় পার্লামেন্টে গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাব

Resolution moved by the Prime Minister Mrs. Indira Gandhi in Parliament and passed unanimously by it on March 31

This House expresses its deep anguish and grave concern at the recent developments in East Bengal. A massive attack by armed foces, despatched from West Pakistan, has been unleashed against the entire people of East Bengal with a view to suppressing their urges and aspirations.

2. Instead of respecting the will of the people so unmistakbly expressed through the election in Pakistan in December 1970, the Govenment of Pakistan has chosen to flout the mandate of the people.

www.bjilibrary.com

3. The Govenment of Pakistan has not refused to transfer power to legally elected representatives but has arbitrarily prevented the National Assembly from assuming its rightful and sovereign role.The people of East Bengal are being sought to be suppressed by the naked use of force, by bayonets, machine guns, tanks, artillery and aircraft.

4. The Government and peole of India have always desired and worked for peaceful, normal and fraternal relations with Pakistan. Situated as India is and bound as the peoples of the sub-continent are by centuries old ties of history, culture and tradition, this House cannot remain indifferent to the macabre tragedy being enacted so close to our border. Throughout the length and breadth of our land, our people have condemned, in unmistakable terms, the atrocities now being perpetrated on an unprecedented scale upon an unarmed and innocent people.

5. This House expresses its profound sympathy for and solidarity with the people of East Bengal in their struggle for a democratic way of life.

6. Bearing in mind the permanent interests which India has in peace, committed as we are to uphold and defend human rights, this House demands immediate cessation of the use of froce and the massacre of defenceless people. This House calls upon all peoples and Government of the world to take urgent and constructive steps to prevail upon the Government of Pakistan to put an end immediately to the systematic decimation of people which amounts to genocide.

www.bjilibrary.com

www.icsbook.info

www.bjilibrary.com

লো পঁচিশের আগে ও পরে কালো
গে ও পরে কালো পঁচিশের আগে ও
পঁচিশের আগে ও পরে কালো পঁচি
গে ও পরে কালো পঁচিশের আগে ও
লো পঁচিশের আগে ও পরে কালো
গে ও পরে কালো পঁচিশের আগে ও